বাংলা অনুবাদ ঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩
মুদ্রক : তারক দত্ত, শ্রীভারতী প্রেস, কলিকাতা—৬

রমাঁ রোলাঁ

(১৮৬৬–১৯৪৪)

'জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টা রমাঁ রোলাঁ বর্তমান জগতের শুধু একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নহেন, তিনি বিংশ-শতাব্দির অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা, অনন্যসাধারণ অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের অবিস্মরণীয়দের একজন।

বিংশ-শতাব্দীর কাহিনী-সাহিত্যে 'জাঁ-ক্রিস্তফ' অদ্বিতীয়, অনন্যসাধারণ, একক···গঠনের দিক থেকে প্রাচীন মিশরের পিরামিডের মতন বিশাল, স্থির ; অন্তরের দিক থেকে মহাসমুদ্রের মতন প্রাণ-গম্ভীর ; নিত্য-প্রাণ নিত্যশব্দ, নিত্য-সুর, নিত্য-গতির জন্মভূমি। সুবিশাল বন্ধনের মধ্যে গর্জন করিতেছে সুবিপুল গতি।

য়ুরোপীয় সভ্যতার দুই প্রধান প্রতিনিধি, জার্মানী ও ফ্রান্স, অংগাংগী, প্রতিবেশী, অথচ এই দুই জাতির দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিত্য স্পন্দমান য়ুরোপের ইতিহাস। এবং বিংশ-শতাব্দীতে এই জাতি বৈরিতা প্রচণ্ড বিদ্বেষের আগুনে সমগ্র য়ুরোপকে জ্বালাইয়া, বিশ্ব-জগৎকে দগ্ধ করিল। এবং এই বিদ্বেষই আজ সমগ্র জগতের নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। তাই রোলাঁ এই দুই জাতিকে কেন্দ্র করিয়া জাঁ-ক্রিস্তফের কাহিনীকে গড়িয়া তোলেন। এবং তাঁহার গ্রন্থের নায়ক, জার্মান জাঁ-ক্রিস্তফ, জার্মান প্রতিভার সুন্দরতম অভিব্যক্তি, একদা জার্মান শাসকদের সামরিক দম্ভসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া, জাতি-দ্রোহের কলঙ্ক ও অভিশাপ লইয়া, চিরশত্রুর দেশ মায়াবিনী ফ্রান্সকেই অন্তরের সম্রাজ্ঞী বলিয়া বরণ করিয়া লইল। যে-সত্যের জন্য নিজের জন্মভূমিকে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিতে হইল, এবং যে-প্রেয়সীর আকর্ষণে সে তরংগ-সংকুল প্রলয়-সমুদ্রে পাড়ি দিল, একদিন চরম বেদনায় তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইল, সেই ফ্রান্স, তাহার অন্তরের প্রেয়সী, ভালোবাসার মূল্য-স্বরূপ সেও চাহে মিথ্যার সহিত আপোস, অন্যায়ের সহিত আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্ম-বিক্রয়। জাঁ-ক্রিস্তফের সত্যাগ্রহী অন্তর ফ্রান্সের সেই বুদ্ধি-দীপ্ত সূক্ষ্ম আত্ম প্রতারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জার্মানী তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া নির্বাসন দিল, ফ্রান্সও যেদিন বুঝিল জাঁ-ক্রিস্তফ অন্ধের মতো তাহাকে মানিয়া লইতে সম্মত নয়, ফ্রান্সও সেদিন তাহাকে জার্মানীর গুপ্তচর বলিয়াই ঘোষণা করিল। এই দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষের যে বিশাল প্রাচীর প্রতিদিনই বিশালতর হইয়া উঠিতেছিল, জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেকে উৎসর্গ করিল, সেই বিদ্বেষের প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার

জন্য। তাহার সমগ্র জীবন হইল এই যুগব্যাধির বিরুদ্ধে অতন্দ্র সংগ্রাম। মানুষের পুঞ্জীভূত অন্যায় আর মিথ্যার বিরুদ্ধে চির-অপরাজেয় মানব-আত্মার বিদ্রোহ।

এই পটভূমিকার উপরে রোলাঁ মানবাত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার নায়ক জাঁ-ক্রিস্তফকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং এই বিশাল গ্রন্থে তিনি জাঁ-ক্রিস্তফকে বর্তমান জীবনের সমস্ত স্তরের মধ্য দিয়া, সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাই এই গ্রন্থ হইল, বর্তমান জীবনের সুবিশাল রঙ্গমঞ্চ। এবং এই বিরাট রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত নায়ককে সৃষ্টি করিতে গিয়া, তিনি তাহাকে সঙ্গীত-শিল্পী করিয়াই গড়িয়াছেন। জীবনের শুধু বাহিরের রূপ নয়, জীবনের অন্তরের অন্তরতম স্পন্দন ধরা পড়ে একমাত্র সঙ্গীতে। সঙ্গীত হইল আত্মার বাণী। সে বাণীকে সঙ্গীত যেমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে, আর কোনো শিল্প তেমনভাবে তাহা পারে না। যাহা অব্যক্ত, যাহা অনাদি, অনন্তের সহচর, একমাত্র সঙ্গীতই পারে তাহাকে স্পর্শ করিতে, তাহাকে রূপ দিতে। জাঁ-ক্রিস্তফের আদর্শবাদী শিল্পী অন্তর সেই অনাদি অনন্ত প্রাণ-শক্তিরই খণ্ড প্রকাশ, তাই সে সঙ্গীত-শিল্পী। তাহার মধ্য দিয়া রোলাঁ শিল্প-সাধনার অমর মহাকাব্যকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। জাঁ-ক্রিস্তফ বিশ্বের অমর শিল্পীর প্রতিনিধি। তাহার ব্যক্তিগত সাধনার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে শিল্প-সাধনার নিগূঢ় ইতিহাসের মর্ম কাহিনী।

১৯০৪ হইতে ১৯১২-সুদীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া রলাঁ "জাঁ-ক্রিস্তফ" উপন্যাস লেখেন। পরবর্তী কালে ১৯২২ হইতে ১৯৩৩--এগার বৎসর ধরিয়া তিনি লেখেন "বিমুগ্ধ আত্মা" (L'ame Enchante'e) নামক আরেকখানি উপন্যাস। দশ খণ্ডে সমাপ্ত প্রথম উন্যাসখানি প্রথম যুদ্ধপূর্ব জার্মানী ও ফ্রান্সকে লইয়া রোলাঁর মানসপুত্র সঙ্গীত-শিল্পীর জীবনগাথা। দ্বিতীয়খানি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত যুদ্ধ-পরবর্তী য়ুরোপের মর্মকথা। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মানব সংস্কৃতির আদর্শ-সংঘাতের কাহিনী মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে চিন্তানায়ক রোলাঁর সাহিত্য-কীর্তিতে।

রোলাঁ তখন তরুণ অধ্যাপক। সে সময়কার ফ্রান্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা চিন্তাশীল ফরাসীদের নিকট এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের মহান ঐতিহ্যের উপর টাকার থলি রাখিয়া স্থূলকায় মেদস্ফীত ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী সেদিন স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নামে মিথ্যা প্রচার শুরু করিল। অনেক বুদ্ধি-

জীবীর মতো দুশ্চিন্তিত তরুণ অধ্যাপক রোলাঁ সেদিন লিখিলেন : "এই নীতি-বিবর্জিত ফ্রান্সে অনেকের মতোই আমারও দম বন্ধ হয়ে আসছিল : নিশ্বাসের জন্য আমি নিষ্কলঙ্ক বাতাস চাইলাম : একটা অস্বাস্থ্যকর সভ্যতার বিরুদ্ধে আমি আঘাত করতে চাইলাম, একটা তথাকথিত ঠুনকো বিদগ্ধ-সমাজ-সৃষ্ট আদর্শবাদের বুলির বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করতে চাইলাম, চাইলাম চেঁচিয়ে বলতে : 'না, তোমরা মহান ফরাসী দেশের ঐতিহ্যের প্রতিনিধি নও।'...এবং একথা বলতে হলে আমার দরকার এমন একজন নায়কের যার হৃদয় হবে নিষ্কলুষ, দৃষ্টি হবে স্বচ্ছ, অন্তত নিজের কাছে আত্মা তার থাকবে নিষ্কলঙ্ক। তারই জোরে সে কথা বলার অধিকারী হবে, অন্যকে তার কথা শোনাতে পারবে। দিনের পর দিন ধরে আমি সৃষ্টি করেছি আমার নায়ককে। লেখা শুরু করার আগে আমার এই শিল্পকর্মের ছক্, আমি বহুদিন ধরে তৈরি করেছি। ক্রিস্‌তফের ভবিষ্যৎ যখন আমি দেখতে সক্ষম হয়েছি, তখনই আমি এই উপন্যাস লিখতে শুরু করি।" ("জাঁ-ক্রিস্‌তফ"-এর ৭ম খণ্ডের ভূমিকা)। সৃষ্টিধর্মী শিল্পীকে তাঁহার পারিপার্শ্বিক দেশজ চৌহদ্দির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে : দুঃখ-বেদনা অনভূতি যাহা শিল্পীর মন জুড়িয়া থাকে, তাহাকে দিতে হইবে দিক্-নির্দেশনা। ইহা যদি শিল্পী না পারেন, তাঁহার লেখা শুধু পাতা ভরতি লেখাই হইবে, শিল্প-সৃষ্টি হইতে পারিবে না—হাইনরিখ ইবসেনের এই কথা মনে রাখিয়াই সুরশিল্পী ক্রিস্‌তফ অগ্রসর হইয়াছে তাহার জীবন-পথে। আঁকাবাঁকা জীবন পথে চলিতে গিয়া সে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে, উঠিয়াছে, আবার চলিয়াছে। প্রাচীন যাহারা পথরোধ করিয়াছিল দামের মতো, তাহাদের দুই পায়ে মাড়াইয়া সে চলিয়াছে। মানব-জীবনাধ্যায়ের এক করুণ কাহিনী আঁকিয়াছেন রোলাঁ তাঁহার "জাঁ-ক্রিসতফ"-এ। "কিছুই আমি লুকোই নি, না তার দোষত্রুটি, না তার গুণাবলী, তার গভীর দুঃখ, শৃঙ্খলাহীন গর্ব, তার দুর্বার শক্তি, একটা দুনিয়া-জোড়া পাষাণভার যা বিহ্বল করে ডুবিয়ে দেয় মানুষকে—" সব আঁকিয়াছেন রোলাঁ এই উপন্যাসে। কিন্তু করুণামিশ্রিত ট্রাজেডিতে শেষ হয় নাই এ-কাহিনী। নতুন মানবতা সৃষ্টির জন্য, সমগ্র দুনিয়া ভিত্তিক নীতিবোধের জন্য, সত্য-সুন্দর-শিব তত্ত্বের জন্য ক্রিস্‌তফরা এমনিভাবেই জীবন-পথে আগাইয়া যাইবে, জীবন-নদী পার হইয়া তাহারা যাইবেই।

রোলাঁর মৃত্যুর পর সাহিত্যরসজ্ঞ ফর্স্টার বলিয়াছিলেন : "২৫ বছর আগে রোলাঁকে মনে হয়েছিল তলস্তয়ের সমকক্ষ, তিনি হবেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী।" অর্থাৎ ১৯১৯ পর্যন্ত রোলাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে গ্রহণ করিয়াই তলস্তয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন 'বনেদী' সাহিত্যরসিকরা। কিন্তু ইতিমধ্যে মানবতার স্বপক্ষে "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" মানবতার পূজারী রোলাঁর উদাত্তকণ্ঠ আহ্বান জানাইয়াছে বুদ্ধি-

জীবীর দরবারে। 'মসী-কৌলিন্যের' দাবীদার যাঁহারা, তাঁহারা সরিয়া গিয়াছেন, সততার জীবন-বেদীর উপর দাঁড়াইয়া যাঁহারা শিল্পসৃষ্টি করেন, তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইলেন রোলাঁর পাশে। রোলাঁর মানসপুত্র ক্রিস্তফ কর্মের ভাবাবেগে অধীর, "বিশ্বাসের পাদমূলে জীবন সঁপিয়া দিয়া শান্ত হইতে চাহিয়াছে সে। এই ভাব-সুরাপানকে সে অস্বীকার করে নাই–," কিন্তু যে জীবন-স্রোত সে নিজে পার হইয়া যাইতে সক্ষম হইল, তাহা তো অনেকেই পার হইতে পারে না, তাহাদের স্রোত-উত্তরণে সাহায্য করিবার সময় কোথায় সুর-শিল্পী ক্রিস্তফের। গভীর দুশ্চিন্তা লইয়া তাকাইয়া দেখিলেন কথাশিল্পী রোলাঁ। তিনি তাকাইলেন সমস্ত দুনিয়ার দিকে, প্রাচ্যের চীন ও ভারতের পানে। "রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, কালিদাস নাগ, লজপৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ভারতের সঙ্গে প্রচুর পত্র বিনিময়, বাংলা দেশের পত্রিকা-গুলো পাঠ করবার ফলে আমি ভারতীয় মনে গভীরভাবে প্রবেশ করলাম। সে-মনের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমার ভাব-জগতের এমন অনেক রহস্যালোক ছিল, যেগুলোকে এতদিন আমি ভেবে এসেছি ফরাসী চিন্তা-জগতেরই জিনিস সেদিন দেখলাম ভারতবর্ষেও তার মিল পাওয়া যায়…"

১৯২৭ পর্যন্ত এই যে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার যুগ চলিয়াছে, ইহারই মধ্যে তিনি রক্ষা করিলেন "পশু মুসোলিনীর কপটাচারের" হাত হইতে 'ঋষিতুল্য' রবীন্দ্রনাথকে।

রোলাঁর মৃত্যুর পর বনেদী' সাহিত্য-রসিক ফর্স্টার যে অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তর তো রোলাঁ অনেক আগেই নিজেই দিয়াছিলেন তাঁহার "শিল্পীর নবজন্ম" গ্রন্থে "১৯১৪-র সেপ্টেম্বরে যেখান থেকে আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেখানেই আমাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে, এই যদি কেউ ভেবে থাকেন, তবে ভুল করবেন। …এ যাত্রা-পথে আমি বহু সংস্কার, মোহ, বহু বন্ধুত্ব পেছনে ফেলে এসেছি, এ-পরিক্রমণ আমার আজও শেষ হয় নি। …যদি কখনও সময় পাই তবে ১৯১৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ যাত্রা-পথের সমগ্র কাহিনী বলব। এ-কাহিনী এমন এক স্বীকারোক্তি, যার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের এক মুমূর্ষু শ্রেণীর পুরো একটা পুরুষ তার প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে, অবশ্য এত কাণ্ডের পরেও নিজের মুখের ছবি দেখবার সাহস যদি তার থাকে। এই শ্রেণী বুর্জোয়া শাসক-শ্রেণী। এর শুষ্ক-শীর্ণ ভাবাদর্শকে ধ্বংস ক'রে এক নতুন জগতের শ্যামল সতেজ জীবন-তরুকে যারা সম্ভব ক'রে তুলেছে, তার মধ্যে আমরা নিজেরাও আছি।"

এবং সে-কাহিনী রোলাঁ লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অমরকীর্তি "বিমুগ্ধ আত্মা" উপন্যাসে।

২৯শে জানুয়ারী, ১৮৬৬, ফ্রান্সের ক্লমেসি নামক স্থানে এক উকিল-পরিবারে রোলাঁর জন্ম হইয়াছিল। মাতার নিকট অতি শিশু বয়স হইতেই তাঁহার সংগীত-শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয়। বিশ বছর বয়সে হ্বাগনারের গীতিনাট্য, তলস্তয়ের রচনাবলী, সেক্সপীয়রের নাটক তাঁহাকে আকর্ষণ করে। ১৮৯৫-তে তিনি শিল্পকলা ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন। এই সময় মহান ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ছয়খানা নাটক লেখেন। এই সময়েই রোম নগরীতে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় মালুইদা ভন মেইসেনবুর্গ নামক জনৈকা বিদুষী জার্মান মহিলার সংগে। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর তিনি জার্মানী হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ য়ুরোপের মনীষীদের সংগে এই বিদুষীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। কসুথ, মাজ্জিনি, হারজেন, লেদ্রীন, রলীন হ্বাগনার, নীৎসে, গারবল্ডী, হাইনরিখ ইবসেন—ইঁহারা ছিলেন এই জার্মান নির্বাসিতার বন্ধু।

লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এই বৃদ্ধা মহিলার সংগে যখন রোলাঁর সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছিলেন : 'এই ফরাসী যুবকটির মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই উচ্চ আদর্শ, সেই উচ্চাকাংক্ষা, সেই সর্বব্যাপ্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি, যা আমি দেখেছি অন্যান্য জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়কদের মধ্যে।'

এই বৃদ্ধাই রোলাঁকে সাহায্য করিলেন তাঁহার চিন্তাধারাকে উন্মেষ করিতে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই মহিলার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে রোলাঁ লিখিলেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ জীবনী-সাহিতা : "সুরস্রষ্টা বিটোফেন", "মাইকেলেঞ্জেল", "গ্যায়টে ও বিটোফেন"। ১৯০৪ হইতে শুরু হইল তাঁহার "জাঁ-ক্রিস্তফ" লেখা। "পীয়ের ও লুস", "গান্ধী", "বিবেকানন্দ", "রামকৃষ্ণ", "হ্যাণ্ডেল", হুগো উলফ", "ক্লেরাবোঁ", "কোলাস ব্রুসন", "লীলুলী", "রবেসপীয়র", "সেক্সপীয়র", "দান্তে", "জনসাধারণের থিয়েটর", "১৪ই জুলাই". "বিমুগ্ধ আত্মা" ("দুইবোন , "সুন্দরের পিয়াসী", "মা ও ছেলে", "একটি যুগের মৃত্যু", "সংগ্রাম" প্রভৃতি), "শিল্পীর নবজন্ম", "পেগুয়ে", "ভারত দিনপঞ্জী" প্রভৃতি বহু বই তিনি লেখেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উন্নতশির এই মহামানব কাহারও সংগে নীতির আপোষ করেন নাই। তিনি ছিলেন চলিষ্ণু মানব সমাজের অগ্রবর্তী প্রতিভূ। প্রখ্যাত গ্যায়টে পদক হিটলারের কদর্য হাত হইতে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া যে বিখ্যাত পত্র তিনি দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংশ হত্যার পর ব্রিটিশ প্রদত্ত "স্যার" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার সংগেই হইতে পারে।

হিটলার-অধ্যুষিত ফরাসী দেশ যখন মুক্ত হইল, তখন এই মনীষী জীবনের শেষ দিনগুলি তাঁহার পারিবারিক বাসভবনে কাটান।

ঊষার আলো

Dianzi, nell'alba che precede al giorno,
Quando l'anima tua dentro dormia···

***Purgatorio*, ix,**

জাঁ-ক্রিস্তফ

১

Come, quando i vapori umidi e spessi
A diradar cominciansi, la spera
Del sol debilemente entra per essi…

Purgatorio, xvii.

গৃহান্তরাল থেকে কানে ভেসে আসে নদীর জলমর্মর। সারাদিন ধরে রুদ্ধ বাতায়নে বৃষ্টির ধারা আঘাত ক'রে চলেছে; বাতায়নের ভগ্ন কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। বাইরে দিন-শেষের সোনালী আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসে। ভিতরে ঘরে গাঢ়তর হয়ে ওঠে ম্লান নিস্তব্ধতা।

সদ্যজাত শিশু দোলনায় নড়ে ওঠে। ঘরে প্রবেশ করবার আগে, বৃদ্ধ সেবো[১]-জোড়া বাইরে খুলে রাখেন, তবুও তাঁর পায়ের শব্দে ঘরের অন্ধকার যেন সচকিত হয়ে ওঠে। শিশু অস্ফুটকণ্ঠে অনুযোগ জানায়। শয্যা থেকে দেহ-ভার উত্তোলন ক'রে জননী তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে; আলো জ্বালবার জন্য বৃদ্ধ পিতামহ অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ান, শিশু যেন জগতে প্রথম চোখ মেলে চোখের সামনে রাত্রির অন্ধকার দেখে ভয় না পায়। প্রদীপের শিখায় বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের রক্তাভ বিষণ্ণ আনন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অযত্নবিন্যস্ত এক গাল সাদা দাড়ির মধ্যে প্রখর-দৃষ্টি চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। ধীরে দোলনার দিকে তিনি এগিয়ে যান, পায়ে ঘরে-পরার নীল চটিজোড়া ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে। সারা গায়ে ভিজে গন্ধ। লুইসা ইঙ্গিতে বারণ করে, শিশুর খুব নিকটে বৃদ্ধ যেন না আসেন। রক্তহীন, শুভ্র লুইসা দোলার পাশেই শুয়ে ছিল। সুগঠিত অঙ্গ-রেখা, শান্তস্নিগ্ধ শূন্যমুখে মাঝে মাঝে লাল চাকা-চাকা দাগ, ফুল্ল ওষ্ঠদ্বয় রক্তহীন বিবর্ণ ম্লান ভীরু হাসিতে ঈষৎ-ভিন্ন, দুচোখ দিয়ে যেন শিশুকে গ্রাস ক'রে আছে—নীলাভ চোখ দুটি উদাস; চোখের মণি দুটো ছোট কিন্তু তাতে কে যেন অনন্ত মাধুরী মাখিয়ে দিয়েছে।

জেগে উঠেই শিশু কাঁদে, প্রদীপের আলোয় তার চোখে আঘাত লাগে।

১ ফরাসী কৃষকের ব্যবহৃত খড়ম।

চারদিকে তার একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ! চারদিক অন্ধকার···সহসা তারই মধ্যে দীপের চকিত দীপ্তি ··সে ধারণা করে উঠতে পারে না। সবেমাত্র সৃষ্টির গহনলোকের নিশ্ছিদ্র তমসা থেকে সে এই নতুন জীবনে জেগে উঠেছে, এখনও তার মনে জড়িয়ে রয়েছে অপর এক পৃথিবীর স্মৃতি। জেগে উঠে তার চারদিকে দেখছে শব্দময়ী রাত্রির ঘন-অন্ধকারের অবরোধ, তার মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব ছায়ামূর্তির বিরাট মুখ তার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। সেই বিরাট মুখের শাণিত দৃষ্টি তার অনুভূতির রাজ্য এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায়···সে কিছুই ধারণা করে উঠতে পারে না।···কেঁদে নিজেকে রিক্ত করবার শক্তিও তার এখনও আসেনি। ভয়ে নিস্পন্দ শুয়ে থাকে। চোখ মুখ আপনা থেকেই বিস্ফারিত হয়ে যায়। গলায় অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ ওঠে। বিরাট মাথা, দেখলে মনে হয়, যেন ফুলে আছে, মুখে উদ্ভট সব রেখা—বেদনার নীরব রেখা। হাতের আর মুখের চামড়ার রঙ কোথাও তামাটে, কোথাও ঘন লাল, মাঝে মাঝে হলুদের ছোপ···

'হা ভগবান্! এ যে দেখছি রীতিমত কুৎসিত্!' বৃদ্ধের উক্তির মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রদীপ নামিয়ে বৃদ্ধ টেবিলের ওপর রাখেন। অভিমান-ক্ষুব্ধ শিশুর মতো পুত্রবধূর ঠোঁট ফুলে ওঠে। জাঁ-মিচেল আড়চোখে পুত্রবধূকে লক্ষ্য ক'রে হেসে ফেলেন :

'তোর কি ইচ্ছে যে আমি ওকে সুন্দর বলি? বল্লেই তুই বিশ্বাস করবি! কিন্তু তাতে কি হয়েছে? এতে তো আর তোর কোন হাত নেই, বাচ্ছাগুলো সব ঐরকম কুৎসিত হয়েই জন্মায় যে।'

প্রদীপের আলো আর বৃদ্ধের খর-দৃষ্টিতে এতক্ষণ যে মুহ্যমান নিশ্চলতার মধ্যে নবজাতক আবদ্ধ হয়ে ছিল, ক্রমশঃ তার থেকে যেন সে মুক্তিলাভ করে। মুক্তিলাভ করেই কাঁদতে শুরু করে। জননীর স্নেহদৃষ্টিতে সে যেন আশ্বাস পায়, তাই সাহস ক'রে প্রতিবাদ জানাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কান্না তার তীব্রতর হতে থাকে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে লুইসা বৃদ্ধকে মিনতি করে : 'ওকে আমার কাছে সরিয়ে দিন বাবা।'

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ মন্তব্য করেন : 'ছেলে কাঁদলো বলেই তাকে আদর করতে হবে নাকি! সেটা কিছু কাজের কথা নয়। ওকে কাঁদতে দে—'

কিন্তু মন্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোলনা শুদ্ধ শিশুকে জননীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে তেমনি ভাবেই অনুযোগভরা কণ্ঠে বলেন : 'এ রকম কুৎসিত ছেলে আর দু'টি দেখিনি বাপু!'

লুইসা চকল হস্তে শিশুকে বুকে টেনে নেয়। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পুত্রের পানে। লাজ-মধুর পরিতৃপ্তির ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে তার ওষ্ঠে।

'ওরে আমার বাছারে, কি ভীষণ বিশ্রী রে!' অকুণ্ঠ ভাবে লুইসা শিশুকে আদর করে।

বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল সরে এসে আগুনের পাশে বসেন। যেন পুত্রবধূর উক্তির প্রতিবাদ করেই শুকনো কাঠ দিয়ে নীরবে আগুন খুঁচিয়ে তোলেন। আপাতগম্ভীর বিষণ্ণ মুখ কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই তার অন্তরালে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ধরা পড়ে।

'লক্ষী মেয়ে!' বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন: 'এ নিয়ে দুঃখু করিস নে। বদলাবার যথেষ্ট সময় আছে। আর যদি নাই বদলায়, তাতেই বা কি? একটা জিনিস শুধু ওর কাছ থেকে চাইবি, সুশ্রী হোক আর কুশ্রী হোক, ও যেন খাঁটী মানুষ হতে পারে।'

জননীর দেহের স্নিগ্ধ উত্তাপের সান্নিধ্যে শিশু আশ্বস্ত হয়। কান্নার বদলে কানে আসে স্তন্য-পানের শব্দ। গলার ভিতর থেকে জেগে ওঠে বাণীহীন তৃপ্তির একটা অস্পষ্ট আওয়াজ। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে জাঁ-মিচেল দৃঢ়কণ্ঠে পুনরুক্তি করেন: 'খাঁটী মানুষের চেয়ে সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর নেই।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকেন, ভাবেন কথাটা আরো বিস্তার ক'রে বলা উচিত কিনা। কিন্তু বলবার মতো নতুন আর কিছুই পান না। তাই কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন: 'তোমার স্বামীটি যে এখানে নেই, দেখছি—'

কুণ্ঠিত কণ্ঠে লুইসা জবাব দেয়: 'বোধহয় থিয়েটারে…শুনেছিলাম রিহার্সাল আছে।'

'মিথ্যে কথা…থিয়েটার বন্ধ…এইমাত্র তার পাশ দিয়ে এলাম। তার হাজার মিথ্যের আর একটা—'

'না, না। সব সময়ই তাঁকে দোষ দেবেন না বাবা। হয়তো আমার বোঝবার ভুল হয়েছিল। হয়তো কোথাও কোন ছাত্রের ওখানে আটকে পড়েছেন…'

পুত্রবধূর এ উত্তরে বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। একটু থেমে নীচু গলায় ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়েই জিজ্ঞেস করেন: 'আবার কি…শুরু করেছে না কি?'

লুইসা তাড়াতাড়ি জবাব দেয়: 'না, বাবা, না তো!'

বৃদ্ধ সোজা পুত্রবধূর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকান। লুইসা চোখ নামিয়ে নেয়।

'আমি জানি, তুই যা বল্লি তা সত্যি নয়। মিথ্যে বলছিস—'

নীরবে লুইসার ছু'চোখ জলে ভরে আসে। বৃদ্ধের অন্তর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে: 'হা ভগবান!' একটা জলন্ত কাঠ লাথি দিয়ে ঠিক করতে গিয়ে পায়ের সংস্পর্শে আগুন-উস্কানী লোহাটা সশব্দে পড়ে যায়। জননী ও শিশু ছুজনেই সহসা কেঁপে ওঠে। মিনতি ভরা কণ্ঠে লুইসা জানায়: 'দোহাই বাবা, আপনার পায়ে পড়ি···খোকা এক্ষুণি আবার কেঁদে উঠবে!'

কাঁদবে, না যেমন আহার করছিল, তেমনি আহার ক'রে চলবে, শিশু ছু এক সেকেণ্ডের মধ্যে ভেবে নেয়। কিন্তু কোনোটাই তক্ষুণি করা সম্ভব নয় দেখে, সে যেমন আহার করছিল, তেমনই ক'রে চলে।

জাঁ-মিচেল মনের জ্বালাকে বন্ধ ক'রে রাখতে পারলেন না, নীচু গলায় বলে উঠলেন:

'ভগবানের কাছে কি যে অপরাধ করেছিলাম যার জন্যে এমন মাতাল ছেলে তিনি আমাকে দিলেন! আমি যে সারা জীবন এইভাবে চালিয়ে এলাম, তাতে আমার কি লাভ হলো? জীবনের যা কিছু সুখ-সাধ তা থেকে নিজেকে যে বঞ্চিত ক'রে এলাম, কেন? কিসের জন্যে? কিন্তু তুই···তুই কি এটা বন্ধ করতে পারিস না মা? হায় ভগবান! স্ত্রী হিসেবে সেই তো ছিল তোর প্রথম কর্তব্য··· কেন তাকে বাড়িতে আটকে রাখতে পারিস না?'

লুইসার ছু'চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

'আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না বাবা···এম্‌নি আমার কম অশান্তি নেই! যা কিছু করতে পারি, আমি তার সব ক'রে দেখেছি। যদি জানতেন, একলা ঘরে কি রকম ভয়ে ভয়ে আমাকে থাকতে হয়! অষ্টপ্রহর মনে হয়, বাইরে সিঁড়িতে এই বুঝি তাঁর পায়ের শব্দ হলো···মনে হয়, এক্ষুণি দরজা খুলে ঢুকবেন·· ভগবানকে মনে মনে ডাকি, হে ভগবান, না জানি কি অবস্থায় দেখবো···রাতদিন এই ভাবনায় আমার শরীর ভেঙ্গে গেল—'

কান্না চেপে রাখতে পারে না লুইসা। বৃদ্ধ ব্যথিত হন। চেয়ার ছেড়ে লুইসার শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হন। ক্রন্দন-বেপথু স্কন্ধদেশের কাছে এলোমেলো বিছানাটা হাত দিয়ে ঠিক ক'রে দিয়ে ধীরে তার মস্তকে হাত বোলাতে থাকেন।

'ভয় কি? কিসের ভয়? আমি তো রয়েছি।'

পাছে শিশু ভয় পায়, সেইজন্য লুইসা নিজেকে সম্বরণ ক'রে নেয়। হাসতে চেষ্টা করে। বলে: 'আমি অন্যায় করেছি, এসব কথা আপনাকে ব'লে···'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেন :

'বাছারে, আমি জানি, উপহার দিলাম বলে গর্ব করার মতন কোন জিনিস তোকে দিই নি···তা আমি জানি—'

লুইসা বলে : 'না, না, এ সব আমারই দোষ বাবা। ওঁর উচিত হয়নি আমাকে বিয়ে করা। আমি জানি, উনি তার জন্যে কত কষ্ট পান!'

'কি, তুই কি বলতে চাস, তোকে বিয়ে ক'রে সে মনে করে যে সে ভুল করেছে?'

'আপনিও তাই মনে করেন বাবা। আপনি নিজেই তো রেগে গিয়েছিলেন আপনার ছেলের পাশে আমাকে দেখে।'

'সে-কথা নিয়ে এখন আর আলোচনা করবো না। সত্য বটে, সেদিন বিরক্তই হয়েছিলাম। ওর মতন একজন তরুণ যুবা, আমি জানি তুই কিছু মনে করবি না···যাকে আমি নিজের হাতে মানুষ ক'রে গড়ে তুলেছি, নামকরা একজন সঙ্গীত-শিল্পী, একজন সত্যিকারের আর্টিষ্ট, তার উচিত ছিল তোর চেয়ে ওপর থাকের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। তোর নিজস্ব বলতে কিছুই ছিল না, তা ছাড়া তুই এসেছিস সমাজের নীচের স্তর থেকে···এমনকি তোদের উপজীবিকাও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রায় একশো বছর ধরে ক্রাফ্‌ট বংশের কোন ছেলে কখনও এমন কোন মেয়ে বিয়ে করে নি, যে মেয়ে সঙ্গীত-শিল্পী নয়। কিন্তু তুই তো জানিস মা, তার জন্যে আজ আর তোর প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই···যেদিন থেকে তোকে বুঝতে শিখেছি, সেদিন থেকে তোকে রীতিমত ভালোই বাসি। তা ছাড়া, একবার যখন বেছে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তখন তো আর ফেরত দেওয়া যায় না। এখন শুধু একটি জিনিসই করবার আছে, আর সেটি হলো—যে যার কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে যাওয়া।'

দোলার কাছ থেকে বৃদ্ধ পুনরায় আগুনের কাছে চেয়ারে গিয়ে বসেন। কয়েক মুহূর্ত আপনার মনে কি যেন চিন্তা করেন, তারপর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে ওঠেন : 'জীবনের সর্বপ্রধান কাজ হলো, নিজের কর্তব্য পালন ক'রে যাওয়া।'

প্রতিবাদের অপেক্ষায় বৃদ্ধ আগুনের দিক চেয়ে বসে থাকেন। কিন্তু জননী বা নবজাতক কেউই যখন কোন প্রতিবাদের সুর তুলল না, বৃদ্ধ বুঝলেন, তিনি নির্বিবাদে বলে যেতে পারেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনিও নীরবে বসে রইলেন।

* * *

আর কোন কথা তারা কেউই বলল না। আগুনের ধারে বসে বৃদ্ধ জাঁ মিচেল এবং শয্যায় শায়িত অবস্থায় লুইসা, দু'জনেই বিষণ্ণ নীরবতায় জেগে জেগে যে যার নিজের স্বপ্ন দেখে। যা কিছু বৃদ্ধ বলুন না কেন, পুত্রের বিবাহ সম্পর্কে সত্যই তাঁর মন কোনো সান্ত্বনাই তো পায় নি। সেকথা লুইসাও ভাবতো, মনে মনে নিজেকে ধিক্কারও দিত, যদিও নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করবার মতন কোন অপরাধই সে খুঁজে পেত না।

যেদিন সে জাঁ-মিচেলের পুত্র মেলশিয়র ক্রাফ্‌টকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে, সেদিন সে ছিল সামান্য একজন পরিচারিকা। সকলেই এই অদ্ভুত সংযোগে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, সে নিজেও কম বিস্মিত হয় নি। ক্রাফট্‌দের সৌভাগ্য-সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না বটে, কিন্তু সেই রাইন্‌-নদীর ধারের ছোট্ট শহরটিতে বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ব'লে তাদের প্রভূত খ্যাতি ছিল। পঞ্চাশ বছর আগে একদিন বৃদ্ধ এই শহরে এসে বসবাস স্থাপন করেন এবং সেইদিন থেকেই তাঁরা এই শহরেই থেকে গিয়েছেন। পিতা এবং পুত্র দু'জনেই সঙ্গীত-শিল্পী এবং সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে তাঁদের দু'জনকে কলোন থেকে মানহেইম পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞই জানত ও চিনত। মেলশিয়র হফ থিয়েটারে বেহালা বাজাতো। জাঁ-মিচেল তাঁর সময়ে গ্রান্দ-ডুকাল কন্‌সার্টের পরিচালক ছিলেন। মেলশিয়র সম্পর্কে বৃদ্ধের মনে বিরাট এক দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই এই বিয়েতে বৃদ্ধ একান্ত-ভাবে ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হয়ে পড়েন। খ্যাতি ও যশের যে-সর্বোচ্চ শিখরে তিনি নিজেকে তুলতে পারেন নি, আশা ছিল, পুত্রকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত দেখবেন। কিন্তু পুত্রের এই উন্মাদ খেয়াল বৃদ্ধের সমস্ত আশা চুর্ণ ক'রে দিল। প্রথম প্রথম রাগে চিৎকার করেছেন,—মেলশিয়র আর লুইসা, দু'জনকেই সমানে অভিশাপ দিয়েছেন। কিন্তু যখন পুত্রবধূকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে বুঝবার সুযোগ পেলেন, তখন তাকে ক্ষমা না ক'রে পারলেন না। বাইরের রুক্ষ আবরণের আড়ালে বৃদ্ধের অন্তর স্বভাবতঃই ছিল সুকোমল। বাইরে বৃদ্ধ ভৎর্সনা না ক'রে বড় একটা কথা বলতেন না। কিন্তু সেই ভৎর্সনার আড়ালে তাঁর পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহস্পর্শই লুইসা অনুভব করত।

কিসের তাড়নায় মেলশিয়র যে এই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তা আজও পর্যন্ত কেউই বুঝে উঠতে পারে নি, মেলশিয়র নিজেও পারে নি। লুইসার রূপ যে নয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই ছিল না। বাইরে থেকে মানুষকে ভোলাবার মতো কোন গুণই তার ছিল না। দেখতে ছোট-খাট, ম্লান বিবর্ণ এবং

ক্ষীণজীবী এই মেয়েটি ছিল মেলশিয়র এবং জঁা-মিচেলের ঠিক বিপরীত। পিতা-পুত্র, দু'জনেরই বিশাল বপু, বিরাট রক্তাভ মুখ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু, প্রাণ খুলে পর্যাপ্ত আহার করতে তারা ভালোবাসে, হাসি, গল্পে, কলরবে আনন্দ পায়। তাদের বৃহৎ আয়তনের আড়ালে সে যেন চাপা পড়ে যেত, সে যে আছে, তা দৃষ্টিতেই পড়ত না; যতটুকু পড়ত তাও যেন সে এড়িয়ে থাকতে পারলেই বাঁচত। যদি মেলশিয়রের অন্তরে কোন কোমলতা থাকত, তা হলে একথা অনুমান করা হয়তো সম্ভব হতো যে, অন্য আর কিছু গুণ না থাকুক, লুইসার ভালমানুষীতেই সে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তার অপেক্ষা দাম্ভিক লোক আর-একটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার মতন একজন তরুণ পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবান যুবা, মোটামুটিভাবে সুন্দরই যাকে বলা চলে, এবং সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন, একান্ত অবিবেচক হলেও রীতিমত প্রতিভাশালী, ইচ্ছে করলেই যে বিপুল যৌতুকসহ যে-কোন সুপাত্রীর পাণিপীড়ন করতে পারত—হয়তো শহরে তার নিজের যে সব ছাত্রী আছে তাদের যে-কোন একজনের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারত, তা না ক'রে হঠাৎ যে এইভাবে অতি সাধারণ একটি মেয়ে,—দরিদ্র, অশিক্ষিত, রূপহীনা—তার জীবনের গতিপথে যে কোন সাহায্যই করতে পারবে না, তার নিকটেই সে আত্মসমর্পণ করল, একথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

জগতে এক ধরনের মানুষ আছে, লোক তাদের কাছে যা প্রত্যাশা করে, ঠিক তার বিপরীতটাই তারা ক'রে বসে। এমন কি, তারা নিজেরা যা ভাবে, কার্যকালে নিজেরা তার বিপরীত আচরণই করে। মেলশিয়র হলো এদেরই একজন। তারা যে সতর্ক থাকে না, তা নয়, কথাতেই বলে, সতর্ক লোক দু'জন লোকের সমান। তারা জোর গলায় জাহির করে, জগতে এমন কিছুই নেই যা তাদের বিমূঢ় ক'রে রাখতে পারে, তাদের বিশ্বাস, যে-কোন দুর্যোগের মধ্যেই তারা অভ্রান্তভাবে তাদের জীবন-তরণী স্থির লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা একটি মারাত্মক ভুল ক'রে বসে, নিজেদের মনের খবর বাদ দিয়েই তারা ভাবে। তারা জানে না যে, তারা নিজেদেরই চেনে না। এবং সেই আত্ম-অপরিচয়ের বিস্মৃতি তাদের জীবনে অনবরতই ঘটে, তারা শুধু ঢেউয়ের ওপর নির্ভর করেই তরণীর হাল ছেড়ে দেয়। এবং যখনই এভাবে নৌকোর হাল ছেড়ে দেওয়া হয়, নৌকোর দুষ্ট-বুদ্ধি তখন জেগে ওঠে, চালককে বানচাল করতে পারলেই তখন সে খুশি হয়। তাই নৌকো তখন পথ হতে সরে সোজা পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা খায়। মেলশিয়রও তাই এত আয়োজন ক'রে অবশেষে বিবাহ করল একজন পাচিকাকে। যেদিন

মেলশিয়র তার জীবনকে লুইসার সঙ্গে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে, সেদিন সে মাতালও ছিল না, বিবশ বিভ্রান্ত অবস্থায়ও ছিল না, অথচ অনুরাগের প্রবল তাড়নার আকস্মিকতাও তার পেছনে ছিল না,—তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হৃদয় আর মন ছাড়া, এমন কি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়াও, মনে হয়, আমাদের মধ্যে রহস্যময় এমন সব শক্তি সুপ্ত থাকে, ঠিক যে-মুহূর্তে অন্য সব অনুভূতি ঘুমিয়ে পড়ে, তারা তখন জেগে ওঠে। একদা সন্ধ্যাকালে যখন নদীর তীরে শর বনের ধারে লুইসাকে পাশে নিয়ে সে বসেছিল এবং নিজের অজ্ঞাতে তার দু'টি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল, হয়তো সেদিন লুইসার দুই ভীরু চোখের চাহনিতে সে সেই রহস্যময় শক্তিরই সন্ধান পেয়েছিল।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলশিয়র আতঙ্কিত হয়ে বুঝল, কি ভুলই না সে ক'রে ফেলেছে এবং এ সম্পর্কে তার মনোভাব বেচারা লুইসার কাছে গোপন রাখবারও কোন চেষ্টাই সে করল না। কুণ্ঠিত লুইসা ক্ষমা চাইল। মেলশিয়র খুব যে খারাপ লোক ছিল, তা নয়, অবস্থা বুঝে সে ক্ষমাই করত। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার অনুশোচনা ফিরে আসত। বাড়ির বাইরে বন্ধু-মহলে, কিম্বা তার ধনী ছাত্রীদের সংসর্গে যখন সে গিয়ে পড়ত, তার অনুশোচনা তীব্রভাবে ফিরে আসত। ইদানীং তার ছাত্রীরা আর আগের মতো তাকে সমীহ ক'রে চলে না। বিয়ের আগে সঙ্গীত শিক্ষার সময় যখন তাদের হাত ভুল কড়িতে গিয়ে পড়ত সংশোধন ক'রে দেবার সময় মেলশিয়রের আঙুলের সঙ্গে তাদের আঙুল যখন সহসা ঠেকে যেত, মেলশিয়র দেখত সে-স্পর্শে তারা গোপনে কেঁপে উঠত। ইদানীং সে-স্পন্দন আর তাদের জাগে না। বিষণ্ণ মুখে মেলশিয়র বাড়ি ফিরে আসে। লুইসা সে-মুখ দেখেই অন্তর থেকে বুঝতে পারে, এখনি অভ্যস্ত নিন্দার ঝড় উঠবে, কোন কোন দিন সোজা বাড়িতে ফিরত না মেলশিয়র। কোন-না-কোন সরাইখানায় ঢুকে পড়ত। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত সেই সরাইখানায় সন্ধান ক'রে ফিরত, অন্য কারও কাছে যদি সে-মর্যাদা আদায় করতে পারে, যদি অন্য কোন নারী সাময়িক করুণায়ও তাকে স্নিগ্ধ ক'রে দেয়। যেদিন তা' জুটত, সেদিন রাত্রিতে হাসিতে-হুল্লোড়ে পাড়া মাতিয়ে দিয়ে মেলশিয়র বাড়ি ফিরত। লুইসা ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠত। সে জানত এই উল্লাসের পেছনে আছে অন্যদিনের বিষণ্ণ মুখের নির্বাক গঞ্জনার চেয়ে ক্রূরতম আঘাতের আশঙ্কা। স্বামীর যেটুকু মমতা অবশিষ্ট ছিল, সংসারে অর্থের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাও অদৃশ্য হয়ে যেত, এবং তখন সে উন্মাদের মত আচরণ করত। লুইসা নিজের মনকে বোঝাতো, এ ব্যাপারের জন্য

অংশত সেই তো দায়ী। ক্রমশঃ মেলশিয়র ধাপের পর ধাপ নামতেই লাগল। যেটুকু ক্ষমতা তার আছে, এ বয়সে তার উচিত কঠোর অনুশীলনের দ্বারা, অবিশ্রান্ত নিষ্ঠার দ্বারা তা বিকশিত ক'রে তোলা। আর সে কিনা যা হয় হোক বলে হাল ছেড়ে দিল। তার স্থান অন্যে দখল ক'রে নিল।

যে-অজানা শক্তি কার জীবনকে স্বর্ণ-কেশী পরিচারিকার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিয়েছে, তাতে তার কি এসে যায়? যতটুকু করবার সে তো তা পালন করেছে …ছোট্ট জাঁ-ক্রিস্তফকে সে এই পৃথিবীতে এনে দিয়েছে।

* * *

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। অতীত ও বর্তমানের বেদনার কথা চিন্তা করতে করতে বৃদ্ধ জাঁ-মিশেল আত্মসমাহিত অবস্থায় আগুনের ধারে গিয়ে বসেন। পুত্রবধূর কণ্ঠস্বরে তাঁর চমক ভাঙ্গে।

স্নেহভরে লুইসা বলে : 'বাবা, রাত যে অনেক হয়ে গেল…আপনি বাড়ি ফিরে যান…অনেক দূর তো যেতে হবে আপনাকে।'

বৃদ্ধ জবাব দেন : 'মেলশিয়রের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি।'

'পায়ে পড়ি, বাবা…আমার কথা শুনুন…আপনি বাড়ি যান—'

'কেন?' ঘাড় তুলে বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে থাকেন।

লুইসা কোন উত্তর দিতে পারে না।

বৃদ্ধ পুনরায় বলেন : 'ভয় করছে তোর, না? তুই চাস না যে তার সঙ্গে আমি দেখা করি?'

'হাঁ…হাঁ বাবা! দেখা হলে আরো খারাপ হবে…আপনারা দু'জনেই রেগে যাবেন সেটা আমি মোটেই চাই না। পায়ে পড়ি আপনার, যান!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান। বলেন : 'বেশ…তাহলে…আমি যাচ্ছি…'

বিছানার কাছে এগিয়ে এসে অযত্ন-বর্দ্ধিত দীর্ঘ শ্মশ্রু দিয়ে পুত্রবধূর কপালে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেন। আর কোন প্রয়োজন কিছু আছে কিনা, জিজ্ঞেস করেন। ধীরে বাতি নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে কোন রকমে টাল সামলিয়ে ঘরের বাইরে চলে আসেন। কিন্তু বাইরের সিঁড়িতে পা ফেলতেই হঠাৎ মনে পড়ে যায়, যদি মেলশিয়র মাতাল হয়ে আজ বাড়ি ফিরে আসে ..! বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান, মাতাল অবস্থায় একা ঘরে যে-কোন অনর্থ সে করতে পারে, আশঙ্কায় বৃদ্ধ আর চলতে পারেন না।…

ঘরের ভিতর শয্যায় জননীর পাশে নবজাতক পুনরায় অঙ্গ-সঞ্চালন ক'রে নড়ে·

ওঠে। তার ক্ষণ প্রবাসের সুগভীরতা হতে যেন এক অজানা বেদনা জেগে উঠেছে। জননীর অঙ্গ ঘেঁষে সে স্থির হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে সারা দেহে কুঞ্চন ওঠে, হাতের মুঠো শক্ত ক'রে ধরে, কপালে কুঞ্চন-রেখা দেখা দেয়। ধীরে অনিবার্যভাবে বেদনা বেড়েই চলে। সে জানে না কি সে-বেদনা, কোথা হতেই বা আসছে তা। শুধু মনে হয়, যেন তা সুবিপুল, নিরবচ্ছিন্ন : অসহায়ভাবে সে কেঁদে ওঠে। কোমল কর-স্পর্শে জননী তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার বেদনার ভার কমে আসে। কিন্তু তবুও কান্না থামে না, তখনও মনে হয় সে-বেদনা যেন তার অতি নিকটেই রয়েছে, তার দেহের অভ্যন্তরে। পরিণত বয়সে মানুষ যখন বেদনা পায়, তখন সে-বেদনার জ্বালা সে সামান্য নিবোতে পারে, যদি সে জানতে পারে কোথায় সে-বেদনার উৎস! দেহের কোন্ অংশে তার উৎপত্তি, সে-ভেবে যদি তা স্থির করতে পারে, তখন প্রয়োজন হলে তা দূর করবার আয়োজনও করতে পারে, না হলে তাকে ছিঁড়ে টেনে ফেলেও দিতে পারে। সে বেদনাস্থলকে সীমার প্রাচীরে বেঁধে ফেলতে পারে, কিংবা তার সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু শিশুর নেই সে জ্ঞানসম্বল। তাই বেদনার সঙ্গে মানব-শিশুর প্রথম সংগ্রাম ঢের বেশী বেদনাময়, ঢের বেশী সত্য। তার নিজের সত্তার মতো মনে হয়, তার বেদনাও যেন অনন্ত। মনে হয়, সে-বেদনা যেন তার বক্ষে আসন বিছিয়ে বসে আছে; তার হৃদয়ে গৃহ নির্মাণ করেছে, তার সমস্ত অস্থি-মাংসের সে যেন স্বামিনী। এবং এটাই হলো রূঢ় সত্য। যতক্ষণ না তার দেহ শুষে শেষ ক'রে ফেলতে পারে, ততক্ষণ আর সে-দেহ ছেড়ে সে বেরোবে না।

শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে জননী কানে কানে বলে : 'ভয় নেই·· ওরে · ওরে আমার মানিক—' কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তার ক্রন্দন তেমনি উঠতে থাকে। তার সামনে সমগ্র অস্তিত্ব ব্যাপে যেন বেদনার রাজ্য পড়ে আছে, এই অগঠিত অচেতন মাংসপিণ্ড যেন তার পূর্বাভাস পেয়ে গিয়েছে। তাই কোন কিছুতেই সে সান্ত্বনা লাভ করতে পারছে না···।

রাত্রিতে সেণ্ট মার্টিনের গির্জায় ঘণ্টা বেজে ওঠে, ধীর-সুগভীর রোলে। শৈবালে পদধ্বনির মতন সিক্ত নৈশ বায়ুতে সেই শব্দের অনুরণন জাগে। মথিত ক্রন্দনের মাঝ-পথে সহসা শিশু নীরব হয়ে যায়। সেই অপরূপ ধ্বনি-সঙ্গীত, মাতৃ দুগ্ধের তরঙ্গের মতো, তার অন্তরকে যেন স্নিগ্ধধারায় অভিষিক্ত ক'রে দেয়। সহসা রাত্রি যেন আলোকময়ী হয়ে ওঠে, বাতাস মধুরতায় আর্দ্র হয়ে যায়, কোথায়

তলিয়ে যায় তার দুঃখের ভার। ফুলের মতন হেসে ওঠে অন্তর, মুক্তির শ্বাস ফেলে নিঃশব্দে সে আবার প্রবেশ করে তার স্বপ্নলোকে।

পর্যায়ক্রমে তিনটি ঘণ্টা মৃদু রোলে ঘোষণা ক'রে চলে আগামী প্রভাতের উৎসব বার্তা। সে-সঙ্গীতের ধারায় লুইসার মনও স্বপ্নলোকে চলে যায়, তার অতীতের বহু বেদনার স্মৃতি অন্তরে আপনা থেকে জেগে ওঠে। আর তার পাশে যে-শিশু নীরবে শুয়ে আছে, অদূর ভবিষ্যৎ কি সঞ্চয় ক'রে রেখেছে তার জন্যে? একাদিক্রমে বহু ঘণ্টা ধরে সে শয্যায় পড়ে আছে, ক্লান্ত, বেদনাদগ্ধ। হাত-প, সারা অঙ্গ তার জ্বলে যাচ্ছে; চারদিকের পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন জমাট বেধে তাকে পিষে ফেলছে; তবুও সে সাহস ক'রে নড়তে পারছে না। পাশে শিশুর দিকে বার বার চেয়ে দেখে, রাত্রির অন্ধকার সত্ত্বেও যেন তার মুখ-রেখা স্পষ্ট দেখতে পায়, সহসা মনে হয়, সে-মুখে যেন অতি-বার্ধক্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। ক্রমশঃ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ক্লান্ত মস্তিষ্কের পথে রোগাতুর ছায়ামূর্তি সব ঘোরাফেরা করে। স্বপ্নের মধ্যে মনে হয়, যেন মেলশিয়র এসে দরজা খুলল, হৃদয় তার কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে চারদিকের নীরবতার মধ্যে গৃহপার্শ্ববর্তী নদীর জল-মর্মরের শব্দ তীব্রতর হয়ে ওঠে, যেন অন্ধকারে কোন বন্য শ্বাপদ গর্জন করছে। বৃষ্টিধারাহত বাতায়ন যেন দু' একবার আর্তনাদ ক'রে উঠল। ঘণ্টার ধ্বনি ম্লান হয়ে আসে, ক্রমশঃ একেবারে থেমে যায়। পাশে শিশুকে বুকে নিয়ে লুইসা ঘুমিয়ে পড়ে।

এই সারাক্ষণ ধরে বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল বাড়ির বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন, সারা অঙ্গ ব্যাপে তাঁর বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে পড়ছে, দীর্ঘ শ্মশ্রু নৈশ হিমে সিক্ত, সঙ্কুচিত হয়ে আসে। দুর্বিনীত পুত্র কখন বাড়ি ফিরে আসে, তারই জন্য বৃদ্ধের এই অপেক্ষা; সারাক্ষণ ধরে তাঁর মনে শুধু এই দুশ্চিন্তাই পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে, মদ্যপানজনিত উন্মত্ততায় মানুষ কি ভয়াবহ অনাচারই না করতে পারে। যদিও সে-সব কথা বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না, তবুও পুত্রকে বাড়িতে ফিরে আসতে না দেখে তিনি চলে যেতেও পারছিলেন না, কারণ, এই অবস্থায় ফিরে গেলে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা ফেলতে পারবেন না। অদূরে গির্জার নিশীথ ঘণ্টার ধ্বনিতে মন আরও বিষণ্ণ হয়ে যায়, জীবনের সব ব্যর্থ আশার স্মৃতি সেই শব্দের সঙ্গে একে একে যেন মনে জেগে ওঠে। এই বৃষ্টি-সিক্ত রাত্রিতে এই ভাবে তাঁকে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, সে-কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ আর লজ্জায় তাঁর দু'চোখ জলে ভরে যায়।

*　　　　　　*　　　　　　*

দিবসের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ অতি ধীরে ওঠে আর নামে। সীমাহীন মহাসমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতো অনিবার্য ছন্দের শৃঙ্খলে বাঁধা দিন আসে আর রাত্রি যায়। সপ্তাহ শেষ হয়, মাস যায় চলে, আবার আসে। নতুন সপ্তাহ প্রতি দিবসের মতোই আসে, শিশুর কাছে আর একটা নতুন দিন।

আর একটি নতুন দিন! মনে হয়, সুবিপুল তার বিস্তার, মুখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। সমান মাত্রায় আলো আর অন্ধকারের তাল ঘোষণা ক'রে চলেছে, সেই তালে তাল দিয়ে চলেছে আলোকধর্মী শিশুর প্রাণ-স্পন্দন; তারই আলোক-দোলায় দুলে দুলে সে স্বপ্ন দেখে,—বেদনায় অথচ আনন্দে মোড়া তার যাবতীয় ঐকান্তিক প্রয়োজনের স্বপ্ন। আলো-আঁধারের ছন্দে এমন নিখুঁতভাবে গাঁথা তার জীবনের স্পন্দন, যেন মনে হয়, সেই আলো-আঁধারের ছন্দ থেকেই তার উৎপত্তি।

জীবন চলে দুলে দুলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো অতি গুরুভার ছন্দে। তার মন্দ-মন্থর গতিতে শিশু যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তা ছাড়া আর যা কিছু তা তো শুধু স্বপ্ন, টুকরো টুকরো স্বপ্ন, অবয়বহীন, ভাসমান। লক্ষ্যহীনভাবে নৃত্য ক'রে চলেছে চূর্ণ অণুর ধূলি-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণীর পর ঘূর্ণী সৃষ্টি ক'রে, তারই সঙ্গে চলেছে হাসি-অশ্রু, বিভীষিকার পর্যায়। চারদিকে তার তীব্র শব্দ, চলমান সব ছায়ামূর্তি, দুঃখ-বেদনা, ভয়, হাসি···তার কাছে মনে হয় যেন সব স্বপ্ন···তার দিন আর রাত্রি, সব স্বপ্ন দিয়ে গড়া···। তবু সেই বিশৃঙ্খল ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে নজরে পড়ে, স্নেহভরা চোখের চাউনি···বন্ধুর স্পর্শ। জননীর দেহের সংস্পর্শ থেকে, মাতৃ-স্তনের দুগ্ধ-ধারা থেকে দেহের মধ্যে জেগে ওঠে আনন্দের বন্যা। যে অজানা শক্তি তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে, ক্রমশঃ যেন তা সুবিপুল হয়ে ওঠে, তার ছোট্ট শিশু-দেহের বদ্ধ-কারায় যেন গর্জন ক'রে উঠতে থাকে দুরন্ত সাগর-তরঙ্গ। যার দেখবার দৃষ্টি আছে, সে যদি দেখতে চেষ্টা করে, তাহ'লে সেই শিশু-দেহের অন্তরালে দেখতে পাবে অন্ধকারে অর্ধনিমজ্জমান বিচিত্র সব পৃথিবী, কোথাও নীহারিকা থেকে মূর্তি ধরে জেগে উঠছে নতুন ধরণী···শিশুর দেহ···নবীন বিশ্বের সূতিকাগার;···শিশুর সীমাহীন সত্তা···যা কিছু আছে ব্রহ্মাণ্ডে, সবই যেন আছে তার ক্ষুদ্র দেহ-ভাণ্ডে।···

মাসের পর মাস চলে যায়···জীবনের ধারা-স্রোতের মধ্য থেকে একটি দুটি ক'রে মাথা তুলতে থাকে স্মৃতির দ্বীপ। কি আছে সেসব দ্বীপের অভ্যন্তরে, কতটুকুই

বা তার আয়তন, তখনও তার কোন মানচিত্র গড়ে ওঠে নি, শুধু জলের ভেতর হতে মাথা তুলে জেগে উঠছে নামহীন সব পর্বতশৃঙ্গ। তাদের বেষ্টন ক'রে উষার আলো-আঁধারীতে পড়ে আছে নিস্তরঙ্গ চেতনার বিরাট বিস্তার। একদা ধীরে প্রভাত-সূর্যের স্বর্ণ-কিরণ এসে পড়ে দ্বীপের প্রথম পর্বত-শৃঙ্গে···

ক্রমশঃ চেতনার সুগভীর গহ্বর হতে স্পষ্ট মূর্তি সব জেগে উঠতে থাকে···একটি দুটি ক'রে ঘটনার সুস্পষ্ট রেখা। তেমনি আসে সীমাহীন দিন, একটির পর একটি সেই একই ছন্দে বাঁধা, কিন্তু প্রত্যেক দিনের শৃঙ্খলের আড়ালে একটু একটু ক'রে জেগে উঠতে থাকে নতুন সব মূর্তি। কারও মুখে হাসি, কারও চোখে অশ্রু। ক্রমশঃ প্রতিদিবসের শৃঙ্খলও যেন আলগা হয়ে আসে, দিবসকে মনে করতে গিয়ে মনে পড়ে সপ্তাহ, মাস···

সেই কলস্বনা শব্দের নদী···সেই ঘণ্টার ধ্বনি···যত দূরে সে পিছনে তাকিয়ে দেখে, কালের সুগভীর অন্ধকার স্তরে, চেতনার প্রতি মোড়ে মনে হয় যেন সেই পরিচিত ধ্বনিই সে শুনে আসছে।

রাত্রি—তন্দ্রা আর নিদ্রার মাঝামাঝি। বাইরে কোথা হতে এক টুকরো মৃদু আলো এসে জানালাটাকে শুভ্র রঙে দেয় রাঙিয়ে ঘরের বাইরে কলস্বরা নদী চলেছে বয়ে···নিশীথে নীরবতার মধ্যে সেই অবিরাম কলধ্বনিকে যেন নিয়েছে স্বীকার করে বিশ্বচরাচর। কখনও বা সে-ধ্বনি কোমল কর-স্পর্শে নিদ্রাকে গাঢ়তর ক'রে তোলে···কখনও বা নিদ্রার সঙ্গে এক হয়ে যায় মিশে; আবার কখনও বা ক্রুদ্ধ গর্জনে হিংস্র জন্তুর মতন আঘাত করবার জন্য চিৎকার করে। চিৎকার থেমে যায়। তার পরিবর্তে ভেসে আসে অনন্ত মাধুর্যভরা মৃদু কলস্বর, ছোট ছোট ঘণ্টার স্পষ্ট মধুর রূপালী আওয়াজ—আনন্দ-মুখর শিশুদের হাসির মতো, কানে-কানে-গাওয়া গানের সুরের মতো, নাচের ছন্দের মতো, ঘুম-না-জানা কোন্ সে-অনাদি মায়ের ঘুমপাড়ানী সুর! তার সুরের দোলায় শিশুকে দোলায়, যুগযুগান্ত ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক যেমন দুলিয়েছে তার আগে যারা এসেছিল তাদের; সে-সুর তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, তার সকল স্বপ্নে জড়িয়ে যায়, এক অপরূপ তরল সঙ্গীতের আবরণে যেন তাকে আবৃত ক'রে রাখে। হয়তো যেদিন রাইনের জল-বিধৌত তীরে ছোট্ট সমাধি বয়ে সে আবার যাবে ফিরে, তখনও এই কল-মর্মর তার অন্ত-চেতনায় ধারে ধারে এমনি বাজতে থাকবে···

আবার সেই ঘণ্টা···রাত্রি প্রভাত! নব-উষা!

যেন একটির পর একটি তারা পরস্পর পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়ে ওঠে, বিধুর, বিষণ্ণ, সুপরিচিত, শান্ত। তাদের সেই প্রভাতী শব্দের আহ্বানে শিশুর অন্তরে জেগে ওঠে স্বপ্নের মিছিল। অতীতের সব স্বপ্ন, তার অজ্ঞাতে যারা তার বহু পূর্বে চলে গিয়েছে, অথচ যাদের মধ্যে তার সত্বা ছিল লুকিয়ে এবং তার মধ্যে যাদের সত্তা আজ আবার নব-জন্ম গ্রহণ করছে, আজ স্বপ্নরূপে ফিরে আসে তাদের সকলেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা। সে-শব্দসঙ্গীতে ঝরে পড়ে যুগ-যুগান্তের স্মৃতি। কত-না বিদায়-অশ্রু, কত না উৎসবের বাঁশী। মনে হয় যে-ঘরে সে শুয়ে আছে, সেই ঘরের বুকের ভিতর থেকেই যেন সে-শব্দ উঠছে…তার চারদিকের বায়ুমণ্ডলে যেন সে-শব্দের মধুর তরঙ্গ বয়ে চলেছে। মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখা যায় একফালি নীল আকাশ; মশারীর ঝালর ভেদ ক'রে শয্যায় এসে পড়ে এক টুকরো সূর্যের আলো। সেই তার পরিচিত পরিমিত পৃথিবী, প্রতিদিন প্রভাতে শয্যায় ঘুম ভেঙ্গে নয়ন মেললেই যা তার চোখে পড়ে। প্রাণপণ চেষ্টা করে দৃষ্টি-সীমাবদ্ধ সেই সব জিনিসকে মনে মনে শ্রেণী-বিভাগ ক'রে চিনে রাখতে, কেননা একদা সেই পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর পরিচালক তো তাকেই হতে হবে।

এমনি করেই প্রতি প্রভাতে আলোকিত হয়ে ওঠে তার রাজ্য। সামনেই দেখা যায় বড় টেবিলখানা, যেখানে বাড়ির লোকেরা বসে আহার করে, তার কাছেই খাবার রাখবার দেরাজ, যার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে খেলা করে। বিছানার নীচে টাইল-দেওয়া মেঝে, এরই উপর হামাগুড়ি দিয়ে সে চলে, সামনেই চিত্র-বিচিত্র সব কাগজ দিয়ে মোড়া দেয়াল, দেয়ালে বিচিত্রভঙ্গী নানা মূর্তি অঙ্কিত… তারা কত-না গল্প তাকে বলে, আর ঐ ঘড়িটা রাতদিন টকটক করে, কখনও বা তোতলার মতো বিচিত্র আওয়াজ ক'রে কত যে কথা বলে চলে, একমাত্র সে-ই শুধু সেসব বুঝতে পারে। আশ্চর্য, তার সেই ছোট্ট ঘরের মধ্যে কত-না বিচিত্র সব জিনিস! তাদের প্রত্যেককে অবশ্য সে জানে না, চেনে না। প্রতিদিন তাই তার নিজস্ব বিশ্বে সে আবিষ্কারে বেরিয়ে পড়ে। এ ঘরে যা কিছু আছে, সবই তার। এবং কিছুই মূল্যহীন নয়। মানুষ হোক আর মাছিই হোক, তার কাছে প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। তার কাছে সবই জীবন্ত…উনুনে যে আগুন জ্বলে, সামনের টেবিলটা, সূর্যের আলোয় যে-সব ধুলোর কণা নেচে বেড়ায়, ঘরের মধ্যে যে বিড়ালটা আসা-যাওয়া করে, সবই তার কাছে সমান জীবন্ত। এই ঘর, এটাই হলো তার দেশ, তার বিশ্ব-জগৎ। প্রতিটি দিন যেন একটা সম্পূর্ণ আলাদা জীবন। এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে একটা জীবনে সে কি ক'রে নিজেকে ধরে রাখবে? কি-

বিপুল এই বিশ্ব! যেন তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যেতে হয়। তাকে ঘিরে একি নিত্য কোলাহল, এত মুখ, এত যাওয়া-আসা, এত নড়া-চড়া, এত আওয়াজ··· মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে: চোখ বুঁজে থাকে, ঘুমিয়ে পড়ে। টেবিলের তলায়, দেরাজের পাশে, জননীর কোলে, কখন যে কোথায় তাকে ঘুমে পেয়ে বসে, সে ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। হঠাৎ কোথা হতে আসে ঘুম, গভীর, সুমধুর ঘুম, সে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।···ভালই লাগে · তার পৃথিবীতে সবই ভাল লাগে···

জীবনের এই প্রথম দিনগুলির স্মৃতি অন্তরে নিত্য আন্দোলিত হতে থাকে, শস্যভরা মাঠের মতন, বায়ু-বিতাড়িত অরণ্যের মতন, ভাসমান মেঘের মতন ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে তারা চলে যায়।···

ছায়ারা সব যায় মিলিয়ে; সূর্যের আলোকে আবার অরণ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ দিবসের আলো-ছায়া গোলক-ধাঁধার মধ্যে জাঁ-ক্রিস্তফ পথ ক'রে চলতে শেখে।

সবে প্রভাত হয়েছে। বাবা-মা দু'জনেই তখনো নিদ্রিত। পিঠে ভর দিয়ে নিজের ছোট্ট বিছানাতে শিশু শুয়ে আছে। দেখে, ঘরের ভিতর দেয়ালের গায় সূর্যের আলো এসে নৃত্য করছে। কি অদ্ভুত কৌতূহলই না আছে সেই আলোর নাচনের মধ্যে! হঠাৎ সে প্রাণ খুলে জোরে হেসে ওঠে, শিশুর মুখে সে-হাসি শুনে অন্তর আপনা থেকে আনন্দে দুলে ওঠে। সে-হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে জননী কৃত্রিম ক্রোধে জিজ্ঞেস করেন: 'কিসের হাসি দুষ্টু কোথাকার?' উত্তরে জাঁ-ক্রিস্তফ আরো হেসে ওঠে, শ্রোতা পেয়ে তার হাসির বেগ বাড়তেই থাকে। হঠাৎ দেখে, জননীর মুখ গম্ভীর, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ ক'রে থাকতে বলছে, পাছে বাবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু জননীর ক্লান্ত চোখের আড়ালে যে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠছে, শিশু তা লক্ষ্য করতে ভোলে না। যেন চুপি চুপি কানে কানে তারা দু'জনে কথা বলে। বিরক্ত বাবা চোখ বুঁজেই তর্জন ক'রে ওঠেন। ভয়ে তারা আর কোন কথা বলতে পারে না। অভিমান-আহত ছোট্ট মেয়েটির মতো জননী পেছন ফিরে শুয়ে থাকে: নিদ্রার ভান করে। জাঁ-ক্রিস্তফ লেপের ভিতর নিজেকে লুকিয়ে ফেলে···ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকতে চেষ্টা করে···সমস্ত ঘর আবার নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়···

লেপ ঢাকা দিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? সন্তর্পণে লেপের ভিতর হতে মুখ বের ক'রে জাঁ-ক্রিস্তফ শুধু তাকিয়ে থাকে। কান খাড়া ক'রে শোনে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসার শব্দ, পাইপের ভিতর দিয়ে জল-পড়ার শব্দ, বাতাসে ভেসে-

আসা ঘণ্টার ধ্বনি। যখন পূবদিক হতে হাওয়া বয়, তখন নদীর অপর পারের গ্রামের গির্জার ঘণ্টা এপারে প্রতিধ্বনি তোলে। বাইরে দেয়াল-ছাওয়া আইভি-লতার বনে চড়ুই পাখিরা সব এক জায়গায় জড়ো হয়েছে ; তাদের মিলিত চিৎকারের ভিতরে তিন-চারটি কণ্ঠ স্পষ্ট স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে···শিশুদের হট্টগোলের মধ্যে যেমন তিন-চারটি গলা স্পষ্টভাবে সকলকে ছাপিয়ে ওঠে। চিমনির মাথায় একটি পায়রা কোথা হতে এসে বক্-বকম করছে। এই সব বিভিন্ন শব্দের ঘুম-ভাঙানী ছন্দ শিশু তন্ময় হয়ে শোনে। শুনতে শুনতে ধীরে অতি মৃদু কণ্ঠে সে গুঞ্জন ক'রে ওঠে, তারপর আরো একটু জোর গলায় সে প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করে এবং ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে গলা চড়িয়ে চলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাহত-নিদ্রা পিতা বিরক্ত হয়ে আবার গর্জন ক'রে উঠেন : 'হতচ্ছাড়া গাধা, আবার চেঁচাচ্ছিস্···থাম, নইলে কান টেনে ছিঁড়ে দেবো !' জাঁ-ক্রিস্তফ আবার বিছানার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে, হাসবে কি কাঁদবে, ঠিক করতে পারে না। ভয়ও লাগে, ক্ষুব্ধ হয়। গর্দভের সঙ্গে তাকে তুলনা করা হয়েছে, সেকথা মনে মনে ভাবতে তার ভীষণ হাসি পায়। বিছানার ভিতরে লুকিয়ে গর্দভের অনুকরণে সহসা চিৎকার ক'রে ওঠে। এবার বাবা ভীষণ ধমকান। যত অশ্রু তার সঞ্চয়ে ছিল, বিন্দু বিন্দু ক'রে ঝরে পড়ে। সে এমন কি অপরাধ করেছে ? শুধু হাসতে চেয়েছিল, হাসতে হাসতে শয্যা থেকে উঠত। এখন আদেশ হলো : 'এক বিন্দু নড়বি না।' চিরকাল বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমোতে পারে কেউ ? কখন জাগবে তবে ?···

একদিন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হঠাৎ দেখল, ঘরের বাইরে একটা বিড়াল আর একটা কুকুর ঝগড়া করছে, আর সেই সঙ্গে একটা কি অদ্ভুত আওয়াজ রাস্তা থেকে আসছে। বিছানা থেকে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে টাইলের ওপর দিয়ে কোনরকমে টলতে টলতে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখতে চাইলে ব্যাপারটা কি ! কিন্তু দরজা বন্ধ। খুলবার জন্য একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সব শুদ্ধ নিয়ে পড়ে গেল। আঘাতের বেদনায় চিৎকার ক'রে উঠল। বাবা রেগে বেত নিয়ে ছুটে এলেন, পিঠে বেতের দাগ পড়ল। কেন বারে বারে তাকে বেতের প্রহার ভোগ করতে হয়···!

বৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে গির্জায় এসেছে। ভাল লাগছে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। তাকে নড়তে চড়তে বারণ করা হয়েছে। সব লোক একসঙ্গে মিলে কি যেন বলছে, সেসব কথা সে বুঝে উঠতে পারছে না। সবাই যেন বিষণ্ণ, গম্ভীর।

সকলেই কেমন যেন এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে তাদের দিকে সে চেয়ে দেখে। তাদের প্রতিবেশিনী লীনা বুড়ী ঠিক তার পাশেই বসে ছিল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝল যেন বুড়ী ভীষণ বিরক্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে তার নিজের পিতামহের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, তাঁকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। ·প্রথম প্রথম ভয় করত। ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে গেল···তার সামনে আয়ত্তের মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই নিয়ে সেই অস্বস্তি দূর করতে চেষ্টা করে। হঠাৎ এক পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে, ঘাড় বেঁকিয়ে ছাদে কি আছে দেখতে চেষ্টা করে, অকারণে মুখ ভেংচায়, ঠাকুরদার লম্বা কোট ধরে টান দেয়, ভাঙ্গা চেয়ারের খড় উঠিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখে, আঙুল দিয়ে ছেঁড়া চেয়ারে গর্ত করে, বাইরে কোথাও পাখিরা ডাকছে, উৎকর্ণ হয়ে শোনে, জোর ক'রে হাই তুলে পাশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে।

এমন সময় হঠাৎ শব্দের বন্যা ভেসে আসে: অর্গ্যান বাজছে। তার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন আনন্দের শিহরণ প্রবাহিত হয়ে যায়। চেয়ারের হাতলে চিবুক রেখে সে দাঁড়িয়ে ওঠে, সমস্ত মুখের চেহারা বিজ্ঞের মতো স্থির গম্ভীর হয়ে যায়। হঠাৎ কেন যে সেই সঙ্গীতের কল্লোল জেগে উঠল, তা সে বুঝে উঠতে পারে না, কি বা তার অর্থ তাও সে ঠিক ধরতে পারে না। বিপুল বিস্ময়ে তার যেন ধাঁধা লেগে যায়, কিছুই স্পষ্ট ক'রে আলাদা ক'রে শুনতে পায না। কিন্তু তবুও ভাল লাগে। মনে হয়, যেন সেই জঘন্য পুরনো বাড়িতে সেই ভাঙ্গা বিশ্রী চেয়ারে আর সে বসে নেই; পাখির মতো মাঝ-আকাশে সে যেন উড়ে চলেছে। গির্জার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সেই শব্দের বন্যা ছুটে চলে, ঘরের প্রত্যেক কোণ ভরাট হয়ে যায়, দেয়ালে দেয়ালে তার অনুরণন জেগে উঠতে থাকে; মনে হয়, সেই শব্দ-তরঙ্গে সে যেন এদিক ওদিক চারদিকে ভেসে চলেছে, সে-তরঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়া ছাড়া যেন তার করবার আর কিছুই নেই। কি মুক্তি! কি আনন্দ। সুখের সোনালী আলো চারধারে··· সঙ্গীতের তরঙ্গে দুলতে দুলতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পিতামহ, ফিরে দেখেন, সে নিদ্রিত। বিরক্ত হন মনে মনে। উপাসনার সময় নাতির এই অভদ্র ব্যবহারে বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ হন।

বাড়িতে ফিরে এসে ঘরের মেঝেতে সে খেলতে বসে। এই মাত্র সে সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছে যে, মেঝের ওপরের মাদুরটুকু হলো তার নৌকো, টালি-দেওয়া সেই মেঝে আজ হয়েছে তার নদী। মাদুর থেকে নামতে গিয়ে আর-একটু হলে সে

জলে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এত বড় যে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, কই, সে-সম্বন্ধে কারও তো কোন দৃষ্টি নেই! মা ঘরে আসতেই সে ঘাগ্‌রার পাড় ধরে টানে। 'দেখছো না, চারদিকে জল···সাঁকোর ওপর দিয়ে যাও!' (লাল টালির মধ্যে মধ্যে যে সব ফাটল ধরেছিল, সেইগুলিই সাঁকো।) তার কথায় কর্ণপাত না করেই মা নদী পার হয়ে যায়। শিশু ভীষণ চটে যায়, নাট্যকার যেমন চটে যায়, যদি দেখে শ্রোতারা অভিনয়ের মধ্যে গল্প করছে।

পরমুহূর্তেই সে-সব কথা ভুলে যায়। সেই টাইল-দেয়া মেঝে আর তার কাছে নদী নয়, নির্বিঘ্নে তার উপর শুয়ে পড়ে স্বরচিত সঙ্গীতে গুণ গুণ ক'রে সুর দিতে দিতে পরমানন্দে নিজের বুড়ো আঙুল চুষতে থাকে। সামনে দুটি টাইলের মাঝখানে একটা জায়গা ফেটে গিয়েছে, সেদিকে নিবিষ্টচিত্তে দেখতে থাকে। টাইলের ধারগুলো মনে হয় যেন তার বিচিত্র মুখভঙ্গী : দুই পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকা ভূমির মতন! ফাটলের মাঝখানের সামান্য গর্তটুকু ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে, চারদিকে তার পাহাড়। একটা পোকা নড়ে বেড়ায়. দেখতে দেখতে পোকা হাতীর মতো বড় হয়ে ওঠে। জাঁ-ক্রিস্তফ তন্ময় হয়ে যায় : বাইরে বজ্রপাত হয়ে গেলেও, সে শুনতে পাবে না।

সে কি করছে, কি ভাবছে, সে-সম্বন্ধে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। সে-ও অন্য কোন লোক সম্বন্ধে কোন খবরই রাখতে চায় না। সেই মাদুর-নৌকো আর টাইলের রাজ্যে ভ্রাম্যমাণ সব জীব-জন্তুর দল, তাদের না হলেও তার কিছু এসে যায় না। তার নিজের দেহই তার পক্ষে যথেষ্ট। কি বিচিত্র কৌতুহলের আবেদন তার নিজের মধ্যেই রয়েছে। বহুক্ষণ ধরে নিজের হাতের আঙুলের নখের দিকেই চেয়ে থাকতে থাকতে খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে। তাদের যেন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মুখ, যেমন সব মুখ সে তার আশে-পাশে দেখে। শুধু কি নখ! তার দেহের প্রত্যেকটি অংশ···যা কিছু তার দেহে আছে, সে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে। কি বিচিত্র! কি আশ্চর্য! দেখতে দেখতে সে আবার তন্ময় হয়ে যায়।

সেই অবস্থায় তাকে যারা মাটি থেকে তুলে নেয়, তারা অন্যায়ভাবে অযথা তার ওপর জোর প্রকাশ করে। শিশু ব'লে তাকে সহ্য করতেই হয়।

মাঝে মাঝে তার মা পিছন ফিরলেই সেই অবসরে সে বাড়ির বাইরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতো। প্রথম প্রথম সে ধরা পড়ে যেত, ছুটে এসে মা তাকে টেনে

ধরে নিয়ে যেত। ক্রমশঃ তাকে একলা ছেড়ে দিতে তারাও অভ্যস্ত হয়ে গেল, তবে বেশী দূরে সে যেত না। বাড়িটা শহরের এক প্রান্তে, একেবারে শেষের দিকে। তাদের বাড়ির পর থেকেই গ্রাম শুরু হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ির জানালা দেখা যেত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হয়ে যেত, মাঝে মাঝে দৌড়তও। কিন্তু রাস্তার বাঁক পার হতেই ঘন ঝোপে যখন বাড়ি ঢাকা পড়ে যেত, সে থেমে পড়ত। মুখে আঙুল গুঁজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবত, আজ কি গল্প সে নিজেকে শোনাবে। গল্পে ভর্তি তার মন। অবশ্য একথা ঠিকই যে, তার অধিকাংশ গল্পই দেখতে-শুনতে প্রায় একই রকমের এবং প্রত্যেক গল্পটিই দুই এক লাইনেই বলে শেষ করা যায়। মনে মনে সে বাছতে শুরু করে। অধিকাংশ সময় সে একই গল্প আরম্ভ করে, কখন কখন যেখান হতে আগে দিন ছেড়ে গিয়েছিল, তার পর থেকে ভাবতে শুরু করে, কখনও বা একটু অদল-বদল ক'রে গোড়া থেকেই আরম্ভ করে। তবে দৈব-সংযোগে সামান্য একটা আওয়াজ যদি তখন কানে আসে, সামান্য একটা শব্দ···তাহলে সম্পূর্ণ আলাদা আর-এক দিকে তার মন তখন চলে যায়।

কি বিপুল সম্ভাবনাই না আছে এই ধরনের দৈব-সংযোগের মধ্যে। বেড়ার ধারে কুড়িয়ে-পাওয়া একটা ভাঙ্গা ডাল, এক টুকরো সামান্য কাঠ, তা থেকেই কত যে কি হতে পারে, সে-কল্পনার আর শেষ নেই। ভাঙ্গা ডাল, দেখতে দেখতে যাদুকরের মন্ত্রপূত কাঠি হয়ে যায়। যদি লম্বা আর সরু হয়, তাহলে অনায়াসে সেটাকে বর্শা করা যায়, কিম্বা তলোয়ারও হতে পারে। তাকে ভাল ক'রে একবার শূন্যে ঘুরোতে পারলেই মাটি হতে দলে দলে সৈনিকরা জেগে ওঠে। জাঁ-ক্রিস্তফ তাদের সেনাপতি, তাদের সকলের আগে আগে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে, সে হলো তাদের নেতা, আদর্শ সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে সামনের পর্বত-শৃঙ্গ অধিকার করবার জন্য সে জোর কদমে চলেছে। যদি ডালটিকে দুমড়িয়ে নোয়ানো সম্ভব হয়, তাহলে অনায়াসেই সেটাকে চাবুকে রূপান্তরিত করা যায়। চাবুক হাতে জাঁ-ক্রিস্তফ ঘোড়ায় চড়ে দুরারোহ পর্বত-শৃঙ্গ অনায়াসে লাফিয়ে অতিক্রম ক'রে চলে। দৈবাৎ কখনো যদি অশ্বের পা পিছলে যায়, অশ্বারোহী তখন মাটির নীচে খানায় গড়াগড়ি দেয়, হাত-পা কর্দমাক্ত, কখনও বা হাঁটু ছড়ে রক্ত দেখা দেয়। যদি ডালটি আরও সরু লিকলিকে হয়, তখন তা নিয়ে জাঁ-ক্রিস্তফ অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করতে শুরু ক'রে দেয়। অর্কেষ্ট্রা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সে গানও গায়। গান শেষ হয়ে গেলে, হাতের ছড়িটা মাথায় ঠেকিয়ে ঈষৎ মাথা নত ক'রে সামনের

ঘন-সবুজ লতা-গুল্মকে অভিবাদন জানায়, কারণ তারাই তো তার শ্রোতা। বাতাসে ছোট ছোট সবুজ মাথা দুলিয়ে তারাও প্রত্যভিবাদন জানায়।

যাদুবিদ্যাতেও এ ছেলের কম অধিকার জন্মায় নি। মাঠের মধ্য দিয়ে বড় বড় পা ফেলে চলত সে, আকাশের দিকে তাকিয়ে নানা রকমের হাতের ভঙ্গী করত। যাদুবলে মেঘেদের ওপর ছিল তার আধিপত্য। সে তাদের আদেশের সুরে বলত ডান দিকে যেতে, কিন্তু তারা যদি তার আদেশ অমান্য ক'রে বাঁ দিকে চলে যেত, সে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ভৎর্সনা করত, আবার আদেশ দিত। চোখ দুটো প্রায় বুঁজে আড়-নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখত, আশায়-আশঙ্কায় অন্তর কাঁপতে থাকত, ছোট এক টুকরো মেঘও কি আজ তার আদেশ পালন করবে না? কিন্তু মেঘের দল নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে বাঁ-দিকেই সরে যেত। মাটিতে পা ঠুকে, হাতের যাদুদণ্ড আকাশের দিকে তুলে ধরে রাগে তখন আদেশ করত: 'তা হলে এবার বাঁ দিকেই যাও!' এবার, সত্য সত্যই, তারা তার আদেশ শিরোধার্য ক'রে চলল। নিজের শক্তির এই স্পষ্ট প্রমাণে গর্ব বোধ করত, আনন্দিত হতো বালক। সে গল্পে যেভাবে শুনেছিল, ঠিক সেই ভাবে ফুলেদের কাছে গিয়ে সন্তর্পণে তাদের স্পর্শ করত। এবং সেই সঙ্গে আদেশ করত, অবিলম্বে স্বর্ণ-রথে পরিবর্তিত হয়ে যাবার জন্য। যদিও স্বর্ণ-রথ তখনই দেখা যেত না, তবে তার স্থির বিশ্বাস ছিল, ধৈর্য ধরে যদি অপেক্ষা ক'রে থাকা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই তারা স্বর্ণ-রথে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কখন বা ফড়িং ধরে তাকে খরগোশে রূপান্তরিত করাতে চেষ্টা করত। আস্তে আস্তে তার পিঠে যাদুদণ্ড স্পর্শ ক'রে মনে মনে মন্ত্র জপত। ফড়িং পালাতে চেষ্টা করত, সে বাধা দিত। কিছুক্ষণ পরে মাটিতে তার কাছাকাছি উবুড় হয়ে শুয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, চেয়ে থাকতে থাকতে সে ভুলেই যেত যে সে যাদুকর। কাঠি দিয়ে তাকে উল্টে পাল্টে তার অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে হেসে উঠত।

মাঝে মাঝে তার সেই যাদুদণ্ডে সুতো বেঁধে গম্ভীরভাবে সে নদীর জলে ছিপ ফেলত, অপেক্ষা ক'রে থাকত, মাছ এসে সুতোয় আটকে যাবে। অবশ্য সে খুব ভালোভাবেই জানত যে মাছেরা টোপ ছাড়া শুধু সুতোয় কখনও কামড়ায় না, বা বঁড়শি ছাড়া তাদের তোলাও যায় না, তবুও তার মনে আশা, হয়তো একবার অন্ততঃ তারা তার খুশির জন্যে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করবে। এবং এমনই সুগভীর ছিল তার বিশ্বাস যে, একবার রাস্তার ধারে একটা চাবুকের ডগায় সুতো বেঁধে এক নর্দমায় মাছ ধরতে বসেছিল। উত্তেজিতভাবে মাঝে মাঝে ছিপ তুলে

দেখে, মাছ ধরেছে কিনা। হঠাৎ একবার যেন মনে হয় খুব ভারী বোধ হচ্ছে, তার ঠাকুরদাদার কাছে শুনেছিল, মাছ ধরতে গিয়ে কে যেন ছিপে এক সিন্দুক মোহর তুলেছিল, ঠিক যেন তেমনি ভারী বোধ হচ্ছে···অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ছিপ টেনে তোলে···

এইসব খেলার মাঝখানে হঠাৎ কোথা হতে তার মনে বিচিত্র স্বপ্ন নেমে আসে পরিপূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে সে তলিয়ে যায়। তখন তার আশেপাশে চারদিকের সব কিছু যেন মুছে যায়, সে যে কি করছে, তাও মনে থাকে না, এমন কি নিজের সম্বন্ধেও অচেতন হয়ে যায়। হঠাৎ কখন যে এইভাবে স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসে তার কিছুই ঠিক-ঠিকানা নেই। পথ দিয়ে হেঁটে চলতে চলতে কিংবা সিঁড়ির ওপর উঠতে উঠতে হঠাৎ তার সামনে এক মহাশূন্যতা যেন মুখব্যাদান ক'রে আসে। তখন মনে হয়, কোন ভাবনা, বা কোন চিন্তাই যেন তার মনের কোথাও নেই। যখন সম্বিৎ ফিরে আসত, সভয়ে দেখত সেই অন্ধকার সিঁড়িতে সে তেমনি ঠিক সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ—মনে হতো তার মধ্যে যেন একটা সমগ্র জীবনকালই অতিবাহিত হয়ে গেল।

ঠাকুরদা প্রায়ই তাকে সঙ্গে নিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোতেন। ঠাকুরদার গা ঘেঁষে পাশে পাশে চলত, তাঁর হাতের মধ্যে নিজের ছোট্ট হাতখানি তুলে দিত। কখনও রাস্তা দিয়ে, কখনও বা সদ্য-কর্ষিত মাঠের মধ্য দিয়ে তারা চলত, মাঠের কর্ষিত-মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ ভারী ভাল লাগত। অন্ধকারে ঝিল্লি ডেকে উঠত। বৃহদাকার সব কাক রাস্তার ওপর বসে দূর হতে তাদের লক্ষ্য করত, তারা কাছে এসে গেলে ভারী ডানার আওয়াজ ক'রে অন্ধকারে উড়ে যেত।

বৃদ্ধ হঠাৎ খ খ ক'রে কেশে উঠতেন। সে কাশির কি অর্থ তা জাঁ-ক্রিস্তফ ভাল ক'রে জানে। গল্প বলবার জন্য বৃদ্ধ উস্‌খুস্ করছেন—এই কাশি হলো তারই বিজ্ঞাপন। কিন্তু বৃদ্ধের ইচ্ছা, বালক কৌতূহলী হয়ে আগে তাঁকে অনুরোধ করুক গল্প বলার জন্য। বৃদ্ধ ভালো বাসেন তাঁর নাতিকে, তাঁর সকল কথার এমন সহৃদয় শ্রোতা আর দ্বিতীয় ছিল না। কৌতূহলী হয়ে বালক যখন গল্প বলবার জন্য পীড়াপীড়ি করত, বৃদ্ধের তখন বিপুল আনন্দ হতো। নিজের অতীত জীবনের টুকরো টুকরো কাহিনী বলতে শুরু ক'রে বৃদ্ধ ক্রমশঃ অতীত ইতিহাসের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ে চলে যেতেন।

রেগুলাসের আর আর্মিনিয়াসের কাহিনী, লুতজাউ-এর সৈন্যদের বীরত্ব ফ্রেডারিক স্টাবস্—যে-সম্রাট নেপোলিয়নকে হত্যা করতে গিয়েছিল, একে একে

তাদের সকলের গল্প বৃদ্ধ বলে যেতেন। সেই সব অপরূপ বীরত্বের কাহিনী বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ইতিহাসের সেইসব বীর নায়কদের নাম উচ্চারণ করবার সময় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আবেগে এমন গম্ভীর হয়ে আসত যে জাঁ-ক্রিস্তফ অনেক সময় নামগুলো স্পষ্ট ক'রে শুনতে পেত না, গল্প বলতে বলতে যেখানে নাটকীয় মুহূর্ত এগিয়ে আসত, বৃদ্ধ ইচ্ছে করেই সেখানে এমন কৌশল অবলম্বন করতেন যাতে শ্রোতা ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলতে বলতে সেই মুহূর্তের ঠিক মুখে এসে থেমে পড়তেন, এমন ভাব দেখাতেন যে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে. সশব্দে একবার নাক পরিষ্কার করে নিতেন, শিশু উৎকণ্ঠা আর চেপে রাখতে না পেরে আপনা থেকে জিজ্ঞেস ক'রে উঠত: 'হাঁ তারপর কি হলো দাদু? এই প্রশ্নটুকু শুনবার জন্যেই বৃদ্ধ এত কাণ্ড করতেন, তাঁর অন্তর দ্বিগুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এমন একদিন এল, যখন জাঁ-ক্রিস্তফ পিতা-মহের সেই কৌশল বুঝে ফেলল। তখন দুষ্টুমি ক'রে এমন উদাসীন ভাব দেখাত, যেন গল্পের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে তার আর কোন আগ্রহই নেই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। কি নিয়ে এইসব গল্প, তা সে ভাল করে বুঝতও না, কখন বা কোথায় যে এইসব ঘটনা ঘটেছে তারও কোন স্পষ্ট ধারণা তার ছিল না, তার ঠাকুরদা আর্মিনিয়াসকে দেখেছেন কি দেখেন নি, তা বুঝে উঠতে পারে না। গত রবিবারে গির্জায় যে সব লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার মধ্যে কেউ হয়তো রেগুলাস্ হবে,—ভগবানই জানেন কেনই বা হবে না!—কিন্তু তা নিয়ে সে মাথা ঘামাতো না। পথ চলতে চলতে তারা দু'জনেই সেই বীরত্বের কাহিনীতে গর্বে, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠত, যেন তারা দু'জনেই সেই সব ঘটনার নায়ক। সেই বৃদ্ধ আর সেই শিশু দু'জনেই তারা সেই এক জায়গায় ছিল সমবয়সী, সমান শিশু।

মাঝে মাঝে ঠাকুরদা সেই নব নাটকীয় মুহূর্তের সকরুণ বর্ণনার মধ্যে, কি যেন সব জটিল তত্ত্বকথা জুড়ে দিতেন, জাঁ-ক্রিস্তফের সুর কেটে যেত। বুঝত সেই ধরনের কথা বলতে ঠাকুরদার বড়ই ভাল লাগে। যে-কোন একটা বিষয় নিয়ে এই ধরনের উপদেশ দিতেন এবং খুব অল্প কথাতেই তিনি তা প্রকাশ করতেন। যেমন আঘাত করার অপেক্ষা আঘাত সহ্য করাই শ্রেয়, অথবা জীবনে আত্মমর্যাদাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কিংবা, মন্দ হওয়ার চেয়ে ভাল হওয়া ঢের কঠিন—তবে মাঝে মাঝে এসবের অপেক্ষা আরও জটিল গুরু-গম্ভীর কথাও বৃদ্ধ বলতেন। তখন জাঁ-

ক্রিস্তফের বুঝতে বড়ই অসুবিধা হতো। তবে বালক-শ্রোতার সমালোচনা সম্পর্কে বৃদ্ধের কোন আশঙ্কাই ছিল না, তাই তিনি যা বলতেন নির্ভয়ে জোর দিয়েই বলতেন। প্রয়োজন হলে কোন কথা বারবার ক'রে বলতেন কিংবা, কোন কথা যদি বলে শেষ ক'রে উঠতে না পারতেন, তা হলে নিঃশঙ্কচিত্তে সে-কথা অসমাপ্তই রেখে দিতেন ; বলতে বলতে যদি খেই হারিয়ে যেত, শূন্য স্থান ভরাট করবার জন্য মাথায় যা আসত নির্বিবাদে বৃদ্ধ তাই বলে যেতেন। কোন কথার ওপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দিতে হলে, তিনি হঠাৎ অসঙ্গত জোরে সেই কথাটা চিৎকার ক'রে বলে উঠতেন। বালক শ্রদ্ধাভরে সব শুনত, যদিও মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ হতো, তবুও সে জানত, তার পিতামহ রীতিমত একজন সুবক্তা।

কর্সিকার যে বিজয়ী বীর সমগ্র য়ুরোপকে একদা পদানত করেছিলেন, বারে বারে তাঁরই কথা বলতে এবং শুনতে বৃদ্ধ ও বালকের, দু'জনেরই ভাল লাগত। জাঁ-ক্রিস্তফের পিতামহ সেই বীরকে সাক্ষাৎভাবে জানতেন। সেই জগজ্জয়ী বীরের বিরুদ্ধে এক রকম তাঁকে সংগ্রাম করতেও হয়েছিল। কিন্তু বিপক্ষ বলে তিনি যে তাঁর মহত্ব অস্বীকার করবেন এমন লোক তিনি নন্। অন্ততঃ কুড়িবার এই এক কথা বৃদ্ধ বালককে শুনিয়েছিলেন। যদি রাইন নদীর এই দিকে নেপোলিয়নের মতো কোন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলে বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে প্রয়োজন হলে তাঁর নিজের হাত স্বেচ্ছায় কেটে দিতে পারতেন, কিন্তু সেই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেই তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়। নেপোলিয়ন তখন দশ লীগের মধ্যে এগিয়ে এসেছেন, তাঁর সম্মুখীন হবার জন্য তাঁরা অগ্রসর হয়ে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁদের ছোট্ট দল ভয়ে সামনের অরণ্যের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে লুকিয়ে পড়ল, যে যার ভয়ে পালিয়ে যেতে যেতে চিৎকার ক'রে উঠল : 'নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে !'···অতীত দিনের সেই পরাজয়কে ঢাকবার জন্য বৃদ্ধ বলে চলেন : 'বৃথাই, বৃথাই সেই পলাতক সৈন্যদের আবার একত্র করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, তাদের সামনে গিয়ে কত-না অনুরোধ করলাম, ভয় দেখালাম, কাঁদলাম, কিন্তু কিছুই হলো না, তারা আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে চলে গেল। পরের দিন ভোর বেলা দেখলাম, 'যুদ্ধক্ষেত্র হতে বহুদূরে চলে এসেছি ··' সেই পলায়নের ব্যাপারকে বৃদ্ধ যুদ্ধ বলেই নাতির কাছে পরিচয় দেন। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ বৃদ্ধ পিতামহের যুদ্ধ কীর্তির চেয়ে কর্সিকার সেই বিজয়ী বীরের কথাই বেশী ক'রে শুনতে চায়, তাই বারে বারে তাঁর কথাই জিজ্ঞেস করে। সেই বীরপুরুষের অপূর্ব বিজয়-অভিযানের কাহিনী বালক তন্ময় হয়ে শোনে।

কল্পনার নেত্রে সে দেখে, অসংখ্য লোক নেপোলিয়নকে অনুসরণ ক'রে চলেছে, সপ্রেমে তাঁর জয়-বার্তা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করছে, তাঁর হাতের সামান্য ইঙ্গিতে দলে দলে সৈন্য পলাতক শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে···নেপোলিয়নের শত্রুদের যখনই দেখত, দেখত তারা পালাচ্ছে। নেপোলিয়নের কাহিনীকে বালক-শ্রোতার কাছে আরও রোমাঞ্চকর করবার জন্যে বৃদ্ধ ইতিহাসের বেড়া ভেঙ্গে নিঃশঙ্কচিত্তে বলে যেতেন, নেপোলিয়ন স্পেন জয় করেছিলেন এবং ইংলণ্ডও প্রায় জয় ক'রে নিয়েছিলেন।

বৃদ্ধ ক্রাফট্ সেই উত্তেজনাময় কাহিনী বলতে বলতে মাঝে মাঝে কাহিনীর নায়ককে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সম্বোধন ক'রে উঠতেন। তাঁর মধ্যে তখন সহসা স্বদেশপ্রেম জেগে উঠত, বিশেষ ক'রে যখন সম্রাটের পরাজয়ের প্রসঙ্গ আসত। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে পড়তেন, নদীর দিকে বদ্ধ মুষ্টি তুলে অসীম ঘৃণায় গালাগাল দিয়ে উঠতেন : 'রাস্‌স্কেল'···'বুনো জানোয়ার'···'অসভ্য'। বালক-শ্রোতার মনে ঐতিহাসিক সুবিচারের একটা ধারণা জন্মাবার উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধ ঐ সব শব্দ প্রয়োগ করতেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। কারণ, বালক নিজস্ব যুক্তির ধারানুযায়ী অনেক আগেই তার মনে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গড়ে নিয়েছিল : 'যদি তাঁর মতন একজন মহাপুরুষ অসভ্য হয়, তা হলে বুঝতে হবে, সভ্যতা এমন কিছু বড় জিনিস নয়, আসল ব্যাপার হলো, মহাপুরুষ হওয়া!' তাঁর পাশে থেকে বালক যে এভাবে চিন্তা করছে, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশই বৃদ্ধের মনে জাগত না।

গল্প শেষ হলে তারা দু'জনে আবার পাশাপাশি নীরবে চলতে থাকে, দু'জনেই দু'জনের মতো ক'রে সেই সব অদ্ভুত কাহিনীর কথাই মনে মনে রোমন্থন করে। কখনও কখনও হয়তো বৃদ্ধের সঙ্গে পথে কোন সম্ভ্রান্ত পৃষ্ঠপোষকের দেখা হয়ে যেত। বৃদ্ধ সম্ভ্রমভরে দাঁড়িয়ে পড়তেন, ঈষৎ মাথা নত ক'রে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার বাঁধা বুলি সবিস্তারে উচ্চারণ করতেন। নিজের অজ্ঞাতেই বালক লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। পিতামহের সেই দীনভাব সে সহ্য করতে পারত না। বালক জানত না যে তার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা এবং সরকারী প্রভুত্বকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন। যে-সব বীরপুরুষের গল্প বলতে বৃদ্ধের ভাল লাগত, সাধারণ লোকদের ছাড়িয়ে তাঁরা ওপরের ধাপে পৌঁছিয়েছে বলেই বৃদ্ধের কাছে তাদের একটা বিশেষ আবেদন ছিল। সে-কথা বুঝবার মতো বয়স তখনও জাঁ-ক্রিস্‌তফের হয় নি।

যেদিন বাতাস অতিরিক্ত উত্তপ্ত বোধ হতো, সেদিন বৃদ্ধ গাছতলায় ছায়ায়

গিয়ে বসতেন এবং দেখতে দেখতে ঝিমোতে শুরু ক'রে দিতেন। জাঁ-ক্রিস্তফ তখন ইতস্তত-বিন্যস্ত ইঁটের ওপব কিংবা কোন পথ-চিহ্ন অথবা ঐ জাতীয় কোন উঁচু জায়গায় গিয়ে কোন রকমে বসত, বসতে অসুবিধাই হতো ; নিজের মনে গুন গুন করতে করতে স্বপ্নলোকে চলে যেত। কখনও বা মাটিতে পিঠ দিয়ে আকাশের দিকে মুখ ক'রে শুয়ে পড়ত, দেখত আকাশে মেঘেরা ভেসে চলেছে ; কোনটা দেখতে ষাঁড়ের মতন, কোনটাকে মনে হতো বুঝি বা দৈত্য, কোনটা মাথার টুপির মতন, আবার কোনটার মেয়েদের মতন চেহারা। কখনও কখনও মৃদু কণ্ঠে তাদের সঙ্গে আলাপ করত, কখনও বা শঙ্কিত দৃষ্টিতে ছোট্ট এক টুকরো মেঘের দিকে চেয়ে থাকত, দেখত তার পার্শ্ববর্তী বিরাট মেঘখণ্ড কি ক'রে তাকে ক্রমশঃ গ্রাস ক'রে নিচ্ছে ! কোথা হতে কখনও বা ভেসে আসত গম্ভীর কালো মেঘ, নীলাভ ; সঙ্গে সঙ্গে আরও একদল এসে পড়ত, অতি দ্রুত তাদের গতি, তাদের দেখে কেমন যেন মনে ভয় জাগত। সেই সব ভাসমান মেঘের সঙ্গে যেন তার কোথাও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ; কিন্তু বিস্মিত হয়ে যেত, যখন দেখত, তার ঠাকুরদাদা বা তার মা, কেউই সেদিকে লক্ষ্যই করে না। বালকের মনে হতো, সেই সব ঘন কালো মেঘ যদি ক্ষতি করতে চাইত, ভয়ঙ্কর ক্ষতি করবার মতোই মনে হয় তাদের শক্তি আছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বিচিত্র ভঙ্গী করতে করতে, তারা শুধু ভেসে ভেসে চলেই যেত, পথের মধ্যে থেমে থাকত না। এক সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে বালক কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে পড়ত. হাত-পা স্থির রাখতে পারত না, যেন সে নিজে আকাশ থেকে পদস্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠত, চারদিক স্থির নীরব - জাঁ-ক্রিস্তফ ঘুমিয়ে পড়ত···

কিছুক্ষণ পরেই বালকের তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। কান পেতে শোনে, চারদিকে বনে মৃদু-মর্মর ধ্বনি···চোখ মেলে দেখে সূর্যালোক-আহত পল্লব-পত্র মৃদুমন্দ কাঁপছে। তখনও বাতাসে ক্ষীণ কুয়াশার আমেজ লেগেই রয়েছে, রঙীন হালকা পাখার মৌমাছিরা উড়ে বেড়ায়, বীণার তন্ত্রীতে ঝংকারের মতো ওঠে অস্ফুট গুঞ্জন, আলোক-মত্ত পতঙ্গের দল আবেগ-আকুল হয়ে দ্রুত ঘোরে ফেরে ··ভাষাহীন অপরূপ নিস্তব্ধতা···ঘন বৃক্ষের ছায়ায় বনের সবুজের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে কাঠ-ঠুকুরিয়া ডেকে ওঠে···সে-ডাকে মনে হয় যেন কুহক-মন্ত্র আছে। দূরে কোথাও কৃষক তারস্বরে বলদকে ডাকে, পাথরের রাস্তায় চলন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হয়, জাঁ-ক্রিস্তফের চোখ আবার বুঁজে আসে। কাছেই একটা মরা ডালের ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে একটি পিপীলিকা হেঁটে চলেছে···জাঁ-ক্রিস্তফ তন্ময় হয়ে তার

দিকে তাকিয়ে থাকে···চেয়ে থাকতে থাকতে কখন চোখ বুঁজে যায়···মনে হয় যেন যুগ-যুগান্ত চলে গেল জাঁ-ক্রিস্তফ আবার চোখ মেলে চায়···দেখে, সেই মরা ডালের ওপর দিয়ে তখনও তেমনি চলেছে সেই পিপীলিকাটি···

কোন কোন দিন বৃদ্ধ গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন, মুখের রেখা ঘুমের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে যায়, লম্বা নাক মনে হয় যেন আরো লম্বা, মুখ হাঁ করেই বৃদ্ধ ঘুমোন। তখন বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জাঁ-ক্রিস্তফের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়, ভয় হয়, বুঝি বা অকস্মাৎ সেই মুখ পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন বীভৎস আকার ধারণ করবে। ইচ্ছে করেই সে তখন চিৎকার ক'রে গান গেয়ে ওঠে কিংবা যে উঁচু জায়গায় বসেছিল সশব্দে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে, যাতে বৃদ্ধের ঘুম ভেঙ্গে যায়। একদিন তার হঠাৎ কি খেয়াল হলো, ঘুমন্ত মুখের ওপর একরাশ শুকনো স্ুঁচোল ঘাস ফেলে দিল। বৃদ্ধ জেগে উঠলে বলল, গাছ থেকে ঝরে পড়েছে। বৃদ্ধ তাই বিশ্বাস করলেন দেখে সে হেসে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আবার যখন একই কৌশল প্রয়োগ করবার জন্য হাত তুলেছে, সদ্য সদ্য ধরা পড়ে গেল, দেখল বৃদ্ধ চোখের কোণ দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছেন। ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর মর্যাদা নিয়ে এইরকম খেলা করবার অধিকার তিনি দিতে রাজী নন। এক সপ্তাহ ধরে দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল।

পথ যত খারাপ হতো, জাঁ-ক্রিস্তফের ততই ভাল লাগত। পথের প্রত্যেকটি পাথরের টুকরো তার কাছে সবিশেষ বলে মনে হয়। প্রত্যেককে যেন সে আলাদা করেই চেনে। পথের ধুলোয় যে চাকার দাগ ফুটে থাকে, তা আকাশের ছায়া-পথের শুভ্র দুগ্ধ-রেখার মতোই মনে হতো দুর্জ্ঞেয় এক ভৌগলিক আকস্মিকতা। তাদের বাড়ি হতে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত যত নালা-নর্দমা ছিল, যত পাথর-ঢিবি ছিল, তাদের সকলের মানচিত্র বালকের মস্তিষ্কে আঁকা হয়ে গিয়েছে। এবড়ো খেবড়ো পথের আঁকাবাঁকা রেখার একটাকেও যদি কোন রকমে একটু ভেঙ্গে চুরে পরিবর্তন ক'রে দিতে পারত, তার মনে হতো যেন সে একটা বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্ব দেখাল ; পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা মাটির ঢিবির মাথা খানিকটা সমতল ক'রে, নীচের গর্তটুকু সেই মাটি দিয়ে ভরাট ক'রে যখন সে ফিরত, তখন সগর্বে ভাবত দিনটা তাহলে বৃথা অতিবাহিত হয় নি।

কখন হয়তো বড় রাস্তায় কোন ঘোড়ার গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে, গাড়োয়ানের সঙ্গে বৃদ্ধের পূর্ব-পরিচয় থাকলে, তারা দু'জনেই গাড়িতে উঠে বসত। সেই

অভাবনীয় সৌভাগ্যটুকু তার কাছে স্বর্গসুখ বলে মনে হতো। টগবগ ক'রে ঘোড়া ছুটে চলত, জাঁ-ক্রিস্তফ আনন্দে হেসে ফেটে পড়ত, রাস্তায় কোন লোক এসে পড়লে হাসি বন্ধ ক'রে দিত। তখন গম্ভীর মুখ ক'রে উদাসীন ভাবে বসে থাকত, যেন এইভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলতেই সে অভ্যস্ত। তার ঠাকুরদা এবং গাড়োয়ান কিন্তু তার দিকে ফিরেও দেখত না, নিজেদের গল্পে নিজেরাই মত্ত হয়ে থাকত। তাদের পায়ের কাছে সে কোনরকমে কষ্টে-সৃষ্টে একটু জায়গা ক'রে নিত, কখনও বা বসবার জায়গাই পেত না, তাদের পায়ের চাপে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, তবুও কত না আনন্দ তার! প্রাণ খুলে জোরে কথা বলে চলতো, কেউ তার কথার উত্তর দিল কি দিল না, সে সম্বন্ধে তার কোন দুর্ভাবনাই থাকত না। বালক দেখত সামনে ঘোড়ার কান দুটি অনবরত নড়ছে, যেন তারা স্বতন্ত্র কোন বিচিত্র জীব! ডাইনে, বাঁয়ে, যেদিকে খুশি ঘুরছে ফিরছে, কখন সামনে সোজা খাড়া হয়ে যাচ্ছে, আবার এমন মজা ক'রে পেছনে পড়ে যাচ্ছে যে, সে না হেসে আর থাকতে পারে না। ঠাকুরদার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করবার জন্যে তাঁকে চিমটি কাটে, কিন্তু বৃদ্ধ সে-সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখান না, উল্টে জাঁ-ক্রিস্তফকেই ভর্ৎসনা করেন, চুপ ক'রে বসে থাকবার আদেশ করেন। জাঁ-ক্রিস্তফ গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। ভেবে চিন্তে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানুষ যখন বড় হয়, তখন বিস্মিত হবার কথা সে একেবারে ভুলে যায়, তখন হয়তো সবকিছুই তার জানা হয়ে যায়। সুতরাং তাকে বড় হতে হবে এবং তার একমাত্র উপায় হলো সব-বিষয়ে তার এই যে বিস্ময়ের ভাব আপনা আপনি জাগে, তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে, সবকিছু যে সে জানে, এমনি গম্ভীর উদাসীন ভাব দেখিয়েই তাকে থাকতে হবে।

তাই পরক্ষণেই সে নীরব হয়ে যায়। গাড়ির ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা আসে। ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজতে থাকে ; ডিং, ডিং, ডং ডিং···বাতাসে সঙ্গীত জেগে ওঠে···সেই রূপালী ঘণ্টার চারদিকে মৌমাছির ঝাঁকের মতন সে-সঙ্গীত গুঞ্জন ক'রে ফেরে। গাড়ির চলার ছন্দের সঙ্গে সমান তাল দিয়ে চলে অফুরন্ত সঙ্গীতের উৎস···একটা গান শেষ না হতেই আর একটি শুরু হচ্ছে, গায়ে গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। জাঁ-ক্রিস্তফের কানে লাগে অপরূপ, অপূর্ব! তার মধ্যে একটি সুর, বিশেষ ক'রে তার এত সুন্দর লাগে যে, সেইদিকে ঠাকুরদার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সে চেষ্টা করে। নিজেই তারস্বরে সেই সুরে গেয়ে ওঠে। কিন্তু কেউই কর্ণপাত করে না। সে আরো উঁচু পর্দায় ধরে, আরো তীব্র কণ্ঠে···অবশেষে বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে ওঠেন:

'থাম…কানের কাছে ঢাকের আওয়াজের চিৎকারে তালা লাগবার জোগার হলো!' তার পক্ষে এ মন্তব্য সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। লজ্জায় মুখ লাল ক'রে একান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে চুপ করতেই হয়। সেই দুটি পরম অপদার্থ বৃদ্ধ, তার সঙ্গীতের মাহাত্ম্য বুঝবার এতটুকু ক্ষমতা যাদের নেই, ইচ্ছে হয়, ঘৃণায় তাদের নিষ্পেষিত ক'রে ফেলে। হঠাৎ তার মনে হয়, তাদের সেই দাড়ি-শুদ্ধ মুখ যেন অতীব কুৎসিত, তাদের গা হতে যেন তীব্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

নিরুপায় হয়ে ঘোড়ার চলন্ত ছায়ার দিকে তাকিয়ে থেকে সে সান্ত্বনা খুঁজে নেয়। সত্যি, কি আশ্চর্য এই চলন্ত ছায়া! ঠিক লাইন ধরে সেই ছায়া-প্রাণীরা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে চলেছে। সন্ধ্যাবেলা ফিরবার মুখে জাঁ-ক্রিস্তফ দেখল, মাঠের আর একদিক জুড়ে তারাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। একটা চড়াই-এর ওপর উঠতেই জাঁ-ক্রিস্তফ দেখল, একটা ছায়ার মাথা কেমন উপরে উঠল, আবার ঠিক আগেকার জায়গায় নেমে গেল। সেই ছায়া-প্রাণীর নাকের ডগাটা মনে হচ্ছিল অসম্ভব রকমের চেপ্টা, কতকটা ফাটা বেলুনের মতো; কান দুটো কি বড়… আবার হঠাৎ কেমন মোমবাতির মতো সরু হয়ে গেল! জাঁ-ক্রিস্তফ ভাবে ওটা সত্যি ছায়া, না কোন প্রাণী? যাই হোক না কেন, একথা কিন্তু খুবই সত্য, সে কিছুতেই ওটার সামনাসামনি দাঁড়াতে পারবে না। অনেক সময় তার ঠাকুরদাদার ছায়ার পিছনে পিছনে সে ছুটেছে- চায়ার মাথা মাড়িয়ে চলে যাবার জন্যে তার তীব্র বাসনা জাগে, কিন্তু এই রকম অদ্ভুত ছায়ার পেছনে সে কিছুতেই ছুটতে সাহস পায় না। সূর্য অস্ত যাবার সময় গাছের যে-সব ছায়া পড়ত, তা দেখেও সে বহুদিন বহু দুশ্চিন্তায় পড়েছে। হঠাৎ পথের মাঝখানে এই সব গাছের ছায়া ভূতের মতো পথ আগলিয়ে দাঁড়াত, ম্লান, শীর্ণ মূর্তি যেন…তারা বলে উঠত: 'ব্যাস্, ঐ পর্যন্ত! আর এগিয়ো না!' সেই সঙ্গে গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার খুর হতে যেন তারই প্রতিধ্বনি উঠত: 'ব্যাস্, আর এগিয়ো না!'

গাড়ির- চালক আর তার ঠাকুরদার বকবকানি যেন শেষ হতেই চায় না। মাঝে মাঝে তাদের গলা হঠাৎ চড়ে যেত, বিশেষ ক'রে যখন তারা কোন স্থানীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করত। তার মনে হতো যেন তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছে এবং ভয় হতো, হয়তো এক্ষুণি তারা হাতাহাতি করবে। রাগারাগি ছাড়া চড়া গলার আর যে কোন অর্থ থাকতে পারে, তা তখনও জাঁ-ক্রিস্তফ জানত না। আসলে সেই চড়া গলার মধ্যে ঘৃণাও ছিল না, কোন আবেগের উত্তেজনাও ছিল না। সামান্য ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে তারা চড়া-

গলায় আলোচনা করে, সেই ভাবে আলোচনা করতে তাদের ভাল লাগে বলেই করে। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ তাদের আলোচনার কোন মানেই বুঝতে পারে না, শুধু তাদের কথার চড়া স্বর শুনে এবং উত্তেজিত মুখের ভাব দেখে ভয় পায় এবং মনে মনে ভাবে : 'ইস্! লোকটার কি ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা হয়েছে! নিশ্চয়ই রেগে গিয়ে চোখ পাকাচ্ছে···লোকটা হাঁ ক'রে যেন খেতে আসছে···ইস! রাগে আমার নাকের ওপর খনিকটা থুতু ফেলে দিলে! হে ভগবান, ঠাকুরদাকে বুঝি লোকটা এবার মারবে!'

এমন সময় হঠাৎ গাড়ি থেমে যায়। গাড়োয়ান বলে ওঠে : 'এই তো পৌঁছে গিয়েছেন!' জাঁ-ক্রিস্তফ অবাক হয়ে দেখে, এইমাত্র যারা প্রাণান্ত ঝগড়া করছিল, তারা হেসে করমর্দন করল। জাঁ-ক্রিস্তফ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তার ঠাকুরদাই আগে গাড়ি থেকে নামেন, তার পর গাড়োয়ান হাত ধরে ক্রিস্তফকে নামিয়ে দেয়। ঘোড়ার পিঠে আবার চাবুকের শব্দ হয়, সশব্দে গাড়ি তাদের ছাড়িয়ে চলে যায়। মাঠের পেছন দিক দিয়ে সূর্য পাটে নামে। রাস্তাটি এঁকে বেঁকে একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়েছে। পায়ের চাপে নরম ঘন-ঘাস নুইয়ে পড়ে, বিচিত্র শব্দ ওঠে। তীরবর্তী অল্ডারগাছগুলো নদীর দিকে ঝুঁকে আছে, আধ-খানা দেহ যেন জলে ভাসছে। কোথা হতে এক ঝাঁক মশা মাথার উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল, নিঃশব্দে স্রোতের শান্ত টানে একটা নৌকো সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো উইলোর নত শাখাকে আদর ক'রে যেন চুম্বন করে। দিবসের খর আলো স্নিগ্ধ মৃদু হয়ে আসে, বাতাস স্বচ্ছ অমলিন, নদীর রূপালী বুকে নামে দিন-শেষের ধূসর ছায়া। তারা ঘরে ফিরে আসে, চারদিকে ঝিঁঝিঁর ডাকের একটানা শব্দ। উঠোনের মাঝখানে প্রতীক্ষায় জেগে থাকে আলো-করা জননীর হাসি-ভরা মুখ···

ওগো, আজের এই দিন, জানি একদা আবার দেখা দেবে তুমি আনন্দ-স্মৃতিরূপে, সুমধুর কল্পনার আকারে! সুরের পাখায় জীবনের যাত্রা-পথে আবার জেগে উঠবে আজকের এই সঙ্গীত।···জীবনের যাত্রা-পথে দেখা দেবে কত বৃহৎ নগরী, গর্জমান কত সমুদ্র, কত স্বপ্ন, কত সৌধ আর কত-না প্রীতি-ভরা মুখ কিন্তু সেদিন তারা আর এমন ক'রে মনে রেখাপাত ক'রে থাকবে না, যেমন রয়ে গেল এই শৈশবের পথচলার স্মৃতি! ছায়া-ছায়া ঐ বাগানের কোণটুকু, যা সে প্রতিদিন জানালার ঝাপসা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখত, কোন কাজ থাকত না ব'লে মুখ নিঃসৃত বাষ্পে জানালার কাঁচকে নিজেই ঝাপসা ক'রে তুলত, সেই ছিল তার

অবসরের খেলা—শৈশবের এই সব ছোট-খাট স্মৃতিগুলো তার মনে যে গভীর রেখাপাত ক'রে থেকে গেল, তারাই বারেবারে জীবনের মোড়ে মোড়ে ফিরে আসবে, জাগিয়ে তুলবে আলো-ছায়ার বিচিত্র সব সুর।···

ক্রমশঃ সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসে। বাড়িতে দরজা-জানলা সমস্ত বন্ধ হয়ে যায়। গৃহ···নীড়···যা কিছু ভয়ঙ্কর,—অন্ধকার, রাত্রি, ভয়, অজানার আশঙ্কা,—সকলের হাত হতে মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রাঙ্গণে তার কোন শত্রুর পদধ্বনি জাগে না···ঘরের ভিতরে জ্বলে আলো : শিখাময় স্নেহময় আলো। রান্নাঘরে উনুনের ওপরে লোহার শিকে হলুদ বরণ হাঁস একটু একটু ক'রে দগ্ধ হতে থাকে···বাতাস হয়ে ওঠে ঘৃত-গন্ধী মধুর···সুখাদ্যের সম্ভাবনায় আমোদিত! খাওয়া···ক্ষুধার তৃপ্তির আনন্দ···কি সুবিপুল তার উল্লাস আর আগ্রহ! সারাদিনের ক্লান্তির পর, ঘরের স্নিগ্ধ উত্তাপ···পরিচিত কণ্ঠের সান্নিধ্য···আমেজ এনে দেয় দেহে। প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেহ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, চারদিকে পরিচিত আলো আর ছায়া··· সামনের টেবিলের আলোর আচ্ছাদনী, অগ্নিকুণ্ডে ঝুলকি ফুটিয়ে শত-শিখায় নাচছে যে আগুন, সব যেন মনে হয় আনন্দের মায়া-মূর্তি। জাঁ-ক্রিস্তফ সন্তর্পণে ঠোঁটের কাছে প্লেট তুলে নেয়···সব আনন্দের স্বাদ যেন একসঙ্গে সেই প্লেটে এসে জমা হয়েছে···তার পর ··শয্যা, স্নিগ্ধ সুকোমল। কখন কি ক'রে সে শয্যায় এল? শ্রান্তিতে ভরে আসে দেহ। কানে আসে কথাবার্তার শব্দ·· তার সঙ্গে মনে মিশে যায় বিদায়-দিবসের স্মৃতি। বাবা বেহালা বাজাতে শুরু করেন। তীব্র মধুর সুর যেন রাত্রির আকাশে অন্তরের বেদনা জানাতেই বের হয়। অবশেষে দিবসের সর্বোত্তম আনন্দরূপে আসে জননী, তার পাশে বসে নিজের কোলের মধ্যে তার হাত দুটো টেনে নেয়। তন্দ্রায় চোখ ভারি হয়ে আসে। মাকে অনুরোধ করে গাইবার জন্যে ; পুরনো গান, তার ভাষার কোন অর্থই তার কাছে নেই, শুধু তার সুর তার তন্দ্রাকে নিবিড় ক'রে তোলে। তার ওপর ঝুঁকে পড়ে অতি মৃদু স্বরে লুইসা গাইতে থাকে। কিন্তু সে-সঙ্গীত শুনে বাবা বিরক্ত হন, তাঁর কাছে সে-সঙ্গীত সেকেলে এবং বাজে, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফের শুনতে ভারী ভাল লাগে। নিঃশ্বাস রোধ ক'রে হাসি-কান্নার মাঝখানে যেন সে দুলতে থাকে। ভুলে যায়, সে কোথায় বসে আছে, কি এক অপূর্ব স্নিগ্ধ করুণা যেন তার ভিতর হতে উথলিয়ে উঠতে থাকে। দুটি ছোট হাতে জননীর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়িয়ে ধরে। হেসে জননী বলে : 'ওরে পাগল, গলা টিপে মেরে ফেলবি নাকি!'

তবু আরো নিবিড়ভাবে সে আঁকড়িয়ে ধরে। কতখানি যে সে ভালোবাসে তার জননীকে কেমন ক'রে সে জানাবে? এমনি নিবিড়ভাবে সে ভালোবাসে সবাইকে···সকলকে···সবকিছুকে! সবকিছুই ভাল এই পৃথিবীতে, সুন্দর সবকিছুই এই পৃথিবীর! ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। বাইরে প্রাঙ্গণে ঝিঁঝিরা ডাকে। রাত্রির তন্দ্রাতরঙ্গে ভেসে চলে ঠাকুরদার মুখে-শোনা সব কাহিনী, জেগে ওঠে সেই সব কাহিনীর বীর নায়কেরা···যদি সেই বীরদের মতো বীর সে হতে পারে! নিশ্চয়ই, সে তাদের মতো হবে···ভাবতে ভাবতে কল্পনা আর সত্য কখন এক হয়ে যায়···সে তখন তাদেরই মতো বীর হয়ে ওঠে।·· কি আনন্দ শুধু বেঁচে থাকায়!

কি প্রাচুর্য, কি শক্তি, কি আনন্দ সেই ক্ষুদ্র শিশুর দেহে! প্রতি মুহূর্তে সে যেন নিজের মধ্যে নিজেই পরিপূর্ণ। প্রাণ-শক্তির কি উচ্ছল অতিরিক্ততা! এক মুহূর্তের জন্যও দেহ ও মনের গতির বিরাম নেই, নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে চলেছে সে গতি। অষ্ট-প্রহর জীবন-শিখাকে বেষ্টন ক'রে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো নেচে চলেছে একটা ক্লান্তিহীন অনির্বাণ উৎসাহ···জগতে যা কিছু আছে সবই যে তার প্রয়োজন! জীবন যেন একটা মধুর স্বপ্ন, কলমুখরিত উচ্ছল প্রস্রবিনী, অনন্ত আশার অনাদি ভাণ্ডার, একটা হাসি, একটা গান, বিরাম-বিহীন একটা মাদকতা। জীবন তাকে এখন বেঁধে রাখতে পারে নি, সর্বদাই সে বন্ধনকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলেছে। ভেসে চলেছে অনন্তের বুকে। কি আনন্দ! আনন্দের জন্যই সে এসেছে! তার সত্তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা সে-আনন্দকে অস্বীকার করতে পারে। সব শক্তি, সব অনুরাগ দিয়ে তাকেই সে আঁকড়িয়ে ধরে আছে।···

জীবন কিন্তু তা সহ্য করবে না···তার নিষ্ঠুর বাস্তবতা দিয়ে একদা তাকে বেঁধে ফেলবেই।

২

L' alba vinceva l'ora mattutina
Che fuggia 'nnanji, si che di lontano
Conobbi il tremolar della marina...

Purgatorio, i

ক্রাফ্‌টরা মূলতঃ আন্তওয়ার্প শহর থেকে এসেছিল। প্রথম জীবনে জাঁ-মিচেল নাকি দূরন্ত কলহপ্রিয় ছিলেন। বালককালের খেয়ালের বসে তিনি নিদারুণ এক কলহে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তারই পরিণামে জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ ক'রে চলে আসতে বাধ্য হন। বর্তমানে যে ক্ষুদ্র শহরটিতে তাঁরা বসবাস করছেন, পঞ্চাশ বছর আগে একদিন সেখানে এসে উপস্থিত হন। পাহাড়তলীর সুন্দর শহর, উদ্যান আর লাল টালির আকাশমুখী ছাদওলা বাড়িসব 'ভতের রাইন'-এর সবুজ চোখে প্রতিবিম্ব ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিভাবান সঙ্গীত-শিল্পীরূপে সেই সঙ্গীতের দেশে এসে তিনি অচিরকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিবাহের মধ্য দিয়ে সেই শহরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরো দৃঢ়মূল হয়ে যায়·· প্রিন্সের অর্কেষ্ট্রার প্রধান পরিচালকের কন্যা ক্লারা সারতোরিয়াসের সঙ্গে চল্লিশ বছর আগে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং কালক্রমে শ্বশুরের সেই পদে তিনিই অধিষ্ঠিত হন। সাধারণ জার্মান মেয়ের মতো শান্ত-প্রকৃতি ক্লারার জীবনে দুটি মাত্র আকর্ষণ ছিল : রান্না আর সঙ্গীত। স্বামীর প্রতি তার যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল একমাত্র তাঁর পিতাই সেরকম শ্রদ্ধা দাবী করতে পারতেন। জাঁ-মিচেল পত্নীকে কম শ্রদ্ধা করতেন না। পনেরো বছর কাল ধরে ক্লারা দাম্পত্য জীবন যাপন করেন পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে এবং তার ফলে চারটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। তার পর যখন ক্লারা মারা গেলেন, জাঁ-মিচেল শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু তাঁর পাঁচ মাস পরেই পুনরায় হাস্যময়ী পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী, রক্তিমাননা বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী ওটিলিয়া স্কুজকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনলেন। এই বিয়ের আট বছর পরে ওটিলিয়াও প্রথমাকে অনুসরণ ক'রে বিদায় গ্রহণ করলেন, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই তিনি

সাতটি সন্তান উপহার দিয়ে গেলেন…জাঁ-মিচেলের মোট এগারোটি সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র জীবীত রইল। প্রত্যেক সন্তানকেই বৃদ্ধ প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, কিন্তু উপর্যুপরি এই সব মৃত্যুবেদনা তাঁর চরিত্রের সরসতাকে শুষ্ক করে দিতে পারে নি। তিন বছর আগে যখন ওটিলিয়া তাঁর পাশ হতে সরে গেলেন, সেটাই ছিল তাঁর কাছে সব চেয়ে তীব্র আঘাত…সে-বয়সে আর নতুন ক'রে জীবন শুরু করা যায় না, নতুন ক'রে ঘর বাঁধা আর চলে না। কিছুকালের মতো বৃদ্ধের মন একেবারে এলোমেলো হয়ে গেল, কিন্তু বহু চেষ্টায় তিনি সে-আঘাতও কোন রকমে সামলিয়ে উঠলেন। কোন দুঃখই সে-অন্তরের স্থৈর্যকে নষ্ট করতে পারে নি।

স্বভাবতঃই তিনি স্নেহপ্রবণ ছিলেন কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অটুট স্বাস্থ্য। কোন বিপদই তাঁর দেহকে স্পর্শ করতে পারত না, ফ্লেমিশ চরিত্রের ধারা অনুযায়ী সর্বদাই তিনি আনন্দের, বিরাট বিপুল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন…মুখেতে সর্বদাই ফুটে থাকত সুবিপুল হাসি, শিশুর মতো সহজ, সরল। যে-দুঃখ যে-বেদনাই আসুক না কেন, তার জন্য তাঁর পান পাত্রে কোনদিন একবিন্দু সুরা কম থাকত না, টেবিলে এক টুকরো খাদ্যও ফেলে রাখতেন না, একদিনের জন্যও তাঁর পরিচালিত ব্যাণ্ডের বাজনা থ'মে নি। তাঁর পরিচালনায় সেই রাইন-অঞ্চলের দরবারি-অর্কেষ্ট্রা রীতিমত খ্যাতি অর্জন করে। সেই সুগঠিত দেহ আর তার অন্তরালে সুবিপুল দুর্জয় ক্রোধের অগ্ন্যুদ্গারের জন্য সেই অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তিনি লোকোত্তর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জাঁ-মিচেল তাঁর সেই দুর্জয় ক্রোধ সংযত করতে পারেন নি। কোন কিছুরই সঙ্গে আপস করতে তিনি চাইতেন না, তাই সর্বদাই শঙ্কিত হয়ে থাকতেন, বুঝিবা কখন কোন কিছুর সঙ্গে আপস ক'রে ফেলেন। অবশ্য, সৌজন্য এবং ব্যবহারিক ভব্যতা সম্বন্ধে তিনি একান্ত সজাগ হয়েই থাকতেন। জনমতকে ভয় ক'রে চলতেন। কিন্তু তবুও রক্তের মধ্যে সহসা যখন বান ডেকে উঠত, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারতেন না। তখন যা কিছু সামনে পড়ত, তাতেই ক্ষেপে উঠতেন। কোথা হতে মাঝে মাঝে অধীর অন্ধ এক ক্রোধের ভূত ঘাড়ে এসে চাপত, তখন শুধু রিহার্সালের সময় নয়, স্বয়ং প্রিন্সের উপস্থিতিতে কনসার্ট বাজাবার সময়ও, হাতের পরিচালন-দণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিতেন, ভূতে-পাওয়া লোকের মতো মাটিতে পা ঠুকে যার ওপর ক্রুদ্ধ হতেন, তাকে নাম ধরে তীব্র কম্পিত কণ্ঠে ভর্ৎসনা করতেন। প্রিন্স মজা দেখতেন, কিন্তু যে আর্টিষ্টের ওপর ক্রোধ বর্ষিত হতো, সভাবতঃই সে মনে মনে বিরূপ হয়ে উঠত। পরমুহূর্তেই নিজের অসংযত

ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়তেন এবং তখন অতিরিক্ত ভব্যতার আতিশয্যে তাকে ধামা চাপা দেবার বৃথাই চেষ্টা করতেন। আবার কয়েকদিন পরেই ঠিক সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটত এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উদগ্র অসহ্যতা ক্রমশঃ আরো উদগ্র হয়েই উঠল, ফলে তাঁর চাকরি বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা যে ক্রমশঃ কুৎসিত হয়ে উঠছে, তা তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে পারছিলেন। অবশেষে একদিন তাঁর এই অগ্নুদগারের প্রতিবাদে অর্কেষ্ট্রার শিল্পীরা যখন ধর্মঘট করবার আয়োজন করছিল, সেই সময় তিনি নিজেই পদত্যাগ-পত্র দাখিল ক'রে বসলেন। মনে মনে অবশ্য আশা করেছিলেন যে, তাঁর এতদিনের অকুণ্ঠ শিল্প সেবার কথা স্মরণ ক'রে হয়তো তারা এই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করতে চাইবে না, এবং তাঁকে এই মনান্তর মিটিয়ে নিয়ে থেকে যাবার অনুরোধ করবে। কিন্তু সে-জাতীয় কোন ব্যাপারই ঘটল না। তাঁর দিক থেকেও উপযাজক হয়ে সেই পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার ক'রে নেবার চেষ্টা করাও সম্ভব নয়, তাঁর গর্ব-বোধে ভীষণ আঘাত লাগল। সুতরাং ভগ্ন-হৃদয়ে তাঁকে সরেই আসতে হলো এবং মানুষের অকৃতজ্ঞতায় একাই শুধু কেঁদে অন্তরকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু সেই দিন থেকে তিনি সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন, সারাটি দিনকে কি ক'রে ভরাট ক'রে তুলবেন, তারই চিন্তায়। যদিও সত্তর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন, তবুও তাঁর উৎসাহ এবং কর্মশক্তি তেমনি অটুট রয়েছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শহরের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া, আলোচনা সভায় তর্ক-বিতর্ক করা, যেখানে যা কিছুতেই মাথা গলাতে পারেন তাতেই জুটে যাওয়া, এবং তার জন্য নিত্য হাঁটাহাঁটি করার মধ্যে কোন ক্লান্তিই বোধ করতেন না। মস্তিষ্ক তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ সজাগ, তাই নানা ব্যাপারে নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করতেন। বাদ্য যন্ত্র সারাবার কাজ শুরু করলেন; সারাতে সারাতে পুরনো বাদ্যযন্ত্রে নতুন কোন অংশ জোড়া যায় কি না, তা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেন, কখনও কখন কৃতকার্যও হন। অবসর সময়ে সঙ্গীত-রচনাও করতেন এবং সে-সব রচনা জমিয়ে রেখে দিতেন। একবার বহু চেষ্টা চরিত্রের পর 'মিস্‌সা শোলেনিস্' নামে একটি পুরো সঙ্গীত রচনা করেন। এই সঙ্গীত রচনায় এত বেশী মানসিক পরিশ্রম করতে হয় যে, তাঁর শরীর প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। প্রথম প্রথম এই বিশেষ রচনাটি সম্বন্ধে আনন্দে এবং গর্বে সকলের কাছেই উল্লেখ ক'রে বেড়াতেন, এ তাঁর বংশের এক গৌরব-সৃষ্টি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই রচনার শূন্য-প্রাণ তাঁর নিজের কাছেই প্রকট হয়ে উঠল, নিদারুণ বেদনায়

তিনি দেখলেন তাঁর অজ্ঞাতে তিনি শুধু প্রাচীন সঙ্গীত থেকে টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে কোন রকমে প্রাণহীন একটা নতুন দেহ গড়ে তুলেছেন। যাকে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রেরণার সৃষ্টি মনে করেছিলেন, তা অপরের পরিত্যক্ত জীর্ণ বসনের টুকরো মাত্র। তাই ইদানীং সেই রচনার দিকে দৃষ্টি পড়লেই ব্যথিত হয়ে উঠতেন। তবুও মাঝে মাঝে অন্তরের অন্তস্তল হতে জেগে উঠত প্রবল এক দুরাশা। সেই দুরাশায় প্রণোদিত হয়ে ভাবতেন তাঁর মনে যে-সব সঙ্গীত ঘুরে বেড়ায় অপূর্ব তাদের সম্ভাবনা। আবেগ-কম্পিত দেহে তাড়াতাড়ি টেবিলে গিয়ে বসতেন। নিশ্চয়ই এবারের প্রেরণা তাঁকে আর প্রতারণা ক'রে যাবে না! কিন্তু কলম নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখেন, অন্তরের আবেগ শুধু অন্তরেই ধোঁয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিশ্ছিদ্র নীরবতায় তিনি একলা শুধু বসে আছেন, অন্তরে যে সঙ্গীত উঠেছিল, কোথায় নিমেষের মধ্যে তারা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে, প্রাণপণ চেষ্টায় তাদের বাণীরূপ দিতে গিয়ে দেখেন, শুধু কানে এসে বাজে অতি-পরিচিত সেই পুরনো 'মেণ্ডেলসন' আর 'ব্রাহমস'-এর সুরই।

জর্জ সাঁ বলেন: 'জগতে এক শ্রেণীর হতভাগ্য প্রতিভাধরেরা জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের প্রতিভা থাকে কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। সেই অপ্রকাশের বেদনাকে খ্যাতিমান জেফ্রে ইলেয়রের মূক বা তোতলা বংশধরদের মত সারা জীবন বহন ক'রে তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত অবস্থাতেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।' বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল ছিলেন সেই হতভাগ্যদেরই একজন; শুধু যে অন্তরের সঙ্গীতকেই বাইরের রূপ দিতে পারেন নি, তা নয়, অন্তরের বহু ভাবনাকেও তেমনি পারেন নি বাণীরূপ দিতে, কিন্তু নিজের কাছে সে-কথা স্বীকার করতে তিনি চাইতেন না। সেখানে নিজেকে নিত্য প্রবঞ্চনা ক'রে চলতেন। কি বিপুল আশাই না তাঁর ছিল, তিনি যে কথা বলবেন, সেকথা মানুষ শুনবার জন্যে ছুটে আসবে; কত সাধই না ছিল অন্তরের ভাবনাকে লেখায় অমর ক'রে তুলে রাখবেন, সঙ্গীতে, বক্তৃতায় দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করবেন! অন্তরের সংগোপনলোকে এই ব্যর্থ-বাসনার দল আজ শুধু ক্ষতের মতন তাঁকে দগ্ধ করেই চলেছে। কিন্তু কারও কাছে সেকথা প্রকাশ ক'রে বলতেন না, এমন কি নিজের কাছেও অস্বীকার করতে চেষ্টা করতেন। চেষ্টা করতেন, যাতে সেই ব্যর্থ আশার চিন্তা মনে উদিতই না হয়। কিন্তু হায়! শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারে সেই সব কথাই মনে মনে নাড়াচাড়া করতেন। এইভাবে অন্তরের অন্তস্তলে নিজের মরণের সিংহাসন সংগোপনে নিজেই বহন ক'রে ফিরতেন।

হায় হতভাগ্য শিল্পী ! জীবনের কোনক্ষেত্রেই তিনি নিজের সংগোপন সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারলেন না ! কত না সৌন্দর্যের, কত না সম্ভাবনার বীজ অন্তরে নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন কিন্তু তার একটিতেও ফল ধরল না ; আর্টের মহিমা সম্বন্ধে গভীরতম সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর মধ্যে ছিল, জীবনের নৈতিক মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেইসব ধারণাকে বাস্তবতায় অনুবাদ ক'রতে গিয়ে এক হাস্যকর বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলতেন , অন্তরে যার গর্বোন্নত দিব্য মহিমা, বাইরে সে ক্রীতদাসের মতো পদ ও পদবীকে মাথা নত ক'রে অতি-সম্মান দেখিয়ে তৃপ্ত থাকত ; অন্তরে স্বাধীনতার সুতীব্র পিপাসা, বাইরে অনর্থক দীনতা ; শুধু আত্মশক্তির অভিনয়, কিন্তু প্রত্যেক কুসংস্কারের কাছে অসহায় আত্মবলিদান ; অনাবিল সৌন্দর্যের জন্যে অন্তরে নিত্য ওঠে সামগান—কিন্তু পথে পা দিতে না দিতে বন্ধ হয়ে যায় পথ চলা ।

তাঁর সমস্ত ব্যর্থ বাসনা, জাঁ-মিশেল পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিলেন এবং প্রথম প্রথম এমন আশাও হতো যে, মেলশিয়র বুঝি তাদের চরিতার্থ ক'রে তুলবে। শৈশব হতেই তার মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিভার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। যা কিছু সে শুনত বা দেখত, অবলীলাক্রমে তা তুলে নিত এবং অতি অল্প বয়সেই বেহালাবাদকরূপে সে এমন সম্মোহনের সৃষ্টি করল যে বহুকাল ধরে সে দরবারের কনর্সার্ট দলের মধ্য-মণি হয়েই রইল। পিয়ানো এবং অন্যান্য বাজনাও চমৎকার বাজাতো। কথক হিসেবেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করল। দেখতে একটু ভারী হলেও, চমৎকার সুগঠিত ছিল তার দেহখানা, যে-ধরনের দেহকে জার্মানরা ক্লাসিক সৌন্দর্যের প্রতীক বিবেচনা করে, মেলশিয়র ছিল সেই অপরূপ দেহ গঠনের অধিকারী। সমুন্নত প্রশস্ত ললাট, যদিও তার মধ্যে বিশেষ কোন আলোক-ব্যঞ্জনা ছিল না, মুখ-রেখা সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়, কুঞ্চিত কেশদাম, যেন রাইন্ নদীর দেশের জুপিটার। পুত্রের কৃতিত্বে বৃদ্ধ জাঁ-মিশেল পরম গর্বই উপভোগ করতেন , যখন বেহালায় মেলশিয়র তার সুরের যাদু জাগিয়ে তুলত, বৃদ্ধ প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে যেতেন, বৃদ্ধ নিজে কোনদিন সার্থক ভাবে কোন যন্ত্রেই এমন ক'রে নিজেকে জাগাতে পারেন নি। সত্য কথা বলতে কি, তখন মনে হতো মেলশিয়রের হাতের ছড়ি যেন অন্তরের যে-কোন ভাবনাকেই রূপ দিতে পারে, কিন্তু বিপদ হলো, তার অন্তরে সে-রকম কোন মহৎ ভাবনাই ছিল না ; এবং তার জন্য তার বিশেষ কোন দুশ্চিন্তাও ছিল না। সমস্ত নিপুণতা সত্ত্বেও তার অন্তর ছিল সাধারণ কমিক অভিনেতার অন্তরের মতন, যে শুধু প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীকেই

দুরস্ত করে, সে-ভঙ্গীর আড়ালে বক্তব্য কি থাকলো তার প্রতি লক্ষ্য করবার কোন প্রবৃত্তিই যার থাকে না, অথচ উদ্বেগ-আকুল দম্ভে যে শ্রোতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিজের অভিনয়ের অনুমোদনের আশায়।

নিজের শিল্প-জীবন সম্বন্ধে সর্বদা উদ্বেগ-আকুল হয়ে থাকা সত্ত্বেও মেলশিয়র প্রচলিত রীতি-নীতি সম্বন্ধে জাঁ-মিচেলের মতোই এক ভীরু শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করত। আর এক জায়গায় তাদের পিতা-পুত্রে বিশেষ মিল ছিল। তাদের উভয়ের চরিত্রে এমন একটা আকস্মিকতা এবং এলোমেলো ভাব ছিল যে লোকে বলত, ক্রাফটরা স্বভাবতঃই একটু ছিট গ্রস্ত। প্রথম প্রথম তাতে মেলশিয়রের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি, কারণ এই সমস্ত বাতিক প্রতিভারই লক্ষণ, এই রকম একটা ধারণা তার মনের আড়ালে কাজ করত। কিন্তু বেশী দিন লাগল না, লোকে তার এই সব উদ্ভট আকস্মিকতার উৎস-মুখের সন্ধান পেয়ে গেল, সে-উৎস হলো—মদের বোতল। দার্শনিক নীট্‌শে বলে গিয়েছেন, সুরার দেবতা বাক্‌কাস্ সঙ্গীতেরও অধি-দেবতা, মেলশিয়রও অন্তরের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায় তাই বিশ্বাস করত। কিন্তু বরাত-ক্রমে তার দেবতাটি ভক্তের প্রতি অতি অকরুণ ব্যবহারই করলেন,—ভক্তের অন্তরে যে ভাব শক্তি অভাব ছিল, তা পরিপূরণ করা দূরে থাক্, সেখানে যতটুকু যা পড়েছিল, তাও নিঃশেষে তার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। তার অসম্ভব বিবাহ-কাণ্ডের পর,—অবশ্য বাইরের লোকের ধারণায় তা অসম্ভব মনে হয়েছিল বলেই সে-ও অসম্ভব মনে ক'রে নিয়েছিল,—সে আরো বেশী ক'রে তার ইষ্ট-দেবতার শরণাপন্ন হলো। ফলে বেহালা বাজানো সম্পর্কে রীতিমত অবহেলা শুরু হলো। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তার এমন অভ্রান্ত দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে কখন যে তাকে হারিয়ে ফেলল, তা জানতেও পারল না। তার জায়গায় জনতার অন্তরে বেহালা হাতে প্রধান-তন্ত্রী হিসেবে অন্য বাদক এসে দাঁড়াল। যখন সে বুঝতে পারল, তখন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠল কিন্তু নিজেকে উদ্দীপিত ক'রে তুলবার বদলে এই সব আঘাতে সে নিজেকে আরো নিরুদ্যম ক'রে তুলল। সুরার মজলিসে সুরা-সঙ্গীদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে চিৎকার করেই নিজের কর্তব্য পালন করল। আত্ম-ক্ষয়ী অসম্ভব দম্ভে সে মনে করেছিল সঙ্গীত-পরিচালকের পদ পিতার পর উত্তরাধিকার-সূত্রে নিশ্চয়ই হবে তার : কিন্তু সে পদ পেল অন্য লোক। মেলশিয়র মনে করল, জগৎ তার প্রতিভা না বুঝে তাকে নির্যাতিত করল··· এমনিধারা বহু প্রতিভাকেই জগৎ বুঝতে না পেরে অবহেলা করেছে। সৌভাগ্যবশতঃ বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলকে লোকে শ্রদ্ধা করত বলেই মেলশিয়রকে অর্কেস্ট্রা থেকে একেবারে বাদ

দেওয়া হলো না, সামান্য বেহালাবাদকরূপে সে থেকে গেল, কিন্তু যে-সব ছাত্র-ছাত্রী জুটেছিল, তারা সকলে তাকে পরিত্যাগ করল। এই শোকের আঘাতেই তার দম্ভ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, কিন্তু তার অপেক্ষাও বেশী ক্ষতি হলো তার পকেটের। ক্রমান্বয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে তার অর্থ-ভাগ্যও ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। একদিন প্রাচুর্য যে দেখেছে, দারিদ্র্য তার কাছে আরো ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মেলশিয়র প্রতিজ্ঞা করল, সেদিকে সে ফিরেও চাইবে না। তার ব্যক্তিগত সুখের কিংবা প্রয়োজনের জন্য একটি কপর্দকও কম খরচ করতে সে পারল না। খারাপ লোক বলতে যা বোঝায়, মেলশিয়রকে কিন্তু ঠিক তা বলা যায় না : বলা যায় আধা-ভালো, যেটা আরো খারাপ, নৈতিক বলহীন দুর্বলতা—বাকীটুকু ভাল, সৎ পিতা, সৎ পুত্র, সৎ স্বামী,—একজন সৎ ব্যক্তি, বোধহয় জান্তব স্নেহ ভালোবাসার গোড়ায় সুরসুরি পড়লেই নিজের আত্মজ আত্মীয়দের নিজের অংশ বলেই মনে করার ব্যক্তি সে। সে যে একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, তাও ঠিক নয়। পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক হতে হলে যে-অনুপাতে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, তা তার ছিল না। তার চরিত্রের জমার ঘরে ছিল বৃহৎ একটা শূন্য। তাই ভাল বা মন্দ, সে কিছুই হয়ে উঠতে পারল না। এইভাবে যারা কিছুই হয়ে উঠতে পারে না, জীবনে তারাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত বৃহৎ ভারের মতো, তারা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় এবং পড়ে তারা যাবেই ; এবং সেই পতনের সঙ্গে তারা তাদের সঙ্গে যারা থাকে, তাদেরও টেনে নিয়ে পড়ে।

যখন সংসারে নিম্নগামী গতি চরম সঙ্কটের মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলো, তখন বালক জাঁ-ক্রিস্তফ একটু একটু ক'রে বুঝতে শিখল, তার চারদিকে কি চলেছে।

সংসারে সে তখন আর একমাত্র সন্তান নয়। প্রত্যেক বছরে মেলশিয়র স্ত্রীকে একটি ক'রে নতুন সন্তান উপহার দিয়ে আসছিল, ভবিষ্যতে তাদের কি হবে সে-সম্বন্ধে তার কোন চিন্তাই ছিল না। দু'জন ইতিমধ্যেই বিদায় গ্রহণ করেছিল। অবশিষ্ট আর দু'জনের একজনের বয়স তিন, আরেকজনের চার। ছেলেদের নিয়ে মেলশিয়রের বিশেষ চিন্তা-ভাবনা নেই। যখন লুইসাকে বাইতে যেতে হতো, বাড়িতে তখন জাঁ-ক্রিস্তফের জিম্মায় ছোটদের রেখে যেত। জাঁ-ক্রিস্তফ এখন ছয় বছরের মাত্র।

এই নতুন দায়িত্ব পালনের জন্য জাঁ-ক্রিস্তফকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হতো বৈকি ; কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মুক্ত মাঠের মধ্যে অপরূপ অপরাহ্নবেলা-গুলো তাকে বিসর্জন দিতে হতো। কিন্তু আর একদিক দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে

যেত। সে যে দায়িত্ব-গ্রহণের যোগ্য হয়েছে, এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রীতি-মত গর্ব অনুভব করত এবং যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গেই তার কর্তব্য সে পালন করত। নিজের খেলার সাজসরঞ্জাম দেখিয়ে যতদূর সম্ভব সে তার ক্ষুদে ভাইদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করত; তার মাকে যে-ভাবে, যে ভাষায় আদর করতে সে শুনেছিল, ঠিক সেইভাবে সে সবথেকে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলত। কখনও বা মার দেখাদেখি তাদের দু'জনকেই একসঙ্গে কোলে নেবার বৃথা চেষ্টা করত। ভারে তার দেহ ঝুঁকে পড়ত, দাঁতে দাঁত দিয়ে শিশুদের আঁকড়িয়ে ধরত, যাতে পড়ে না যায়। শিশুরাও কোলে চড়ে থাকবার বায়না ধরত; জাঁ-ক্রিস্তফ যখন অবসন্ন হয়ে নামিয়ে দিতে বাধ্য হতো, তখন তারা প্রতিবাদে কাঁদতে শুরু করত। কাঁদতে শুরু করলে থামবার কোন লক্ষণই দেখা যেত না। তখন জাঁ-ক্রিস্তফ সত্যিই বিব্রত হয়ে পড়ত। সারা গা তাদের ধুলোয় ময়লায় নোংরা হয়ে যেত। মা না ফিরলে তাদের পরিষ্কার ক'রে দেবে কে? কি করবে, তা বুঝে উঠতে পারত না। তার সেই বিভ্রান্তির সুযোগ নিতে কিন্তু শিশুরা ভুলত না. তখন রাগে ইচ্ছে করত, গালে দুই চড় কষিয়ে দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞের মতো ভাবনা হতো, 'ওরা তো শিশু, ওরা তো ভালমন্দ কিছুই জানে না।' সুতরাং বড় ভাই তাকেই মহানুভব হতে হবে। তারাও সচ্ছন্দে চিমটি কাটত, প্রহার করত, যতরকমে পারে তাকে বিরক্ত ক'রে তুলত। গম্ভীরভাবে তাকে এ সব কিছু সহ্য করতে হতো। দুই ভাইয়ের মধ্যে আর্ণেষ্ট ছিল বেশী দুষ্টু। অত্যন্ত বায়নাদার ছেলে, তাই মা বেরোবার সময় জাঁ-ক্রিস্তফকে সাবধান ক'রে দিয়ে যেত, যেন সে আর্ণেষ্টের বায়নাতে প্রতিবাদ না করে। আর অন্যটি, রুদলফ, ঠিক বাঁদরের মতো হিংসুটে। জাঁ-ক্রিস্তফ যখন আর্ণেষ্টকে কোলে নিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করত তখন সে সেই সুযোগে তার পেছনে যা খুশি তাই করত, খেলনাগুলো ভাঙত, জল ঢেলে ফেলে দিত, জামা-ইজের নোংরা করত, খাবারের আলমারী ধরে টানাটানি ক'রে কাপ-ডিস্ টেনে তছ-নছ করত।

বাড়ি ফিরে লুইসা যখন সেই বিপর্যয় কাণ্ড দেখত, ক্রিস্তফকে ভর্ৎসনা করত না বটে, তবে প্রশংসাও করত না; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শুধু বলত: 'তুই কিচ্ছু পারিস না!'

জাঁ-ক্রিস্তফ মনে মনে দুঃখিতই হতো, অভিমানে অন্তর ফুলেফেঁপে উঠত।

যখনি দুএক পয়সা বাড়তি উপার্জনের কোন সুযোগ মিলত, যেমন কোন বিয়ে বা কোন ধর্ম সংক্রান্ত উৎসবে রান্না-বান্না করা, লুইসা তা ছেড়ে দিত না। নিজের দম্ভে আঘাত লাগবে বলে মেলশিয়র এমন একটা ভঙ্গী করত যে, যেন এসব ছোট-

খাট ব্যাপারের সে কোন খবরই রাখে না, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানছে তত-ক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর এসব ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামাতো না। জীবনের দুঃখ-বেদনার সমস্যা সম্পর্কে জাঁ-ক্রিস্তফের কোন ধারণাই তখনও জন্মায় নি। বাবা-মার নিষেধ ছাড়া, জীবনের যে আর কোন নিষেধ থাকতে পারে, ক্ষুদে বালক তখনও জানত না। তার বাবা মা'ও তার স্বাধীন ইচ্ছায় বিশেষ কোন বাধাই দিতো না, তার খুশিমত অল্প-বিস্তর সে সবকিছুই করতে পারত। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কোনরকমে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠা, যাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছেমত সব কাজ করতে পারে। পথের প্রত্যেক বাঁকে যে বিঘ্ন দাঁড়িয়ে আছে, সে-সংবাদ তখনও সে একেবারেই জানত না; সে জানত, তার বাবা-মা সম্পূর্ণ স্বাধীন, অন্য কারও ইচ্ছার দাসত্ব যে তাদের করতে হয়, সে-ধারণাই তার ছিল না। যেদিন সে প্রথম জানতে পারল যে, মনুষ্য-সমাজে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক শ্রেণী আদেশ করে, আর এক শ্রেণীকে সেই আদেশ মেনে চলতে হয়, তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল; একটা চরম বেদনায় তার অন্তর ভেঙ্গে পড়ল যখন জানল যে তার বাবা মা সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই অভিজ্ঞানই তার জীবনের সর্বপ্রথম বেদনারূপে দেখা দিল।

একদিন অপরাহ্নে ব্যাপারটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। কতকগুলো পুরনো পোষাক কেটে ছেঁটে লুইসা জাঁ-ক্রিস্তফের জন্যে একটা পোষাক তৈরি করেছিল। সেদিন সেই পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে জাঁ-ক্রিস্তফ জননীর নির্দেশ মতো, যেখানে লুইসা কাজ করত, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। একা একা সেই অজানা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে তার লজ্জা হচ্ছিল। সামনেই উঠোনের এক-ধারে একজন দরোয়ান পাহারায় ছিল। বালককে এগিয়ে আসতে দেখে সে তাকে থামতে বলল, তারপর বিরক্তমুখে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, সে কেন বিনা হুকুমে বাড়ির ভিতরে যাচ্ছে। লজ্জায় জাঁ-ক্রিস্তফের মুখ লাল হয়ে উঠল। তার জননীর নির্দেশ মতো সে উত্তর দিল: 'সে ফ্র ক্রাফটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে!'

ফ্র কথাটার ওপর জোর দিয়ে দ্বাররক্ষী ব্যঙ্গ করে উঠল: 'ফ্র ক্রাফটের সঙ্গে! তা ফ্র ক্রাফটের সঙ্গে তোমার কি দরকার? ওহ্! বুঝেছি, বুঝেছি তোমার মা! তা ঐ নীচে দিয়ে যাও · সোজা গেলে রান্নাঘর পড়বে, সেখানে লুইসা আছে!'

আরক্তিম মুখে জাঁ-ক্রিস্তফ সেইদিকে এগিয়ে চলে। বাইরের একজন লোক এইরকম তাচ্ছিল্যভরে যে তার জননীকে নাম ধরে উল্লেখ করল, ভাবতেই সে মর্মাহত হয়ে পড়ল। তীব্র লাঞ্ছনার মতো একথা তার অন্তরে গিয়ে বিঁধল।

মনে হলো, তৎক্ষণাৎ যেন সে এখান থেকে তার সেই একান্ত-প্রিয় নির্জন নদীর ধারে, লতা-গুল্মের আড়ালে, যেখানে বসে সে নিত্য নিজেকে গল্প শোনায়, সেখানে ছুটে চলে যায়।

রান্নাঘরে গিয়ে পৌঁছতেই, অন্য সব চাকরেরা স-রবে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে উঠল। ঘরের পেছন দিকে, বৃহৎ উনুনের কাছে, মা দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেকে দেখে বিব্রতভাবে মৃদু হেসে উঠল। ছুটে সে মা'র বসনপ্রান্ত জড়িয়ে ধরল। একটা শাদা বহিরাবরণ পরে হাতে কাঠের একটা খুন্তি নিয়ে লুইসা রন্ধনকার্যে ব্যস্ত। পুত্রের লজ্জিত অধবদন লক্ষ্য ক'রে লুইসা থুতনি ধ'রে তার মুখ তুলে ধরল; হাত বাড়িয়ে সকলের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য তাকে এগিয়ে দিল; জাঁ-ক্রিস্তফ তাতে আরো বিপন্ন হয়ে উঠল। সে কিছুতেই তা পারবে না। দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে নিজের হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সাহস সঞ্চয় ক'রে কৌতূহলী চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে অপরের চোখে চোখ পড়তেই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। জননীর দিকে চেয়ে দেখে, ব্যস্ত আর গম্ভীর; জননীর এ মূর্তি সে দেখে নি। বিভিন্ন উনুনে বিভিন্ন রান্না হচ্ছে, লুইসা অনবরত এক কড়া থেকে আর-এক কড়ার কাছে যাচ্ছে, চেখে দেখছে, যেখানে যে মশলার যতটুকু প্রয়োজন হেঁকে পাচকদের বলে দিচ্ছে, তারাও গম্ভীরভাবে সেই নির্দেশ মতো কাজ করছে। জননীর সেই কর্মব্যস্ত মূর্তি দেখে বালকের আহত অন্তর কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। সকলেই তার জননীর কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছে, তার কথার এতখানি মূল্য অপরে দিচ্ছে, সেই সুসজ্জিত সুরম্য গৃহে অপরূপ সব স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন-পত্রের মধ্যে তার জননী যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে, সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বালকের আহত অন্তর গর্বে ফুলে ওঠে। জননীর মর্যাদা সম্বন্ধে এই স্পষ্ট প্রমাণে পুত্র আশ্বস্ত হয়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা থেমে যায়। বাইরে থেকে দরজা খুলে গেল। সজ্জাভরে ঝলমল করতে করতে জনৈকা মহিলা প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চারদিক দেখে নিলেন। তরুণী আর তিনি নন, কিন্তু তরুণীর মতোই হালকা ফাঁপানো পোষাকে সুসজ্জিত হয়েই আছেন। কোন জিনিসে হঠাৎ আবার লেগে না যায় তাই তিনি নিজেই পোষাকের প্রান্তভাগ হাতে ক'রে তুলে ধরেছেন। সেই ভাবেই তিনি উনুনের কাছে এগিয়ে এসে, প্রত্যেকটি কড়া ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে

দেখলেন। কোন-কোনটার থেকে ইচ্ছেমত কিছু কিছু চেখেও দেখতে লাগলেন। হঠাৎ হাত তুলে কি যেন বলছেন, জাঁ-ক্রিস্তফ বিস্মিত হয়ে দেখল, পোষাকের অন্তরালে তাঁর বাহুমূল পর্যন্ত নগ্ন দেখা যাচ্ছে। জাঁ-ক্রিস্তফের চোখে কুৎসিত এবং অশোভন বোধ হলো এই নগ্নবাহু মহিলাকে। তার জননীর সঙ্গে কি রকম রুক্ষ শুষ্কভাবে মহিলাটি কথা বলছেন! মা'ই বা অতখানি নত কণ্ঠস্বরে উত্তর দিচ্ছে কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই জাঁ-ক্রিসতফের অসহ্য ঠেকে। পাছে তাকে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে সে এক কোণে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন লাভই হয় না। হঠাৎ মহিলাটি জিজ্ঞেস করেন, ছেলেটি কে? লুইসা কোণ হতে তাকে টেনে এনে তাঁর সামনে উপস্থিত করে। অভদ্রের মতো হাত দিয়ে সে আবার মুখ না ঢেকে ফেলে, এই আশঙ্কায় জননী আগে থেকেই তার হাত ধরে থাকে। জাঁ-ক্রিস্তফের মনের মধ্যে তখন তীব্র বাসনা জাগে ছুটে পালাবার, কিন্তু বোঝে, এ-যাত্রা বাধা দেওয়া উচিত হবে না। বালকের ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলাটি প্রথমে মাতৃস্নেহে মৃদু হাসেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখের সেই স্নিগ্ধ হাসি মিলিয়ে যায়, স্নেহের বদলে কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে অনুকম্পা। অনুকম্পাভরে বালককে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। কিন্তু বালক কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। এমন সময় হঠাৎ বালকের পোষাকের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। লুইসাকে জিজ্ঞেস করেন: 'পোষাকটা ঠিক হয়েছে তো?' লুইসা তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়: 'হয়েছে!' জাঁ-ক্রিস্তফ অবাক হয়ে যায়। পোষাকটা এত আঁট হয়েছিল যে, তার প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল সে কেঁদে প্রতিবাদ করে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, তার জননী নিশ্চিন্তভাবে বলল, চমৎকার হয়েছে! আর তার পোষাকের জন্যে সেই মহিলাটিকে এইভাবে ধন্যবাদ দেবারই বা মানে কি?

জাঁ-ক্রিস্তফ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এমন সময় দেখে, মহিলাটি তার হাত ধরে তাঁর সঙ্গে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। যাবার সময় লুইসার দিকে ফিরে বললেন: 'বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাগানে খেলা করছে, সেখানে গিয়ে ও খেলা করুকগে!' অসহায়ভাবে জাঁ-ক্রিস্তফ জননীর দিকে ফিরে চায়। কিন্তু মহিলাটির দিকে তাকিয়ে লুইসা যে ভাবে আনন্দের আগ্রহে হাসল, তা দেখে জাঁ-ক্রিস্তফের মনে বিন্দুমাত্র আর সন্দেহ রইল না যে এই নতুন অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মার কাছে কোন সাহায্যই সে পাবে না। বলির পশু যেমন যূপকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে চলতে বাধ্য হয়, জাঁ-ক্রিস্তফও তেমনিভাবে সেই মহিলাকে অনুসরণ ক'রে চলল।

মহিলাটি জাঁ-ক্রিস্তফের হাত ধরে গৃহ-সংলগ্ন এক বাগানে এলেন। জাঁ-ক্রিস্তফ দেখল, তারই সমবয়সী একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বিষণ্ণ বিরক্ত মুখে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে, যেন এই মাত্র তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। জাঁ-ক্রিস্তফের আগমনে তারা যেন মনকে চাগিয়ে তুলবার খোরাক পেয়ে গেল। এগিয়ে এসে নবাগতকে ভাল ক'রে একবার দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিল। মহিলাটি তাকে রেখে ফিরে গেলেন, জাঁ-ক্রিস্তফ সেখানেই নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল, প্রস্তর-স্থির, চোখ তুলে দেখবার সাহস পর্যন্ত যেন তার নেই। একেবারে সামনে না এসে সেই ছেলেটি আর মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আপাদ-মস্তকে তাকে নিরীক্ষণ ক'রে নিল, তার পর ঘাড় নেড়ে পরস্পর কি যেন পরামর্শ করল। অবশেষে তারা মত স্থির ক'রে ফেলল। আর একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কে সে, কোথা থেকে এসেছে, তার বাবা কি করেন, ইত্যাদি। জাঁ-ক্রিস্তফ তেমনি পাথরেবর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, কোন জবাব দিতে পারে না। এক অজানা আশঙ্কায় তার চোখ ফেটে যেন জল আসবার উপক্রম হয়; বিশেষ ক'রে সেই কুঞ্চিত-কেশ স্কার্টপরা ছোট মেয়েটির ভঙ্গী দেখে তার অস্বস্তি আরো বোধ হতে থাকে।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর জাঁ-ক্রিস্তফ বহু চেষ্টায় সাহস ক'রে নিজেকে সহজ ক'রে নেয়। এমন সময় ছেলেটি সোজা তার সামনে এসে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার গায়ের কোটের ওপর আঙুল রেখে বলল:

'আরে, এ যে আমার কোট!'

জাঁ-ক্রিস্তফ কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তার গায়ের জামা যে অপরের হতে পারে, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। ঘাড় নেড়ে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাল।

কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে ছেলেটি বলে উঠল: 'আলবৎ, এটা আমার কোট···আমি জোর ক'রে বলতে পারি, আমার সেই নীল রঙের পুরনো ওয়েস্ট কোটটা, এক-জায়গায় একটা দাগ পর্যন্ত আছে····এই যে···' এই বলে অবলীলাক্রমে সেই দাগটির ওপর আঙুল রাখল। জাঁ-ক্রিস্তফের সমস্ত পোষাক নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে দেখতে তার পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে হেসে উঠল: 'বারে, বেশ তো! তালি-দেওয়া পুরনো জুতো · চামড়ার? না, কাগজের? কিসের তৈরি?'

জাঁ-ক্রিস্তফ রাগে লাল হয়ে উঠল। মেয়েটি ঠোঁট ফুলিয়ে তার ভাইয়ের কানে কানে কি যেন বলল। জাঁ-ক্রিস্তফ শুধু শুনতে পেল: 'আহা, গরীব যে—'

জাঁ-ক্রিস্তফের মনে তীব্র প্রতিবাদ জেগে ওঠে। এই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর হবে মনে ক'রে, রাগে রুদ্ধকণ্ঠে সে ঘোষণা ক'রে : 'মেলশিয়র ক্রাফটের পুত্র সে, তার জননী শ্রীমতী লুইসা, তাদেরই পাচিকা!' তার ধারণায় যে-কোন সম্ভ্রান্ত কাজের মতন, পাচিকার কাজও রীতিমত সম্ভ্রান্ত ও উল্লেখযোগ্য। এবং তার এই ধারণার মধ্যে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু যাদের জন্য সে এই কথার উত্থাপন করল, তারা সে-সংবাদে যেন আরো মজা পেয়ে গেল, এই মাতৃ-পরিচয়ের দরুন বিশেষ কোন সম্ভ্রমের চোখে তাকে দেখার কেনে আভাসই তাদের দু'জনের মধ্যে দেখা গেল না। বরং তাদের কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনুকম্পার সুর এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছেলেটি হেসে জিজ্ঞেস করল : 'তা তুমি নিজে কি হবে মনে করেছ, পাচক, না, কোচোয়ান?' জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হলো, তার ভেতরটা যেন বরফের মতো হিম হয়ে যাচ্ছে।

সাধারণতঃ ধনীর ঘরের আদুরে দুলালরা তাদের সমবয়সী দরিদ্র বালকের ওপর অহেতুক উৎপাত করতে এবং অবজ্ঞায় নিষ্ঠুর আঘাত হানতে রীতিমত একটা আনন্দ লাভ ক'রে থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। জাঁ-ক্রিস্তফকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে তারা আরো মজা পেয়ে গেল। তাকে ক্ষেপিয়ে উত্ত্যক্ত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করল না। বিশেষ ক'রে সেই ছোট্ট মেয়েটি। সে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে, জাঁ-ক্রিস্তফ কিছুতেই দৌড়োতে পারবে না, ঐ রকম আঁট পোষাকে কি আর কেউ দৌড়োতে পারে? সেই সঙ্গে তার দুষ্টু বুদ্ধি জাগল, জাঁ ক্রিস্তফকে সে লাফাতে বাধ্য করবে। কতগুলো কাঠ পাশাপাশি রেখে, সে ক্রিস্তফকে ধরে বসল লাফিয়ে পার হতে হবে। দেখবে সে কত বড় ওস্তাদ! জাঁ-ক্রিস্তফ জানত সেই আঁট-পোষাকে লাফানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের সামনে তা স্বীকার করতে আত্মসম্মানে বাধল। তাই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংহত ক'রে সে লাফিয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে সটান মাটিতে পড়ে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জনে হেসে গড়িয়ে পড়ল। জাঁ-ক্রিস্তফ এত সহজে পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে পারল না, উঠে দাঁড়াল, আবার সে চেষ্টা করবে। দুই চোখ জলে টলটল করছে, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ ক'রে মরিয়া হয়ে আবার লাফাল...এবং কৃতকার্যও হলো। কিন্তু এতেও তার শাস্তিদাতারা তৃপ্ত হতে পারল না, বলল : 'তেমন আর কি উঁচু জায়গা থেকে লাফালে!' আরো কাঠ এনে এবার তারা এমন উঁচু করল যে তা লাফিয়ে পার হওয়া অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। জাঁ-ক্রিস্তফ বিদ্রোহী হয়ে এবার বলল : না, সে আর কিছুতেই লাফাবে না।

মেয়েটি বলে উঠল : 'ভুয়ো, ভীরু···এতো ভীরু!' এ অভিযোগ সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। সে জানত যে, সে পারবে না, পড়ে যাবে, তবুও সে লাফাল এবং পড়েও গেল। কাঠে পা আটকিয়ে গেল, সমস্ত কাঠ গড়িয়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ল। হাত ছড়ে গেল, মাথায় রীতিমত আঘাত লাগল, এবং সর্বোপরি, প্যাণ্টটি ছিঁড়ে ফেঁসে গেল। অত্যন্ত লজ্জা পেল ক্রিস্তফ · শুনতে লাগল, তাকে ঘিরে তারা দু'জনে করতালি দিয়ে আনন্দে নাচছে। মর্মান্তিক বেদনায় সে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। বুঝল, তারা তাকে তুচ্ছ বিবেচনা করেই মজা করছে। কিন্তু কেন? কেন? সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল যেন সে মরে যায়! যে মুহূর্তে বালক জীবনে সর্বপ্রথম জানতে পারে যে জগতে অন্যায় বলে কিছু আছে, সেই মুহূর্তে চেতনার যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন সে ভোগ করে, জগতে তার তুলনা নেই। তখন তার ধারণা হয় যে, সমগ্র জগৎ যেন তাকেই নিপীড়ন করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে এবং সে-নিপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করবার কেউ নেই। কেউ নেই, কিছু নেই!···
জাঁ-ক্রিস্তফ মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করতেই তারা ঠেলে আবার তাকে ফেলে দেয়; মেয়েটি লাথি ছোঁড়ে, গায়ে লাগে। আবার উঠতে চেষ্টা করতেই, তারা দু'জনে লাফিয়ে তার পিঠের ওপর চেপে ব'সে মাটিতে মুখ রগড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এরপর আর ক্রিস্তফ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না···সহ্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে! হাত ছড়ে গিয়েছে, অমন সুন্দর কোটটি ছিঁড়ে গিয়েছে—লজ্জা, বেদনা, অবিচারের বিরুদ্ধে অন্ধ আক্রোশ, সমস্ত একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে ক্রোধে পাগল ক'রে তুলল। হামাগুড়ি দিয়ে সে নিজেকে ঠেলে কোনরকমে দাঁড় করাল, ক্ষেপা কুকুরের মতো শাস্তিদাতাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দু'জনকেই মাটিতে টেনে ফেলে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে তারা প্রতি-আক্রমণ করতেই সে রুখে দাঁড়াল, মাথা নীচু ক'রে মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সজোরে একটা ঘুসিতে ছেলেটিকে একেবারে ফুলবাগানের মাঝখানে ফেলে দিল।

আহত দু'জনে চিৎকার ক'রে ওঠে। চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে ছুটল। দুম্‌দাম্ ক'রে দরজা খোলার শব্দ হলো, রাগে কারা যেন চিৎকার ক'রে উঠল। জাঁ-ক্রিস্তফ দেখল আলুলায়িত পোষাক কোনরকমে সামলাতে সামলাতে সেই ভদ্রমহিলা তারই দিকে ছুটে আসছেন। সে পালাবার কোন চেষ্টাই করল না। মনে মনে সে ভীত হয়েছে, কিন্তু কি করবে, অন্যায় এর আগে আর কখনও সে করেনি। কিন্তু যা ঘটে গিয়েছে, তার জন্য তার মনে কোন ক্ষোভও হয় নি।

ভদ্রমহিলা তার ওপর যেন বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং কোন কথা না বলেই প্রহার করতে লাগলেন। জাঁ-ক্রিস্তফের কানে শুধু আসে, তাঁর ক্রুদ্ধ গর্জন, গালাগালের বন্যা। কোন কথা আলাদা ক'রে স্বতন্ত্র ক'রে সে বুঝতে পারে না। রাগে ভদ্রমহিলার সমস্ত কথা মুখে জড়িয়ে যায়। তার পরাভবের লজ্জা স্বচক্ষে উপভোগ করার জন্যই যেন তার ক্ষুদে শত্রুরাও মহিলার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির ভৃত্যরাও এসেছে। চারদিক হতে বিভিন্ন কণ্ঠের আওয়াজ উঠছে। তার পরাভবকে যেন সম্পূর্ণ করবার জন্যেই, লুইসাও এসে হাজির হলো, তাকে ডাকিয়ে আনা হলো এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, মাও কোন কিছু না জেনেই, কিছু জিজ্ঞেস না করেই, তাকে সমর্থন করা দূরে থাক, তাকেই ভর্ৎসনা করল এবং বলল ক্ষমা চাইতে। এ সে মেনে নেবে না। ক্রোধে ক্ষিপ্ত বালক তা অস্বীকার করল। হাত ধরে টানতে টানতে লুইসা তাকে ভদ্রমহিলা আর সেই দুটি শিশুর সামনে এনে হুকুম করল, নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে। রাগে আস্ফালন করতে করতে জাঁ-ক্রিস্তফ মা'র হাত কামড়িয়ে দিল। কোনরকমে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে চাকরদের পাশ কাটিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল। চাকররা হো হো ক'রে হেসে উঠল।

জাঁ-ক্রিস্তফ ছুটতে লাগল...তার বুকের ভেতরটা ধক্ ধক্ ক'রে যেন জ্বলছিল...রাগে এবং সেই সঙ্গে যে সব চপেটাঘাত তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, তার দরুন তখনও তার মুখ জ্বালা করছিল। চেষ্টা ক'রে মন হতে সমস্ত চিন্তা সরিয়ে দিয়ে, সে জোরে, আরো জোরে ছুটতে লাগল, রাস্তার মাঝে আবার সে কেঁদে না ফেলে। কোনরকমে সে এখন নিজের ঘরখানাতে গিয়ে পৌছোতে চায়, সেখানকার নির্জনতায় অন্ততঃ প্রাণ খুলে সে কাঁদতে পারবে। ভিতর হতে যেন তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল. সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছে, এখুনি হয়তো সে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।

অবশেষে, ঘরে এসে সে পৌছল। পুরনো ভাঙ্গা বিবর্ণ সিঁড়ির ওপর দিয়ে ছুটে বাতায়নের তলায় তার অভ্যস্ত কোণটিতে গিয়ে আশ্রয় নিল, যেখান থেকে বাইরে নদীট চোখে পড়ে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তার চোখ ফেটে অশ্রু-বন্যা বেরোল। কেন যে তার এই কান্না, তা ঠিক সে বুঝলও না, বুঝতে চেষ্টাও করল না, শুধু বুঝল তার চোখ ভরে কান্না আসছে। কান্নার প্রথম জোয়ার চলে গেলেও সে থামতে পারল না; আবার কেঁদে উঠল...আজ কাঁদতেই সে চায়...দুর্বার ক্ষোভে সে ঠিক করল, নিজেকে এইভাবে কাঁদিয়েই সে যাতনা দেবে...যেন এইভাবে

নিজেকে যাতনা দিয়েই সে অপর সকলকে শাস্তি দিতে পারবে। অপরকে শাস্তি দেবার আর কোন উপায়ই তো তার জানা নেই! হঠাৎ মনে পড়ল, বাবা বাড়ি এলে মা নিশ্চয়ই সব কথা তাঁকে জানাবে, নতুন ক'রে তখন আবার শুরু হবে শাস্তি। ক্রিস্তফ স্থির করল, সে পালিয়ে যাবে, যেদিকে খুশি, যেখানে খুশি চলে যাবে, আর কখনও ফিরে আসবে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই একেবারে তার বাবার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল, মেলশিয়র তখন সিঁড়ি দিয়ে উপরেই উঠছিল।

মেলশিয়র জিজ্ঞেস করল: 'এখানে কি হচ্ছিল . কোথায় যাওয়া হচ্ছে আবার?'

উত্তর না দিয়ে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

'মনে হচ্ছে একটা কিছু বদমায়েশী যেন করেছিস···ব্যাপার কি?'

জাঁ-ক্রিস্তফ নীরব।

মেলশিয়র আবার জিজ্ঞেস করে: 'কি করেছিস্? বল। চুপ ক'রে রইলি যে?'

এবার বালক কেঁদে ফেলল। সে যত কাঁদে, মেলশিয়রও ততো চিৎকার করে। এমন সময় দেখা গেল লুইসা তাড়াতাড়ি সেদিকেই আসছে। লুইসা রেগেই ছিল। জাঁ-ক্রিস্তফকে দেখেই সে ভীষণ ভাবে ভৎর্সনা শুরু ক'রে দিল, মেলশিয়র তাতে শুধু ইন্ধন জোগাল। রাগে সে ছেলেকে নির্মম প্রহার করতে শুরু ক'রে দিল, সে প্রহারে হয়তো একটা ষাঁড় মাটিতে শুয়ে পড়ত। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সমানে গাল দেয়, সমানে আর্তনাদ ক'রে চলে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ছেলেকে ছেড়ে কখন তারা স্বামী-স্ত্রীতে নিজেদের মধ্যে ক্রুদ্ধ ঝগড়া শুরু ক'রে দিয়েছে। জাঁ-ক্রিস্তফকে প্রহার করবার সময়, মেলশিয়র সারাক্ষণ শুধু এই কথাই তারস্বরে বলতে থাকল যে, সে যা বলেছিল, তাই ঠিক, ঘরের বউ যদি বাইরে কাজ করতে যায়, তা হলে এই রকম ব্যাপারই ঘটে: বিশেষ ক'রে যেসব লোক মনে করে যে, টাকার জোরে তারা সব কিছুই করতে পারে, তাদের কাছে কাজ করলে, ঘটনার এ পরিণতিই স্বাভাবিক। লুইসাও ছেলেকে প্রহার করবার সময় চেঁচিয়ে বলে, মেলশিয়র স্বামী হলেও মানুষ নয়, পশু···কিছুতেই ছেলের গায়ে তাকে সে হাত দিতে দেবে না···তারই প্রহারে ক্রিস্তফের সত্যিকারের আঘাত লেগেছে। বস্তুতঃ তখন জাঁ-ক্রিস্তফের নাক দিয়ে একটু একটু রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল···সেদিকে তার কিছুমাত্র খেয়াল ছিল না। লুইসা একটা ভিজে গামছা এনে তাড়াতাড়ি সেখানে চেপে ধরল, কিন্তু তার জন্য মা'র প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞ হবার কোনই তাগিদ বোধ করল না, কেন না, তখনও

সমানে মা ভৎর্সনা ক'রেই চলেছিল। অবশেষে একটা ছোট্ট অন্ধকার কুঠুরিতে বালককে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হলো। তার আহারও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

ঘরের ভিতর থেকে সে শুনতে পেল, বাবা-মা দু'জনে পরস্পর পরস্পরকে চেঁচিয়ে সমানে গালাগাল দিচ্ছে। সে ভেবে ঠিক করতে পারল না তাদের দু'জনের মধ্যে কাকে বেশী ঘৃণা সে করে। হয়তো তার মা'কেই বেশী ঘৃণা করে, কারণ, তার কাছ থেকে এই দুর্ব্যহার সে কোনদিনই আশা করে নি। সেদিনকার সেই দুর্দৈবে সে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সারাদিন ধরে একটার পর একটা দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হয়েছে: সেই বড়লোক শিশুদের অত্যাচার, সেই ভদ্রমহিলার অবিচার, এমনকি তার নিজের মা বাপের অবিচার···কিন্তু এ-সবের উর্ধ্বে রক্ত-ঝরা তাজা ক্ষতের মতো তার মনে সুগভীর দাগ কেটে বসেছিল, তার বাবা-মা'র লাঞ্ছনা। যে বাবা-মা সম্পর্কে তার গর্বের অন্ত ছিল না, সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, কেন তারা ঐ নীচ জঘন্য লোকগুলোব কাছে নিজেদের এতখানি ছোট ক'রে রেখেছে? অস্পষ্ট হলেও জীবনে এই প্রথম সে প্রত্যক্ষভাবে দেখল এক বিচিত্র কাপুরুষতা। সমস্ত মন তার ধিক্কার দিয়ে উঠল। তার জগতে সব কিছু যেন উল্‌টিয়ে গেল, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে তার স্বাভাবিক যে গর্ব-বোধ ছিল, পিতামাতার সম্মান, যা তার কাছে একমাত্র ধর্ম বলে মনে হতো, জীবন সম্বন্ধে তার অগাধ বিশ্বাস, অপরকে ভালোবাসা এবং অপরের ভালোবাসা পাওয়ার যে সহজ দাবী, প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন তার সহজাত নৈতিক চেতনা—সব যেন একদিনে উল্‌টিয়ে গেল। যেন একটা পরিপূর্ণ প্রলয় হয়ে গেল। কোন্ এক অজ্ঞেয় অন্ধ পশু-শক্তি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল, তার আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করবার যেন কোন শক্তিই আর তার নাই। তার কাছ থেকে পালাবার পথও সে জানে না। বন্ধ ঘরের মধ্যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হলো। মনে হলো যেন, মৃত্যু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অসহায় বিদ্রোহে তার সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হয়ে যেন কাঠ হয়ে এল। রুদ্ধ-ঘরের গায়ে হাতের মুঠো দিয়ে, মাথা দিয়ে, পা দিয়ে আঘাত করতে করতে কখন আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

সেই শব্দে সচকিত হয়ে লুইসা ও মেলশিয়র দু'জনেই ছুটে এল। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে, দু'জনেই তাকে হাত ধরে টেনে কোলে নেবার চেষ্টা করে। তাদের দু'জনের মধ্যে যেন আদর দেখাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। জামা

খুলে লুইসা তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, তার পাশে বসে থাকে। সুস্থির না হওয়া পর্যন্ত ছেলের পাশে বসে রইল। কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ একবিন্দুও টলল না। তার ওপর অযথা যে অবিচারের বর্ষণ হয়ে গেল, তা সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। মাকে সেখান থেকে সরাবার জন্যে নিদ্রার ভান ক'রে রইল। আজ তার কাছে মাও ছোট হয়ে গিয়েছে। তখনও পর্যন্ত সে ক্ষীণতমভাবেও জানত না, শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে এবং তাদের সকলকেই বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কি বেদনাই না তার মাকে ভোগ করতে হয়, এবং আজ তাকে এই যে ভৎ‍র্সনা করতে হলো, তার জন্যে কতখানি যন্ত্রণা যে এই নারী নিজেকে দিয়েছে, তার কোন ধারণাই তো জাঁ-ক্রিস্তফের নেই।

শিশুর দু চোখে কি গভীর অশ্রুর সঞ্চয় না থাকে! তার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত যখন ঝরে পড়ে নিঃশেষিত হয়ে গেল, জাঁ-ক্রিস্তফ যেন একটু সুস্থির বোধ করল। ক্লান্ত অবসন্ন সে হয়েছে বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার শিরা-উপশিরা এতদূর উত্তেজিত যে তার চোখে আর ঘুম আসে না। অর্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে শুয়ে থাকে। মনের ভিতর একে একে ভাসতে ভাসতে চলে যায় স্মৃতির ছায়াচিত্র। তার মধ্যে বিশেষ ক'রে ভেসে উঠল, উজ্জ্বল-চোখ সেই ছোট্ট মেয়েটি, ঈষৎ-উন্নত গর্বিত ছোট্ট নাক, কুঞ্চিত কেশের রাশি কাঁধের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, সেই ছোট্ট দুটি নগ্ন পা, সেই অস্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গী। হঠাৎ সে কেঁপে উঠল, মনে হলো, যেন সেই মেয়েটার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট সে শুনতে পাচ্ছে। মনে পড়ে যায়, কি বোকার মতো ব্যবহার সে তার সামনে ক'রে এসেছে এবং সেই চেতনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বন্য ঘৃণা সেই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনে জেগে ওঠে। সেই মেয়েটাই আজ তাকে এই হীন অবস্থায় এনে ফেলেছে, তাকে বিন্দুমাত্র ক্ষমা সে করবে না: এক দুর্বার বাসনা তার মধ্যে মাথা উঁচিয়ে উঠতে থাকে, এমনি অপদস্থ তাকেও সে করবে, এমনিভাবে একদিন তাকেও সে কাঁদাবে। মনে মনে সন্ধান করে, কি ভাবে সে-বাসনা চরিতার্থ করা যায়, কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। সে-মেয়েটি যে তার সম্পর্কে এতটুকু সচেতন হবে এমন কোন গুণই তো তার নেই। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, নিজের মনের মধ্যে নিজেকে ভেঙে চুরে বড় ক'রে গড়ে তুলতে থাকে। যা হতে পারলে মেয়েটিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়, কল্পনায় নিজেকে সেইভাবে ভেবে চলে। ভাবতে ভাবতে কখন সে ঠিক তাই হয়ে যায়। সে যেন অসীম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। চারদিকে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেই খ্যাতির আকর্ষণে সেই মেয়েটি আজ উপযাচক

হয়ে তার ভালোবাসা চাইতে এসেছে। তার পর কি হবে, তার কাহিনী সে সবিস্তারে নিজেকে শোনাতে থাকে···এমনি অসংখ্য অসম্ভব কাহিনী প্রতিদিন সে নিজেকে শোনায়···তার কাছে সেইসব অসম্ভব কাহিনী বাস্তবের চেয়েও বাস্তব মনে হতো।

তার ভালোবাসা পাবার জন্যে মেয়েটি মুমূর্ষু হয়ে উঠেছে···কিন্তু সে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মেয়েটির বাড়ির সামনে দিয়ে যখনি সে যায়, তখনি খোলা জানালার পর্দার আড়ালে মুখ লুকিয়ে মেয়েটি তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, জাঁ-ক্রিস্তফ তা জানে কিন্তু এমনভাবে সে চলে যায়, যেন সে-সম্পর্কে সে কিছুই লক্ষ্য করে নি, আপনার মনে আনন্দে পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে চলে যায়। তার পর একদিন সে দেশ ছেড়ে দূর দূরান্তরে বেড়াতে বের হলো, ইচ্ছে করেই মেয়েটির যন্ত্রণা বাড়াবার জন্যে তার এই বহিঃভ্রমণ। দূর দেশে নানা অসাধ্য সাধন সে করল। গল্পের এই অংশে সে বৃদ্ধ ঠাকুরদার মুখ থেকে যেসব বীরত্বের কাহিনী শুনেছিল, তার থেকে বেছে বেছে বীরত্বের অংশগুলো নিজের কীর্তির সঙ্গে জুড়ে দিল। সে যখন এইভাবে দূর দেশে একটার পর একটা বীরত্ব দেখিয়ে চলেছে, মেয়েটি তখন ঘরে বসে তারই জন্যে শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। মেয়েটির মা, সেই উদ্ধত ভদ্রমহিলা, আজ উপযাচিকা হয়ে তার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে লিখেছেন : 'দুধের বাছা আমার মরতে বসেছে··· আমার অনুরোধ, তুমি ফিরে এসো!' সে ফিরে এল। মেয়েটি শয্যায় শুয়ে আছে। গোলাপ ফুলের মতো মুখখানা ম্লান বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। নীরবে মেয়েটি শুধু তার দিকে দুবাহু বাড়িয়ে দেয়। কথা বলবার শক্তি তার নেই, শুধু নীরবে তার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুম্বন করে, চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অবশেষে জাঁ-ক্রিস্তফ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখে, তখন তার দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অসীম করুণা আর স্নেহ। তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার জন্যে আদেশ করে, সেই সঙ্গে জানিয়ে দেয়, অতঃপর তাকে ভালোবাসবার অধিকার সে তাকে দিতে সম্মত আছে। গল্পের ঠিক এই সন্ধিক্ষণে, যখন সে ফিরে এসে মেয়েটির সঙ্গে পুনর্মিলিত হচ্ছে, তাদের সেই সময়কার অঙ্গ-ভঙ্গী এবং কথাবার্তা বারবার মনে মনে অভিনয় করতে তার বেশ ভাল লাগে এবং সেই বহু-আকাঙ্খিত স্নিগ্ধতার আবেশে কখন তার অজ্ঞাতে নিদ্রা এসে অধিকার বিস্তার ক'রে বসে, সে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমের মধ্যে কে যেন সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়।

যখন আবার সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল তখন দিন হয়ে গিয়েছে···কিন্তু আজকার এই দিন তার পূর্ববর্তীদের মত আর তেমন যেন উজ্জ্বল বোধ হয় না, তেমন যেন আর হালকা বোধ হয় না। ইতিমধ্যে তার জগতে এক মহা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। জাঁ-ক্রিস্তফ আজ জানে অবিচার মানে কি।

*　　　*　　　*

বাড়িতে ইদানীং প্রায়ই দুর্দশার চরম অবস্থা প্রকট হইয়া উঠেছে। ক্রমশঃ সে-অবস্থা ঘন ঘন দেখা দিতে থাকে। অতি অল্প আয়োজনের মধ্যে তাদের সংসার চালাতে হয়। জাঁ-ক্রিস্তফের চেয়ে এ-বিষয়ে বেশী সজাগ আর কেউ ছিল না। বাবা তো কিছুই তাকিয়ে দেখত না। যা কিছু জুটত, তাকেই প্রথম পরিবেশন করা হতো এবং তার মাত্রায় কিছুই কম পড়ত না। বাবা তেমনি এলোমেলো যা-তা বকত, নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেটে পড়ত, ফিরেও দেখত না, তার কাণ্ড দেখে তার স্ত্রী বাধ্য হয়ে জোর ক'রে কিভাবে নিজেকে সংযত করেছে। নিজের খাওয়া শেষ ক'রে যখন সে খাবারের ডিস তাদের দিকে সরিয়ে দিত, তখন তাতে অর্ধেকেরও কম খাবার পড়ে থাকত, তা থেকে লুইসা ছোটদের দুটি ক'রে আলু গুনে তুলে দিত। ডিসখানা যখন ক্রিস্তফের কাছে আসত, তখন কখন কখন মাত্র তিনটি আলু পড়ে থাকত। জাঁ--ক্রিস্তফ টেবিলে বসবার আগেই লক্ষ্য ক'রে নিত। সে জানত তার মা'র জন্য কেউই ভাবত না। তাই তার কাছে ডিস এলে সে হিসেব ক'রে গুনে দেখে নিত। যেদিন দেখত, মাত্র তিনটি আলু পড়ে আছে, সেদিন চেষ্টা ক'রে নিজেকে সংযত ক'রে নিত, অন্যমনস্কভাবে জননীকে জানাত : 'আমাকে শুধু একটা দাও, মা!'

লুইসা একটু যেন থতমত খেয়ে যেত।

'কেন, সবাই যখন দুটো ক'রে নিয়েছে তুইও দুটো নে!'

'না, লক্ষ্মীটি মা···একটা দাও!'

'কেন? তোর কি ক্ষিদে পায় নি!'

কিন্তু লুইসাও একটার বেশী আর নিত না। দু'জনে অতি সন্তর্পণে তখন সেই একটি আলুকে ছাড়াতে আরম্ভ করত, টুকরো টুকরো ক'রে কাটত এবং যত আস্তে আস্তে সম্ভব বসে বসে খেত। লুইসা পুত্রের খাওয়া লক্ষ্য করত, শেষ হলে বলে উঠত: 'এই নে, আর একটা!'

'না, মা।'

'কেন? সত্যি অসুখ করেছে নাকি?'

'অসুখ করে নি তবে আমার পেট ভরে গিয়েছে।'

মেলশিয়র ধমক দিয়ে উঠত, অবাধ্য বলে পুত্রকে ভর্ৎসনা করত এবং সেই সঙ্গে অবশিষ্ট শেষ আলুটি নিজেই তুলে খেয়ে ফেলত। জাঁ-ক্রিস্তফ বাবার এই কায়দাটি বুঝে ফেলল। তাই ইদানীং শেষ আলুটি নিজের ডিসেই তুলে নিত। আর্ণেষ্টের জন্যে রেখে দিত। আর্ণেষ্টের ক্ষিধে যেন কিছুতেই মিটত না। খাওয়া শুরু হবার সময় থেকেই জাঁ-ক্রিস্তফ লক্ষ্য করত, সে এই সর্বশেষ আলুটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে সব সময়েই আড় চোখে তাকিয়ে থাকত। জাঁ-ক্রিস্তফের খাওয়া শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে উঠত :

'তুমি বুঝি ওটা আর খাবে না দাদা? আমাকে দাও না!'

সত্যিই, জাঁ-ক্রিসতফ তার বাবাকে ঘৃণা করত, তীব্রভাবে ঘৃণা করত, ঘৃণা করত কারণ তাদের কথা মেলশিয়র একেবারে ভাবত না ব'লে, পিতা হয়ে পুত্রদের খাবারের অংশ যে নির্বিবাদে খেয়ে ফেলেছে তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। জাঁ-ক্রিস্তফ নিজে ক্ষিধের জ্বালায় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত এবং তখন ইচ্ছে হতো স্পষ্ট সে তার বাবাকে জানিয়ে দেয় যে, বাবাকে ঘৃণা করে এই কারণেই; কিন্তু পরক্ষণেই তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগে, সে বোঝে, একথা বলবার কোন অধিকারই আজ তার নেই, কারণ তার নিজের জীবিকা সে তো নিজে অর্জন করছে না। যে রুটির টুকরো তাকে খেতে হয়, সে তো তার বাবাই এনে দেয়। সে তো নিজে কোন কাজেরই নয়, অপরের স্কন্ধে সে এখনও একটা বোঝা বিশেষ···সুতরাং এ ব্যাপারে কোন কথা বলবার অধিকারই তো তার নেই। হয়তো ভবিষ্যতে কোন দিন সে বলতে পারবে—যদি অবশ্য ভবিষ্যতের দিন বলে কিছু থাকে! কিন্তু হায়! তার আগে হয়তো ক্ষিধেয় তাকে মরেই যেতে হবে!···

এই জাতীয় স্বেচ্ছাবৃত উপবাসের ফলে তার বলিষ্ঠ দেহ মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠত। মনে হতো সর্বদেহ যেন কাঁপছে, মাথার ভেতর কে যেন আঘাত ক'রে চলেছে। বুকের ভেতর যেন একটা গর্ত হয়ে গিয়েছে, সে গর্ত যেন কেবল বড়ই হচ্ছে, আর কে যেন সেই গর্তের মুখে স্ক্রু বসিয়ে প্যাঁচ কষছে। তবুও সে অভিযোগ করত না। সব সময়ই সে অনুভব করত মা'র সজাগ দৃষ্টি তার ওপর যেন রয়েছে, তাই সে ভাব করতো যেন সে উদাসীন। অন্তরের অদৃশ্য স্নেহ-বন্ধনী দিয়ে লুইসা অস্পষ্ট বুঝতে পারত অভাবের সংসারে অন্যদের দিতে গিয়ে তার এই ক্ষুদে বুঝদার ছেলেটি হয়তো নিজেকে বঞ্চিত করেই চলেছে।

লুইসা মন থেকে সে-চিন্তা দূর ক'রে দেবার চেষ্টা করত, কিন্তু বারে বারে সেই দুশ্চিন্তা মনের চারিভিতে ফিরে ফিরে এসে ঘা দিত। মাঝে মাঝে প্রবল ইচ্ছে হতো, ক্রিস্‌তফকে বুকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু সাহসে কুলোত না। যদি জাঁ-ক্রিস্‌তফ বলে : হাঁ, সত্যিই সে সংসারে অপরের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করেই চলেছে, তখন মা হয়ে সে কি করবে? কি করতে পারে? লুইসা নিজে শিশুকাল থেকে এই ক্ষিধের যন্ত্রণায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যখন প্রতিকার করবার কোন পথ নেই, তখন অভিযোগ করেই বা কি লাভ? তার সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আর স্বল্প-তুষ্ট মন নিয়ে লুইসা যে যন্ত্রণা ভোগ করত, সে কোনদিন সন্দেহ করে নি যে, তার বালক পুত্র তার বেশী যন্ত্রণা পেতে পারে। কোন দিন কোন কথা সে মুখ ফুটে বলত না, শুধু মাঝে মাঝে যখন ছেলেরা রাস্তায় খেলা করত এবং মেলশিয়র তার ধান্ধায় বের হয়ে যেত, বাড়িতে সে আর তার বড় ছেলে ছাড়া কেউ আর থাকত না, তখন তার হয়ে এটা-সেটা করবার অছিলায় জাঁ-ক্রিস্‌তফকে বাড়িতে থাকবার জন্য সে বলে যেত। মা'র সঙ্গে থেকে জাঁ-ক্রিস্‌তফ মা'র কাজে নীরবে সাহায্য করত। লুইসা নিজেকে আর চেপে রাখতে পারত না। হঠাৎ হাতের কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লুইসা আবেগে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরত। ক্রিস্‌তফ তো আর এখন শিশুটি নেই, তা সত্ত্বেও তাকে কোলে বসিয়ে প্রাণ ভ'রে আদর করত লুইসা। জাঁ-ক্রিস্‌তফ দু'হাত দিয়ে মা'র কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরত, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় মা-ছেলে সমানে অঝোরে কাঁদত।

'ওরে, ওরে আমার বাছা রে।'

'মা · মাগো···'

এর বেশী আর কোন কথা তারা বলতে পারত না। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই তারা যেন পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারত।

এর কিছুদিন পরে একদিন জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝতে পারল, তার বাবা মদ খায়, মাতাল। প্রথম প্রথম মেলশিয়রের মাতলামি তবুও খানিকটা সীমার মধ্যে ছিল—তার মধ্যে বর্বরোচিত তখনও কিছু ছিল না। শুধু অকারণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার কলরবে তা ধরা পড়ত। মূর্খের মতো যা-তা মন্তব্য করত, টেবিল চাপড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার মনে গান গেয়ে চলত এবং কখন কখন লুইসা আর ছেলেদের নিয়ে নাচবার খেয়াল মাথায় চাড়া দিয়ে উঠত। ক্রিস্‌তফ লক্ষ্য করতো, বাবার এ-অবস্থা দেখে মা'র মুখ কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যেত। দূরে সরে এসে

লুইসা চেষ্টা করত ঘাড় নীচু ক'রে কাজ ক'রে যেতে। পারতপক্ষে স্বামীর মত্ত দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত···হঠাৎ কোন কুৎসিত কথা মেলশিয়র বলে উঠলে, লজ্জায় রক্তিম হয়ে লুইসা তাকে একান্ত শান্তভাবে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করত। আগে জাঁ-ক্রিস্‌তফ এ-সব কিছু বুঝত না। আনন্দের এতখানি তীব্র অভাব সে সারাদিন অনুভব করত যে, বাবার এই কোলাহল-মুখর গৃহ-প্রত্যাবর্তন তার কাছে পরম বিচিত্র বলেই মনে হতো। সারা দিনের বিষণ্ণ নীরবতার মধ্যে এই মত্ত কোলাহল তার কাছে বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে আসত। মেলশিয়রের উন্মাদ উক্তি আর ভাঁড়ামিতে সে প্রাণ খুলে হাসত, তার সঙ্গে নাচত, গাইত···হঠাৎ লুইসা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে থামতে আদেশ করতো, সে ক্ষুব্ধ হয়েই থামত। যখন তার বাবা নিজেই এমন করছে, তখন আর এসবের মধ্যে অন্যায় কি থাকতে পারে? তার একান্ত সজাগ দৃষ্টি-শক্তির সাহায্যে সে একবার যা দেখতো তা আর ভুলত না। সেই দৃষ্টির আলোকে, যদিও সে তার বাবার আচরণে মাঝে মাঝে এমন কিছু জিনিস লক্ষ্য করত যা তার সংস্কার-মুক্ত স্বাধীন শিশু-চিত্ত ঠিক অনুমোদন ক'রে উঠতে পারত না, তবুও সে তখন পর্যন্ত তার বাবাকে শ্রদ্ধাই করত। শ্রদ্ধা করতে পারে এমন একটা মানুষ শিশুর যে একান্ত প্রয়োজন! এ যে তার আত্ম-প্রেমেরই বিচিত্র প্রকাশের আর এক রূপ! যখন কোন মানুষ উপলব্ধি করে যে, তার বাসনা চরিতার্থ করবার মতো অথবা তার গর্বকে তৃপ্ত করবার মতো শক্তি বা সামর্থ তার আর নেই, তখন সে যদি শিশু হয়, তা হলে সেই ব্যর্থ বাসনাকে সে তার বাবা-মার মধ্যে প্রতিফলিত ক'রে দেখতে চেষ্টা করে; যদি সে বাবা হয়, তাহলে পুত্রের মধ্যেই তার সার্থকতা খোঁজে। তখন বাবা হয়ে ওঠে ছেলের ঈপ্সিত আদর্শ, ছেলে হয় বাবার ব্যর্থ কামনার পরিপূর্তি। একের অভাব অপরের মধ্যে খোঁজে সার্থকতা। তখন নিজের সকল স্নেহ, প্রেম, গর্ব ও আত্মম্ভরিতা—অপরের হাতে নির্বিবাদে তুলে দিতে অন্তরে আনন্দই জাগে। তাই বাবার বিরুদ্ধে তার যা কিছু অভিযোগের কারণ থাকতে পারে, জাঁ-ক্রিস্‌তফ সে সমস্তই ভুলে যায়; বাবাকে ভালোবাসবার বা শ্রদ্ধা করবার কারণ খুঁজে বের করবার ব্যর্থ চেষ্টা আর করতে হয় না। বাবার সেই সমুন্নত দেহ, বলিষ্ঠ বাহু, কণ্ঠস্বর, অট্টহাস্য, উল্লাস, সব কিছুই তার কাছে গর্বের বস্তু হয়ে ওঠে; অল্পবিস্তর বাড়িয়ে মেলশিয়র নিজের প্রশংসায় নিজেই যখন পঞ্চমুখ হয়ে উঠত, জাঁ-ক্রিস্‌তফের ভাল লাগত, রীতিমত গর্বই অনুভব করত। বাবার সেই সব দম্ভ-উক্তিকে সে সত্য বলেই গ্রহণ করত এবং তার ঠাকুরদার কাছে যেসব প্রতিভাশালী পুরুষদের কাহিনী শুনেছিল, মনে মনে

সেই সব কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে সে স্পষ্ট বিশ্বাস করত, তার বাবাও সেই সব প্রতিভাধরদেরই একজন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, তখন প্রায় সাতটা বাজে, বাড়িতে সে একাই ছিল। বৃদ্ধ ঠাকুরদার সঙ্গে তার ভাইরা সব বেড়াতে বেরিয়েছে। মা পেছনে নদীতে কাপড় কাচতে গিয়েছে, হঠাৎ দরজা খুলে গেল, বাবা আবির্ভূত হলো। মাথায় টুপি নেই, চুল এলোমেলো। নাচের ভঙ্গীতে টলে পড়ে কোন রকমে দরজা পার হয়ে একটা চেয়ারে ধপাস্ ক'রে বসে পড়ল। পরিচিত ভাঁড়ামির একটা নতুন কিছু ব্যাপার মনে ক'রে জাঁ-ক্রিস্তফ হেসে উঠল, বাবার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে যখন ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হলো, তখন মুহূর্তে তার সব হাসি শূন্যে মিলিয়ে গেল। দেখল, চেয়ারের দু' দিক হতে মেলশিয়রের দু' হাত এমনভাবে ঝুলে পড়েছে, যেন তাতে জীবনের কোন স্পন্দন নেই ; সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু চোখে যেন কোন দৃষ্টিই নেই। সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠে হাঁ ক'রে আছে, মাঝে মাঝে তার ভেতর থেকে নিরর্থক হাসির একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ আসছে। স্থির প্রস্তর মূর্তির মতো জাঁ-ক্রিস্তফ সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমে মনে করেছিল, বুঝি এইভাবে তার বাবা নতুন কোন মজা দেখাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে যখন দেখল যে একচুলও বাবা নড়ছে না, তখন ভীত হয়ে পড়ল : 'বাবা, বাবা,' সে চিৎকার ক'রে ডেকে উঠল।

উত্তরে মেলশিয়র শুধু নীরবে মুরগীর মতো ঠোঁট নাড়তে লাগল। অসহায় আতঙ্কে জাঁ-ক্রিস্তফ বাবার দু' হাত ধরে যতদূর তার শক্তিতে কুলাল তাকে ধাক্কা দিয়ে নাড়াতে চেষ্টা করল।

'বাবা, বাবা, শোন, কথা বলো, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, কথা বলো!'

মেলশিয়রের দেহ কেঁপে নড়ে উঠল, যেন সর্বদেহের কোথাও হাড় নেই ; চেয়ার থেকে সোজা পড়ে যাবার মতো হলো। মাথাটা ক্রিস্তফের বুকের ওপর গিয়ে পড়ল ; ছেলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বিরক্তভাবে অসংবদ্ধ কি যেন বিড়বিড় ক'রে বলে উঠল। ছুটে ঘরের অন্য কোণে বিছানার ধারে গিয়ে ক্রিসতফ নতজানু হয়ে বিছানায় মুখ ঢেকে বসে পড়ল। বহুক্ষণ ধরে সেই অবস্থায় সে রইল। একবার মনে হলো, চেয়ার শুদ্ধ বাবা যেন নড়ে উঠল। দু' হাত দিয়ে জাঁ-ক্রিস্তফ নিজের দুই কান ঢেকে ফেলল, যাতে কোন শব্দ যেন তাকে শুনতে না হয়। তার ভেতর তখন কি যে হচ্ছিল তা সে নিজেই বুঝে উঠতে

পারছিল না। একটা তুমুল আলোড়ন, রাগ, ভয়, শোক, সব এক সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে···যেন, এইমাত্র কেউ মরে গিয়েছে···তার একান্ত প্রিয়, একান্ত শ্রদ্ধেয় যেন কেউ এই মাত্র মরে গেল!

আর কেউ নেই, বাইরে থেকে কেউ এলও না, শুধু তারা দু'জন। রাত্রি ঘন হয়ে আসে। যত মুহূর্ত চলে যায়, জাঁ ক্রিস্তফের ভয় ততই বাড়তে থাকে। না শুনে উপায় নেই, কিন্তু তার কানে যে কণ্ঠস্বর এসে পৌঁচোচ্ছে, সে-কণ্ঠস্বর যেন সে চিনতে পারছে না, তার রক্ত হিম হয়ে আসে। চারদিকের নিস্তব্ধতা যেন প্রত্যেকটি মুহূর্তকে আরো ভয়াল ক'রে তোলে। সেই অর্থহীন বিকৃত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঘড়ির কাঁটাটা যেন তাল দিয়ে চলেছে। আর সে সহ্য করতে পারে না, সম্ভব হলে সে উড়ে পালাতে চায়। কিন্তু পালাতে গেলে বাবার সামনে দিয়েই যেতে হবে, সেই চোখ দু'টি যদি তার চোখে পড়ে, সেই ভয়ে সে আরো আড়ষ্ট হয়ে যায়। যদি আবার সেই চোখের ওপর তার চোখ পড়ে, নিশ্চয়ই সে মরে যাবে। তাই মাথা নীচু ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে যাবার চেষ্টা করে। কোনরকমে নিঃশ্বাস আটকিয়ে শুধু মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অগ্রসর হয়, মেলশিয়রের দিক হতে সামান্য কিছু শব্দ এলেই থমকে থেমে যায়। টেবিলের তলা দিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে, বাবার একটা পা থর থর ক'রে কাঁপছে। বাবা উঠে দাঁড়াবার জন্যে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে; অবশেষে টেবিলের গায়ে পিঠ লাগিয়ে কোন রকমে উঠে বসে। চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে কোথায় এসেছে এবং ক্রমশঃ যেন বুঝতে পারে। দেখে সমানে জাঁ-ক্রিস্তফ কাঁদছে; তাকে কাছে ডাকে। জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হয় যেন সে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু এক-পাও নড়তে পারে না। কাছে আসবার জন্যে মেলশিয়র তাকে আবার ডাকে, কিন্তু যখন দেখে ছেলে তেমনি দূরে দাঁড়িয়ে আছে, রাগে ধমক দিয়ে ওঠে। বাধ্য হয়েই জাঁ-ক্রিস্তফ এগিয়ে আসে, সর্বশরীর তার কাঁপতে থাকে। মেলশিয়র তাকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের হাঁটুর ওপর বসাতে চেষ্টা করে। দু'হাতে দু'কান মর্দন ক'রে অবাধ্য পুত্রকে পিতৃ-ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। পরমুহূর্তেই অন্য কি এক চিন্তাধারা তাকে পেয়ে বসে, বালকের সঙ্গে নানারকম বাচালতা করতে শুরু করে, পরমুহূর্তেই আবার কি খেয়াল হয়, উচ্চকণ্ঠে ছেলেকে তার হাতের ওপর লাফিয়ে বসতে বলে। হেসে নিজেই লুটোপাটি খায়। তৎক্ষণাৎ আবার কি মনে ক'রে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ছেলের প্রতি, নিজের প্রতি করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। এমন আকুলভাবে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে যে, তার শ্বাস রুদ্ধ হবার মতো হয়, চুম্বনে

আর অশ্রুতে তাকে সিক্ত ক'রে তোলে, দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে দোলা দিতে দিতে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু ক'রে দেয়। ছুটে পালাবার কোন চেষ্টাই জাঁ-ক্রিস্‌তফ করল না, ভয়ে সে চলচ্ছক্তিহীন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাবার বুকে সেইভাবে নিষ্পেষিত হয়ে থাকতে থাকতে বাবার সুরাসিক্ত নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধে আর হেঁচকিতে ক্রমশঃ সে বিব্রত ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। একটা অব্যক্ত নিদারুণ অস্বস্তি তাকে মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে থাকে। মনে হয়, ডাক ছেড়ে সে কেঁদে ওঠে কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হয় না। কতক্ষণ যে সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে বন্দী হয়েছিল, তার কোন ধারণাই ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ ধরে সে এইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করছে…এমন সময় দরজা খুলে গেল হাতে এক গামলা কাচা কাপড়-জামা নিয়ে লুইসা প্রবেশ করল। সামনেই সেই দৃশ্য দেখে সে চিৎকার ক'রে উঠল, ছুটে জোর ক'রে জাঁ-ক্রিস্‌তফকে মেলশিয়রের কাছ হতে টেনে নিল এবং গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে মেলশিয়রের হাত মুচড়িয়ে দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল: 'মাতাল…অপদার্থ মাতাল… !' রাগে লুইসার দুই চোখ যেন অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে।

ক্রিস্‌তফের ভয় হলো, এবার বুঝি মেলশিয়র তার মাকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু স্ত্রীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে মেলশিয়র কোন প্রত্যুত্তরই করল না, উল্টে কাঁদতে শুরু করল। মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। সামনে যা কিছু পায়, তাতেই মাথা ঠোকে, আর কাঁদতে কাঁদতে বলে, লুইসা ঠিক কথাই বলেছে, সত্যিই সে অপদার্থ মাতাল, তারই জন্যে সংসারে এত দুঃখ দৈন্য, তারই জন্যে ছেলেপুলেরা পর্যন্ত নষ্ট হতে বসেছে, সবই সত্য, অতএব তার আর বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই। লুইসা রাগে ঘৃণায় স্বামীর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জাঁ-ক্রিস্‌তফকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর করে, আদর ক'রে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। সে তখনও কাঁপছিল, মা'র কোন কথারই সে উত্তর দিতে পারে না। সহসা সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তাড়াতাড়ি জল এনে মা তার চোখ-মুখ ধুয়ে দেয়। পরম স্নেহে তাকে চুম্বন করতে করতে কত না আদর জানায়, অবশেষে ছেলের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও কাঁদতে থাকে। তার পর একসময় মা ও ছেলে, দু'জনেই শান্ত হয়ে যায়। লুইসা নতজানু হ'য়ে বসে, জাঁ-ক্রিস্‌তফকেও তার পাশে সেইভাবে বসায়। তার পর অশ্রুসজল কণ্ঠে প্রার্থনা করে: 'ওগো ভগবান্, এই কু-অভ্যাস হতে ওঁকে মুক্ত করো…ও যেমন ভাল লোক, তেমনি ভাল লোক হয়েই যেন থাকে।' তার পর ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ক্রিস্‌তফ মা'র হাত ধরে

থাকে, অনুরোধ করে মা যেন তেমনিভাবে তার বিছানার পাশে বসে থাকে। ছেলের অনুরোধে মা তেমনিভাবে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার শয্যাপার্শ্বে নীরবে বসে থাকে। হঠাৎ ছেলের গায়ের স্পর্শে লুইসা বুঝতে পারে, ঈষৎ জ্বরভাব হয়েছে। মাতাল স্বামী মেঝেতে পড়ে তখন নাক ডাকতে থাকে।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরে, একদিন স্কুলে তখন ক্লাস চলছিল, জাঁ-ক্রিস্তফ একমনে ঘরের দেয়ালে মাছিদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল আর তারই ফাঁকে ফাঁকে সহপাঠীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করছিল, যাতে তারা বসবার টুল থেকে পড়ে যায়। জাঁ-ক্রিস্তফের এই দুষ্টুমি আর চঞ্চলতার দরুন ক্লাসের শিক্ষক তাকে দেখতে পারত না, বিশেষ ক'রে ক্লাসের পড়াশোনায় তার তেমন আগ্রহও ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইদিন জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেই টুল হতে পড়ে গেল। সেই ব্যাপার উপলক্ষ ক'রে মাষ্টার মশাই জাঁ-ক্রিস্তফকে একজাতীয় বাজে লোকের সঙ্গে তুলনা ক'রে একটা গল্প বললেন। সেই গল্প শুনে তার সহপাঠীরা হেসে উঠল এবং তাকে ক্ষেপাতে শুরু করল। জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেকে আর সামলাতে পারল না, সামনের ডেস্ক থেকে কালির দোয়াতটা তুলে নিয়ে সজোরে সামনে যে ছেলেটি তাকে দেখে হাসছিল, তাকে ছুঁড়ে মারল। ক্লাসের মাষ্টার মশাই রেগে উঠে জাঁ-ক্রিস্তফকে রীতিমত প্রহার করলেন। প্রহারের পর তাকে ক্লাসের সামনে "নীলডাউন" ক'রে রাখলেন, অধিকন্তু শাস্তিস্বরূপ একটা অতি কঠিন "টাস্কের" ভার দিলেন।

একটা কথাও না বলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিবর্ণ মুখে সে বাড়িতে ফিরল। বাড়িতে ফিরে সে শান্তভাবেই ঘোষণা করল, আর সে স্কুলে যাবে না। কিন্তু সে কথা বাড়িতে কেউই কানে তুলল না। পরের দিন সকাল বেলা, যখন লুইসা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এল যে স্কুলে যাবার সময় হয়ে এল, তখন সে অবিচলিত ভাবেই মাকে জানিয়ে দিল, সে-তো বলেছে, স্কুলে আর সে যাবে না। বৃথাই লুইসা অনুনয় করল, ধমক দিল, ভয় দেখাল। কোন ফলই হলো না। ঘরের এক কোণে স্থির হয়ে বসে থাকে, অটল, অচল। মেলশিয়র রেগে গিয়ে রীতিমত প্রহার করল ছেলেকে। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। প্রত্যেক প্রহারের পর, যখনই তাকে উঠে স্কুলে যাবার জন্যে আদেশ করা হয়, তখুনি সে চিৎকার ক'রে ওঠে: 'না, না!' অবশেষে কৈফিয়ত তলব করা হলো কেন সে স্কুলে যাবে না, অন্ততঃ তাও তো সে বলবে! দাঁতে দাঁত দিয়ে তবুও সে চুপ ক'রে বসে রইল। অবশেষে মেলশিয়র তাকে টেনে নিয়ে স্কুলে একেবারে মাষ্টার মশাইর হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়ে এল। ক্লাসে নির্দিষ্ট টুলের ওপর জোর ক'রে তাকে বসিয়ে দেওয়া

হলো; হাতের কাছে সে যা কিছু পেল, দোয়াত, কলম সবকিছু ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল! মাষ্টার মশাইর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে প্রকাশভাবে খাতা, বই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে দিল। এবার মাষ্টার মশাইও ক্ষেপে উঠলেন। একটা অন্ধকার ঘরে তাকে আটক ক'রে রাখা হলো। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঁকি দিয়ে দেখেন, পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে দু'হাতে সজোরে টানছে। শ্বাস রোধ ক'রে সে আত্মহত্যা করবে।

বাধ্য হয়েই তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

অসুখ-বিসুখের কোন বালাই জাঁ ক্রিস্তফের ছিল না। পিতা এবং পিতামহের কাছ থেকে সে উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের দৈহিক বলিষ্ঠতা ও স্বাচ্ছন্দ্য পুরোপুরি পেয়েছিল। এ বংশে মোমের পুতুল কেউই নয়, দেহ সুস্থ না অসুস্থ তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। বাবা কিংবা ঠাকুরদাদা কোনদিনই দৈহিক কারণে তাদের অভ্যস্ত দৈনন্দিন জীবন-ধারার কোন পরিবর্তনই করত না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তাতে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হতো না; গ্রীষ্মে বা শীতে সমানভাবেই বাইরে ঘুরে বেড়াতো; অবিশ্রান্ত ধারা-জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, খালি মাথা, খোলা বুকে, নির্বিকারচিত্তে তারা বাইরে ঘুরে বেড়াতো; কখনও বা এমনি বাহাদুরি দেখাতে অথবা এমনি অন্যমনস্ক ভাবে, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করত, কিন্তু তার জন্য বিন্দুমাত্র ক্লান্ত বোধ করত না। বাবা ও ঠাকুরদাদা দু'জনেই সেইজন্য বেচারা লুইসাকে করুণার চোখেই দেখত। এই জাতীয় দৈহিক কষ্ট হয়তো মুখ বুঁজে লুইসাকেও সহ্য করতে হতো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে আর পারত না। মুখ বিবর্ণ হয়ে আসত, পা ফুলে যেত, বুকের ভেতর স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠত। জাঁ-ক্রিস্তফও মার এই নীরব যাতনার কথা বুঝত না, কারণ দৈহিক অসুস্থতা যে কি, সে-বোধ তো তারও ছিল না। কোন কারণে পড়ে গেলে, বা আহত হলে, বা কোন কিছুতে হাত-পা কেটে বা পুড়ে গেলে, সে কাঁদত না; যে বস্তুর দরুন তার এই দুর্দশা, শুধু তারই ওপর সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত। বাবার নির্মমতা, খেলার সঙ্গী অথবা পথের দুষ্টু ছেলেদের দুর্ব্যবহার, তাকে আরো কঠিন করেই তুলেছিল। আঘাত দিতে বা গ্রহণ করতে এতটুকু ভয় সে করত না, প্রায়ই যখন বাড়ি ফিরত, দেখা যেত হয় নাক ফেটে রক্ত ঝরছে, না হয় কপাল কেটে গিয়েছে। একবার পথে মারামারি করবার সময়, তার বিপক্ষ সজোরে তার মাথাকে পাথরের সঙ্গে যখন ঠুকছিল, তখন নিঃশ্বাস রোধ ক'রে সে তাকে উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে, জোর ক'রে তাকে টেনে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছিল।

তার সঙ্গে লোকে যে ব্যবহার করবে, প্রত্যুত্তরে সেও তার সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের ব্যবহারই করবে, এটাই ছিল তার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু, বিচিত্র ব্যাপার, সমস্ত বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও, অনেক জিনিসেই কিন্তু তার ভয় করত, অবশ্য লোকের কাছে তা প্রকাশ করতে গর্বে বাধত। কেউ জানত না বটে, কিন্তু তার শৈশবে একটা সময় এমন গিয়েছে যখন সেই সব সংগোপন আতঙ্কের চেয়ে পীড়াদায়ক তার কাছে আর কিছুই ছিল না। প্রায় দু' তিন বছর ধরে গোপন ব্যাধির মতো এই আতঙ্ক ভেতরে ভেতরে তাকে তীব্রভাবে জর্জরিত করেছে।

অন্ধকারে নাম-না-জানা রহস্যময় একটা-কি-যেন ঘুরে বেড়ায়, ওৎ পেতে থাকে অতর্কিতে তাকে বধ করবার জন্যে। প্রত্যেক শিশুর অন্তরের কোণে নামহীন সেই ভয়াবহ দৈত্য মহা-আতঙ্কের প্রতিমূর্তির মতো লুকিয়ে থাকে। যে-কোন বিচিত্র জিনিস তার চোখে পড়ে, তার প্রত্যেকটির আড়ালে যেন সে লুকিয়ে থাকে। শিশুর অন্তরের এই সংগোপন আতঙ্ক হয়তো কোন মৃত অতীতের জন্মান্তরের স্মৃতি, হয়তো বা যেদিন মাতৃ-গর্ভের ভয়াবহ নিদ্রা থেকে প্রথম জেগে উঠে পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলে মানব-শিশু চারদিকে যেসব অপরিচিত দৃশ্যের বিভীষিকা দেখে, এ হলো সেই জীবনের প্রথম মৌন আতঙ্কেরই পুনরাবৃত্তি।

তাদের বাড়ির ওপরের তলায় ছোট্ট একটা গুদাম ঘরের মতো ঘর ছিল। সেই ঘরের দরজাটা জাঁ-ক্রিস্তফের কাছে রীতিমত একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। দরজাটা খুললেই সামনে সিঁড়ি পড়ত, সর্বদাই তার মনে হতো দরজাটা কে যেন আধখানা খুলে রেখেছে। সেখান দিয়ে যাবার সময় তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠত, চোখ বন্ধ ক'রে লাফিয়ে পার হয়ে যাবার চেষ্টা করত। তার মনে হতো সেই আধ-ভেজান দরজার আড়ালে কে যেন লুকিয়ে আছে। দরজাটি যখন বন্ধ থাকত, সে স্পষ্ট শুনতে পেত দরজার ওধারে কি যেন নড়ছে। অবশ্য অসম্ভব কিছু নয়, কারণ ঘরটার মধ্যে ছিল বড় বড় সব ইঁদুরের বাসা। কিন্তু সে ভাল করেই জানত যে দরজার ওদিকে অন্ধকারে যে প্রাণীটি নড়ছে, সে ইঁদুর নয়, নিশ্চয়ই সেই ভয়াবহ দৈত্য, চলতে গেলে তার হাড়ে হাড়ে শব্দ হয়, ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো তার দেহ হতে মাংস ঝুলে আছে, ঘোড়ার মতো মাথা, গোল গোল জলন্ত দু'টি চোখ, এলোমেলো চেহারা। জাঁ-ক্রিস্তফ প্রাণপণ চেষ্টা করত, যাতে তার কথা মনে ভাবতে না হয়, কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে আরো বেশী

তার কথা মনে পড়ত। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দেখত, দরজাতে খিল লাগানো হয়েছে কি না, সুনিশ্চিত হয়ে তবে পেছন ফিরত। কিন্তু পুরোপুরি সুনিশ্চিত হবার জন্যে অন্ততঃ দশবার তাকে ফিরে ফিরে দেখে আসতে হতো।

রাত্রিতে বাড়ির বাইরে তার ভয় করত। কোন কোন দিন ঠাকুরদার ওখানে দেরী হয়ে যেত কিংবা বাড়ির কোন কাজে সন্ধ্যার পর তাকে ঠাকুরদার ওখানে যেতে হতো। শহরের একটু বাইরে, কলোন রোডের শেষ বাড়িতে বৃদ্ধ ক্রাফট বাস করতেন। সেই বাড়ি আর শহরের প্রথম আলোকিত বাতায়নের মধ্যে অনুমান প্রায় তিনশো গজ ব্যবধান ছিল, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হতো সে-ব্যবধান যেন তিন হাজার গজেরও বেশী হবে। মাঝে মাঝে পথ হঠাৎ বেঁকে যেত, তখন সামনে কিছুই আর দেখা যেত না। সন্ধ্যার পর পথঘাট নির্জন হয়ে যেত, চোখের সামনে সমস্ত মাটি কালো হয়ে আসত, মাথার ওপরে আকাশ ঘন মসীবর্ণ। পথের দু'ধারে যেসব ঝোপ ছিল, তা পার হয়ে যখন খাড়াই পথের ওপর এসে পড়ত, তখনও পর্যন্ত সমানে তাকিয়ে দেখত, দূর দিগন্ত-রেখায় শুধু ক্ষীণ হলদে রঙের একটা আভা দেখা যাচ্ছে মাত্র, কিন্তু কোন আলো তা থেকে আসছে না, রাত্রির অন্ধকারের চেয়ে তা যেন আরো বেশী বিভ্রান্তিকর। দূর-দিগন্তে সেই আলোর আভাসটুকু শুধু অন্ধকারকে আরো নিবিড় ক'রে তোলে, আলো নয় যেন আলোর প্রেতাত্মা। মাথার ওপরে আকাশ থেকে মেঘগুলো যেন মাটির দিকে সহসা ঝু'লে আসত…দু'ধারে ঝোপ-ঝাড় মনে হতো যেন অন্ধকারে সহসা শতগুণ বেড়ে উঠেছে…সঙ্গে সঙ্গে যেন তারাও চলেছে। কোথাও বৃহৎ কোন বিটপী বিচিত্রমূর্তি বৃদ্ধের মতো গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্তিতে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত চলতে আরম্ভ করে, মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও যেন দ্রুততর হয়ে তার পিছু পিছু এগিয়ে আসছে। পথের পাশে নালার ভেতর বামন-দেহ দৈত্যরা অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে, ঘাসের মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু কিসের যেন আলো জ্বলছে, বাতাসে কারা যেন উড়ে যাচ্ছে, কোথা থেকে পতঙ্গের দল কর্কশ চিৎকার ক'রে উঠল। সর্বক্ষণ একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্ক তাকে অভিভূত ক'রে রাখে, যেন এক্ষুণি প্রকৃতির কোন বিচিত্র খেয়াল তার সামনে বীভৎস মূর্তি ধরে এসে দাঁড়াবে। বুকের ভেতর স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে, সে ছুটতে আরম্ভ করে।

যতক্ষণ না ঠাকুরদার বাড়ির ভেতরের আলো তার চোখে পড়ত, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থির হতে পারত না। কিন্তু সকলের চেয়ে বিপদ হতো, যেদিন এসে

দেখত বৃদ্ধ বাড়ি নেই। এর অপেক্ষা ভয়াবহ অবস্থা তার কাছে আর কিছুই ছিল না। এমনি দিনের বেলায় শূন্য মাঠের মাঝখানে হারিয়ে-যাওয়া সেই সুপ্রাচীন ভগ্ন বাড়িটার ভেতর একলা থাকতে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠত। ঠাকুরদা থাকলে অবশ্য তার ভয় করতো না। কিন্তু বৃদ্ধ মাঝে মাঝে তাকে একলা রেখে কিছু না বলেই বাইরে চলে যেতেন। তখনই হতো আসল বিপদ। না হলে সেই বাড়িটার সব কিছুর সঙ্গেই তো তার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। ঘরের সব কিছুই তার পরিচিত, অন্তরঙ্গ, বন্ধু। কাঠের তৈরি শাদা মস্ত বড় একটা খাট, খাটের পাশে ছোট্ট শেলফের ওপর বড় সাইজের একখানা বাইবেল, তার পাশে একটা ফ্রেমের ওপর একরাশ কাগজের ফুল, সেই ফ্রেমের সঙ্গে আঁটা খানকতক ফটোগ্রাফ, বৃদ্ধের দুই পত্নী আর এগারোটি সন্তানের ছবি, ছেলেমেয়েদের ফটোর নীচে প্রত্যেকের জন্ম আর মৃত্যুর তারিখ বৃদ্ধের নিজের হাতে লেখা. দেয়ালের গায় মোজার্ট আর বিটোফেনের রঙীন ছবি, সেই সঙ্গে তাঁদের কোন কোন সঙ্গীত-রচনা ছবির মতো ফ্রেমে আঁটা—এ সমস্তই ছিল তার পরিচিত বন্ধুর মতো। এক কোণে একটা ছোট্ট পিয়ানো, আর এক কোণে বেহালার মতো একটা বৃহৎ সাইজের তন্ত্রী ; ঘরের মধ্যে স্তূপাকারে ইতস্ততঃ ছড়ানো বই, পাইপ, জানালায় চন্দ্রমল্লিকার ঝুরি জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হতো সে যেন চারদিকে বন্ধুবেষ্টিত হয়ে আছে। হয়তো পাশের ঘর থেকে শোনা যেত, বৃদ্ধ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছেন, আপনার মনে কি সব মতলব ভাঁজছেন, নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছেন, কখনও বা মূর্খ বলে নিজেকেই নিজে গালাগাল দিয়ে উঠছেন, কখনও বা বেশ গলা ছেড়ে গেয়ে উঠছেন, 'মিশ্র' রাগে বা দরদী কণ্ঠে পুরনো ধরনের কোন জার্মান প্রেমসঙ্গীত, অথবা মার্চের সুরে মুখে মুখে সঙ্গীত রচনা করবার কসরৎ করছেন। নিরাপদ আশ্রয়, নিশ্চিত অবকাশ। জাঁ-ক্রিস্তফ জানালার কাছে সুবৃহৎ আরাম-কেদারার মধ্যে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে একটা বই নিয়ে ছবি দেখতে বসত, ছবির মধ্যে তন্ময় হয়ে যেত। বাইরে ক্রমশঃ দিবা অবসান হয়ে আসত, দুই চোখের পাতা ভারী ভারী হতো, বই থেকে চোখ তুলে নিয়ে আপনার মনের আবছা সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করতো। সামনের পথ দিয়ে ভারী গাড়ির চাকা শব্দ করতে করতে চলে যেত, পথের ওপারে হয়তো তখনও পর্যন্ত একটা গরু চরে বেড়ায় , শহরের গির্জা থেকে সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে আসে, শান্ত তন্দ্রাতুর। স্বপ্ন-দেখা শিশুর মনে ছায়া-ছায়া কিসব বাসনা, অনাগত সুখের অস্পষ্ট পূর্বাভাস খেলা করে বেড়ায়।

সহসা সেই স্বপ্নের খেলা থেকে জাঁ-ক্রিস্তফ জেগে ওঠে, কি এক অজানা

বেদনায় ভেতরটা ভার ভার লাগে। চোখ তুলে চেয়ে দেখে···রাত্রি! কান পেতে শোনে···নীরবতা! বৃদ্ধ হয়তো ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। ভয়ে কেঁপে ওঠে বালক। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বৃদ্ধকে দেখবার চেষ্টা করে। পথ নির্জন, শূন্য। সে-শূন্য অন্ধকারে সহসা সব কিছু যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে। দোহাই ভগবান! সেটা যেন এই সময় না এসে পড়ে! কে সে? তা সে বলতে পারে না। শুধু জানে, সে ভয়ঙ্কর। দরজাগুলো হয়তো ভাল ক'রে বন্ধ করা হয় নি! কাঠের সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ! বালক লাফিয়ে উঠল, আরাম-কেদারাটা, দু'খানা চেয়ার আর-একটা ছোট টেবিল, টেনে এক সঙ্গে জড় ক'রে ঘরের কোণে নিয়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য সেগুলো পরপর সাজাল···আরাম-কেদারাটা একেবারে দেওয়ালের গায়ে লাগাল, তার ডান ধারে একখানা চেয়ার আর বাঁ ধারে আর-একখানা চেয়ার, টেবিলটা রাখে তার সামনে। মাঝখানে এক জোড়া চৌকি রেখে তার ওপর তার হাতের বইখানা এবং আরো কিছু কিছু বই উঁচু ক'রে সাজিয়ে রাখল। এইভাবে সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা ক'রে সে এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারল, তার ধারণায়, কোন শত্রুই সেই ব্যূহ ভেদ ক'রে তার কাছে আসতে পারবে না, অন্ততঃ আসা অত সহজ হবে না।

কিন্তু হায়! সে শত্রু সামনের বই-এর ভিতর থেকেই হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়! বৃদ্ধ যেসব পুরনো বই সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে দু'একখানাতে এমন সব ছবি ছিল, যা বালকের মনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত, ভালও লাগত, আবার ভয়ও করত। সাধু এণ্টনির প্রলোভনের বিচিত্র উদ্ভট আর ভয়ঙ্কর সব ছবি তাতে ছিল। কোন কোন ছবিতে দেখা যেত বোতলের ভেতর পাখীর কঙ্কাল রয়েছে, কোনটাতে ব্যাঙের পেট ফেটে গিয়ে কৃমির মতন হাজার হাজার ডিম কিলবিল করছে, কোন ছবিতে শুধু একটা বৃহৎ মাথা পায়ে হেঁটে চলেছে, কোনটিতে গাধারা ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে, কোন কোন ছবিতে ঘটি-বাটি-বাসন-পত্র রীতিমত পোষাক-পরিচ্ছদ পরে কিম্ভূতকিমাকার বৃদ্ধ মহিলার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই ছবি দেখে জাঁ-ক্রিস্তফের রীতিমত ভয় করত, কিন্তু হাতের কাছে কোন কিছু করবার উপায় না থাকায়, বারবার সেই সব ছবিগুলিই খুলে খুলে দেখত। অনেকক্ষণ ধরে সেই সব ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ সে মাথা তুলে ঘাড় বাঁকিয়ে লুকিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখত যদি সেই সব উদ্ভট মূর্তি আজ এই মুহূর্তে সজীব হয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়! মনে হতো পর্দার ফাঁকের মধ্যে কি যেন নড়ে উঠল। একটা ডাক্তারী

বই-এর ভিতর মানুষের চামড়া-ছাড়ানো একটা কঙ্কালের ছবি ছিল, সেই ছবিটিই সব চেয়ে বেশী ভয় উদ্রেক করতো, এবং তার কারণও ছিল। বই-এর পাতা উল্টোতে উল্টোতে যখন সেই ছবির পাতার কাছে আসত, তখন আপনা থেকে তার কাঁপন সুরু হয়ে যেত। যেন তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই চিত্রকর সেই রক্তমাংসহীন বীভৎসতাকে এঁকেছিল। প্রত্যেক শিশুর অন্তরে যে সৃজনী-শক্তি থাকে, তার সাহায্যে জাঁ-ক্রিস্তফ সেই সব ছবির ক্ষুদ্র পরিসরকে বৃহৎ ক'রে গড়ে নেয়। তার অন্তর কল্পনায় আর বাস্তবতায় এক হয়ে যায়। কোন কোন দিন এই সব ছবির স্মৃতি তাকে এমন ক'রে পেয়ে বসে যে, তার রাত্রির স্বপ্নে দিনের দেখা অন্য সব জীবন্ত জিনিসগুলোর চেয়ে এইসব বীভৎস অবাস্তবতাই অনেক বেশী স্থান জুড়ে থাকত। ফলে, ঘুমোতে তার ভয় করতো। মাসের পর মাস, তার রাত্রির নিদ্রা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে কণ্টকিত হয়ে থাকত। ভাঁড়ার ঘরে পায়চারি করতে করতে তার মনে হতো, নর্দমার ভেতর দিয়ে হয়তো সেই চর্মহীন কঙ্কালটি এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে। ঘরে একলা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে যেন শুনতে পায়, বারাণ্ডা দিয়ে কারা যেন সব চলে গেল, তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে উঠে দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতো, দরজা বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে হাতলের দিকে হাত বাড়াতো, কিন্তু বাইরের দিক থেকে হয়তো চাবি দেওয়া থাকতো, শত চেষ্টা ক'রেও আর হাতল ঘুরোতে পারত না, অসহায়ভাবে সাহায্যের জন্য চিৎকার ক'রে উঠত। বাড়ির সকলের মধ্যে একসঙ্গে বসে আছে, হঠাৎ তার মনে হলো তাদের সকলের মুখের চেহারা যেন বদলে গিয়েছে, যেন তারা উল্টো ধরনে ওঠা বসা করছে। হয়তো চুপটি ক'রে একমনে পড়ছে, মনে হলো কে একজন লোক অদৃশ্যভাবে তার চারদিকে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে; ফলে সেখানে থেকে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু মনে হয়, তার পা কে যেন বেঁধে রেখেছে। কেঁদে উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকে, কে যেন বিশ্রীভাবে সমস্ত কণ্ঠটাকে চেপে ধরে আছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, মনে হয় যেন আর একটু হলেই দম বন্ধ হয়ে যেত, জেগে উঠবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত কাঁপতে থাকে, সেই যন্ত্রণার হাত থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

যে-ঘরে সে ঘুমোত, সেটাকে ঘর না বলে একটা গর্ত বললেই ঠিক হয়, দরজা-জানলা কিছুই ছিল না তার। তার বাবা ও মা যে-ঘরে শুতো, সে-ঘর থেকে একটা পর্দা ঝুলিয়ে তার এই গর্তটি আলাদা করা হয়েছিল। বন্ধ ঘরের পুরু ঘন বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসত। তার ছোট ভাই, তার সঙ্গে এক বিছানাতেই শুতো, প্রয়োজন

হলেই ঘুমের মধ্যে তাকে লাথি ছুঁড়ে মারত। মাথার ভেতর মাঝে মাঝে কেমন যেন জ্বালা করত, দিনের বেলা যেসব ছোটখাটো অসুবিধা তাকে ভোগ করতে হতো, রাত্রিবেলা তারা যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন ক'রে থাকত, এবং প্রতিদিন এই একই যন্ত্রণা নিয়মিতভাবে তাকে ভোগ করতে হতো। এই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে তার স্নায়ু এতখানি উত্তেজিত হয়ে থাকতো যে, সে ভুল বকতে আরম্ভ করতো এবং তখন একটুখানি কিছু ব্যাঘাত ঘটলেই ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক মনে হতো। তক্তপোষে সামান্য শব্দ হলেই সে ভয়ে চমকিয়ে উঠত। বাবার নাক ডাকার শব্দ হাজারগুণ তীব্র হয়ে তার কানে লাগতো, মনে হতো রাক্ষুসে আওয়াজ, সেই সুপ্ত দেহের ভেতর হতে যেন কোন দৈত্য গর্জন করছে। ত্রিযামা রাত্রির সুদীর্ঘ অন্ধকার যেন তার বুকে চেপে বসত, মনে হতো যেন সে-অন্ধকার অনাদিকাল থেকেই এমনি রয়েছে, এমনিই থাকবে; যেন মাসের পর মাস সে সেই অন্ধকারে শুয়ে আছে। জোর ক'রে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করতো, বিছানা থেকে দেহকে খানিকটা তুলে উঠে বসতো, জামার হাতা দিয়া ঘর্মাক্ত মুখ মুছে নিত। কখনও বা হাতের ধাক্কায় ছোটভাই রুডলফকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতো, কিন্তু নিদ্রার মধ্যে উত্যক্ত হয়ে রুডলফ সমস্ত চাদরটা তার দিকে টেনে নিয়ে একটু সরে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ত।

ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রণায় সে বিছানায় জেগে অপেক্ষা ক'রে থাকত, কখন পর্দার নীচে প্রভাতী-আলোর প্রথম ক্ষীণ আভা এসে দেখা দেয়। অদূরাগত উষার ম্লান আলোর কম্পনের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা তার মনের শান্তি ফিরে আসত। সে স্পষ্ট অনুভব করত, পাশের ঘরের জানালার ভেতর দিয়ে উষার আলো একটু একটু ক'রে প্রবেশ করছে, যদিও তখনও পর্যন্ত ঘরের মধ্যে কোন কিছু স্পষ্ট ক'রে দেখা যেত না। আলোর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাত্রির বিকার বন্ধ হয়ে যেত, স্নায়ুতে রক্তের ধারা আবার শান্ত শীতল হয়ে আসত, বন্যা-উপপ্লুত নদী আবার তার স্বাভাবিক ধারায় প্রত্যাবর্তন করত; সারা দেহ এক স্নিগ্ধ উত্তাপের স্পর্শে সচকিত হয়ে উঠত, রাত্রির নিদ্রাহীনতার দরুন চোখ তখনও জ্বালা করতে থাকলেও, আপনা থেকে তা সুখে বুঁজে আসত।

তাই সন্ধ্যা হলেই সে আপনা হতে সজাগ হয়ে উঠত, নিদ্রার লগ্ন যতই এগিয়ে আসত, ততই তার শঙ্কা বাড়তে থাকত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, কিছুতেই সে আর দুঃস্বপ্নের হাতে নিজেকে সঁপে দেবে না, সারা রাত্রি তার অপেক্ষায় যদি জেগে থাকতে হয়, সে জেগেই থাকবে, কোন অসর্তক মুহূর্তে তার মনে তাদের

প্রবেশ করতে দেবে না। কিন্তু শোবার পর বেশীক্ষণ আর সে জেগে থাকতে পারে না, কখন্ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সেই অবসরে আবার একে একে ফিরে আসে সেই সব কায়াহীন ভয়ঙ্করের দল···

রাত্রি! অধিকাংশ শিশুর কাছেই অতি-বাঞ্ছিত, মনোরম···কারুর কারুর কাছে ভয়ঙ্করী, বিভীষিকাময়ী!···ঘুমোতে তার ভয় করে। জেগে থাকলেও নিস্তার নেই। ঘুমন্ত কি জাগ্রত, দেখতে দেখতে কোথা হতে ভয়ঙ্করমূর্তি প্রেত-চরেরা তাকে ঘিরে একে একে জমা হতে থাকে, তারই মস্তিষ্কের সৃষ্ট সব প্রেতমূর্তি···শৈশবের আধ আলো আধ-ছায়া চেতনার অস্পষ্ট-লোক ভয়ের জীবাণুতে ভরে ওঠে।

কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই একদা এই সব কল্পিত ভয়ের ছায়ামূর্তি নিশ্চিহ্নে মিলিয়ে যাবে, তার জায়গায় জেগে উঠবে সেই মহা-ভয়, প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই অটল অধিষ্ঠিত যার আসন, যাকে ভুলবার জন্যে, যাকে ভুলে থাকবার জন্যে মানুষের জ্ঞানের কত না ব্যর্থপ্রয়াস···মৃত্যু যার নাম।

একদিন আলমারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে, জাঁ ক্রিস্তফের নজরে পড়ল, একটা খুব ছোট ফ্রক, আর একটা ডোরা কাটা বনেট। সেই অপ্রত্যাশিত সন্ধানে উল্লসিত হয়ে লুইসার কাছে সেই দুইটি জিনিস সে যখন উপস্থিত করল, দেখল, জননী খুশি হওয়া দূরে থাক্, উল্টে মুখ ভার ক'রে যেখানকার জিনিস সেখানে অবিলম্বে রেখে আসবার জন্যে বলল। জাঁ-ক্রিস্তফ কিন্তু মা'র এই আদেশের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ইতস্ততঃ করতে লাগল এবং কেন এই আদেশ করা হ'লো, তা জানতে চাইল। জননী বিরক্ত হয়ে কোন উত্তর না দিয়ে তার হাত থেকে জিনিস দু'টি টেনে কেড়ে নিয়ে সেল্‌ফের উঁচু থাকে রেখে দিল, যাতে জাঁ-ক্রিস্তফ তার নাগাল না পায়। জাঁ-ক্রিসতফের কৌতূহল বেড়েই উঠল, মাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্যক্ত ক'রে তুলল। অবশেষে লুইসা জানাতে বাধ্য হলো, তার জন্মের আগে তার একটি ভাই জন্মেছিল, এবং তার আসবার আগেই সে মরে গিয়েছে। জাঁ-ক্রিস্তফ অবাক হয়ে গেল,—তার কথা তো সে কারও মুখে আজ পর্যন্তও শোনে নি! কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মা'র কাছ থেকে এ বিষয়ে আরো কিছু খবর জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। দেখল, তার প্রশ্নে মা যেন আরো বিব্রত ব্যাকুল হয়ে উঠল, দুঃখ বিজড়িত কণ্ঠে মা শুধু কোন মতে এটুকুই বলতে পারলেন যে তার নামও জাঁ-ক্রিস্তফ ছিল, তবে সে-শিশু নাকি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছেলে। তার অপেক্ষাও ঢের বেশী বুদ্ধিমান। জাঁ-ক্রিস্তফ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু মা সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকুই বললেন, সে এখন স্বর্গে আছে এবং

সেখান থেকে তাদের সকলের জন্যে সে প্রার্থনা করছে। এর বেশী কিছু আর ক্রিস্তফ মা'র কাছ থেকে আদায় করতে পারল না। এর পর লুইসা ধমক দিয়ে উঠল : 'থাম, বাজে আর বকতে হবে না, কাজ করতে দে আমাকে!' এতক্ষনে লুইসা সেলাই করছিল, কিন্তু জাঁ ক্রিস্তফের মনে হলো, মা যেন মনে মনে কি ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে মা চোখ তুলে চেয়ে দেখল, জাঁ ক্রিস্তফ কোথায় কি করছে, দেখল, এক কোণে সে বসে আপনার মনে কি যেন ভাবছে। মা হেসে তাকে বললে : 'যা, বাইরে গিয়ে খেলা করগে যা—'

এই একটুখানি কথাবার্তা ক্রিস্তফের মনে কিন্তু গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করল। তার আগে এই বাড়িতে আর একটি শিশু এসেছিল, তারই মতো সে-ও লুইসাকে মা বলত, তারই মতো তারও নাম ছিল জাঁ ক্রিস্তফ, ঠিক তারই মতো আর-একজন···এখন সে নেই, সে মরে গিয়েছে! মরে গিয়েছে, কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য সে বুঝে উঠতে পারে না, শুধু এইটুকু বোঝে, মরে যাওয়া একটা রীতিমত ভয়ঙ্কর কিছু ব্যাপার। ক্রিস্তফ আরো অবাক হয়ে যায়, যখন ভাবে সেই শিশুটির সম্বন্ধে তারা কেউই তো কোন কথা বলে না; তার কথা সকলে ভুলেই গিয়েছে, একেবারেই ভুলে গিয়েছে। যদি সে মরে যায়, তা হলে এমনিভাবে তাকেও তো সকলে ভুলে যাবে! সারাদিন এই এক ভাবনা তার মনকে ভরে রাখল, সন্ধ্যে-বেলায় খাবার টেবিলে যখন সকলে বসে এটা-ওটা নিয়ে কথা বলছে, তখনও পর্যন্ত ক্রিস্তফ নিজের মনে মনে সেই একই কথা ভাবছে। তা হলে সে চলে গেলে তারা এমনিভাবেই হাসবে, খাবে, আনন্দ করবে? সে কি ক'রে বিশ্বাস করবে, তার মা এতদূরে স্বার্থপর যে, সে মরে গেলেও মা এমনি হাসবে! ভাবতে ভাবতে তার কান্না পেয়ে যায়। নিজের জন্যে যেন নিজেই খানিকটা কাঁদে···সেই সঙ্গে তার মনে একরাশ প্রশ্ন মাথা উঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। মনে পড়ে যায়, কি কঠিনভাবেই না মা তাকে এই সব প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিল! কিন্তু একদিন সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। রাত্তিরে ঘুমোবার জন্যে বিছানায় শুয়েছে, মা স্নেহ চুম্বন দেবার জন্যে এসেছে, সহসা সে প্রশ্ন করল : 'মা, সে কি এই বিছানাতেই শুতো?'

বেচারা লুইসা সেই অকস্মাৎ প্রশ্নে কেঁপে ওঠে। চেষ্টা ক'রে উদাসীন কণ্ঠে বলে : 'কে?'

জাঁ-ক্রিস্তফ চুপি চুপি উত্তর দেয় : 'সেই যে ছোট্ট ছেলেটা তোমার, যে মরে গিয়েছে!'

জননী দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে, বলে : 'চুপ, চুপ !…ঘুমো !'

লুইসার কণ্ঠস্বর কান্নায় কাঁপছিল। ক্রিস্তফের মাথা মা'র বক্ষলগ্ন, সে শুনতে পাচ্ছিল, মা'র বুকের ভেতর কি দ্রুত স্পন্দন চলছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর মা বলে : 'তার কথা আর কোনদিন মুখে আনিস্ না, বুঝলি…ঘুমো সোনা মানিক আমার !…না রে, এ বিছানায় সে শুতো না !'

লুইসা পুত্রকে চুম্বন করে। হঠাৎ ক্রিস্তফের মনে হয়, মা'র দু'গাল যেন অশ্রুজলে ভিজে গিয়েছে। ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করে সে, হ্যাঁ, অনুমান তার সত্য। এতক্ষণ পরে মনে যেন শান্তি পায়, খানিকটা তৃপ্তি বোধ করে। তাহলে, সেও যদি মরে যায়, মা এমনি ক'রেই কাঁদবে! কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে আবার সন্দেহ জাগে, পাশের ঘরে মা তো বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে কথা বলছে! তা হলে কোন্‌টা সত্য ? এই একটু আগে যা সে অনুভব করেছে, না এখন যা শুনছে ? বহুক্ষণ ধরে বিছানায় ছট্‌ফট করতে করতে ভাবতে থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর কি ? সে চায় মা'কে বেদনাতুর দেখতে। অবশ্য, মা'র দুঃখে যে তারও দুঃখ হয় না তা নয়, তবুও যদি কোন রকমে জানতে পারত, তা হলে অনেক দুঃখের মধ্যেও তার অনেকখানি ভাল লাগত। সে বুঝতে পারত, সে যতখানি নিজেকে একলা মনে করে, সত্যিই ততখানি একলা সে নয়। একই বেদনায় তারা মাতা-পুত্রে পরমাত্মীয় হয়ে আছে। ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন সে-সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তার মনে থাকে না।

সপ্তাহ কয়েক পরে রাস্তার যেসব ছেলের সঙ্গে সে খেলা করত, একদিন তাদের মধ্যে একটি ছেলে এল না। কে একজন খবর দিল যে তার অসুখ করেছে। দিনের পর দিন তার অনুপস্থিতি সঙ্গী-সাথীরা কেউ লক্ষ্য করতো না। অসুখ হয়েছে, তাই আসে না। সহজ ব্যাপার। একদিন সন্ধ্যার পর ক্রিস্তফ বিছানায় শুয়ে আছে। সেদিন একটু সকাল-সকালই সে শয়ন করেছে, সামনের ঘরের আলো তার চোখে এসে পড়ছে। হঠাৎ মনে হলো, কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল। হয়তো কোন প্রতিবেশী এসে থাকবে। অন্যমনস্কভাবে পাশের ঘরে কান রেখে সে অভ্যাসমত নিজেকে নিজেই গল্প শোনাচ্ছিল। পাশের ঘরের সব কথাবার্তা তার কানে স্পষ্ট পৌঁছোচ্ছিল না। হঠাৎ তার কানে এল, প্রতিবেশীটি বলছে : 'সে মরে গিয়েছে !' ক্রিস্তফের রক্ত চলাচল যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসে, সে বুঝতে পারে, কে মরেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে সে কান পেতে থাকে। তার বাবা-মা হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে ওঠে। মেলশিয়র ভারী গলায় তাকেই ডেকে বলে·

'ক্রিস্তফ, শুনেছিস্? বেচারা ফ্রিজ মারা গেল—'

ক্রিস্তফ হঠাৎ কোন কিছুই উত্তর দিতে পারে না। চেষ্টা করে। শান্ত কণ্ঠে শুধু বলে: 'হাঁ, বাবা!'

কে যেন দড়ি দিয়ে তার সমস্ত বুকটাকে বেঁধে ফেলছে।

পাশের ঘর থেকে মেলশিয়র ব্যঙ্গের সুরে বলে ওঠে: 'হাঁ বাবা! শুধু এইটুকু? এই হলো জবাব? শুনে তোর একটুও দুঃখ হলো না রে?'

লুইসা তো তার ছেলেকে চেনে। তাই মেলশিয়রকে ভর্ৎসনা ক'রে বলে: 'আচ্ছা, থামো! ওকে ঘুমোতে দাও এখন!'

তার পর তারা চাপা গলায় কথা বলতে থাকে, কিন্তু ক্রিস্তফ কান খাড়া ক'রে সবই শুনতে পায়—ভাবে ফ্রিজের কি অসুখ হয়েছিল, টায়ফয়েড, ঠাণ্ডা জলের ব্যথ্ ···বিকার···ফ্রিজের মা-বাবার দুঃখু···। ক্রমশঃ নিঃশ্বাস নিতে তার ভীষণ কষ্ট হতে থাকে, গলার ভেতর কি যেন একটা এঁটে বসেছে। তাদের কথাবার্তা থেকে সে বুঝতে পারে যে, যে-অসুখে ফ্রিজ মারা গিয়েছে, সেটা নাকি ভয়ানক ছোঁয়াচে,—তার মানে, তারও সেই অসুখ হতে পারে, এবং ফ্রিজ যেভাবে কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছে, সে-ও সেইভাবে মরে যেতে পারে—ভয়ে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসে. মনে পড়ে. যেদিন ফ্রিজ অসুস্থ হয়ে খেলতে আসে নি, ঠিক তার আগের দিন সে তার সঙ্গে করমর্দন করেছিল এবং সেইদিন তার বাড়ির পাশ দিয়েই সে বাড়ি ফিরে এসেছিল। যাতে কোন কথা বলতে না হয় সেই ভয়ে সে বিছানায় চুপটি ক'রে শুয়ে রইল, কোন শব্দ করল না; এমন কি, প্রতিবেশীটি বিদায় নিয়ে চলে গেলে, মেলশিয়র যখন জিজ্ঞেস করল: 'ক্রিস্তফ, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?' সে কোন সাড়াই দিল না। শুনল মেলশিয়র তার মাকে বলছে: 'ছেলেটার প্রাণ বলে কোন পদার্থ নেই!'

লুইসা কোন প্রত্যুত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে ধীরে পর্দাটা তুলে সে একবার ক্রিস্তফের বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল। মা'র সাড়া পেয়েই ক্রিস্তফ চোখ বন্ধ ক'রে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। ঘুমোবার সময় তার ছোট ভাইদের এইভাবে নিঃশ্বাস নিতে সে দেখেছে। মা পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে সরে গেল। ক্রিস্তফের মনে তখন দুরন্ত ইচ্ছা হচ্ছিল, কিছুক্ষণ মা'কে তার কাছে আটকিয়ে রাখে, তাকে ডেকে বলে কতখানি ভয় সে পেয়েছে! সে-ভয়ের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য, অন্ততঃ কিছু সান্ত্বনা দেবার জন্য, তার দুরন্ত বাসনা হচ্ছিল মাকে সে অনুরোধ করে। কিন্তু তার কথা শুনে আবার তারা হেসে না ওঠে, তাকে

ভীরু মনে না করে। এই আশঙ্কায় সে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। তা ছাড়া, সে ভাল করেই জানত, তারা যেসব কথা বলবে, তাতে তার কোন লাভই হবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে জেগে বিছানায় ছটফট করতে থাকে, তার মনে হয়, যেন সেই কালব্যাধি তাকে সত্যিই গ্রাস ক'রে ফেলেছে, তাদের কথাবার্তায় রোগীর যে সব যন্ত্রণা, লক্ষণের কথা সে শুনেছিল, একে একে নিজের অঙ্গে সেই সব যন্ত্রণা যেন অনুভব করতে থাকে ; ক্রমশঃ চরম ভয়ে ভাবতে শুরু ক'রে দেয় : 'এই হয়তো শেষ...ক্রিস্ত মারা গিয়েছে, আমিও মরে যাবো...হয়ত মরে যাচ্ছি !...' কল্পনা আর বাস্তব এমনভাবে জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েছিল যে, সেই বিভীষিকার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে সে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল, মৃদুকণ্ঠে মাকে ডেকে উঠল ; কিন্তু তারা তখন ঘুমে অচেতন, তাদের জোর ক'রে ডেকে তুলতে সাহসে আর কুলাল না।

সেই ঘটনার পর থেকে তার সমগ্র শৈশব মৃত্যুর আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে যায়। সামান্য কিছু হলেই সে মনে করতো, নিশ্চয়ই কোন কঠিন অসুখ হয়েছে, অনেক সময় তার জন্য কোন অসুখ হবারও প্রয়োজন হতো না। স্নায়ুগ্রস্ত লোকের মতো কখনো বিষণ্ণ হয়ে থাকত, কখনও বা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠত। কল্পনায় সে হাজার রকম দুঃখবেদনার সৃষ্টি করত এবং প্রত্যেকটি দুঃখের আড়ালে মনে করত তার জীবন-অপহরণকারী সেই দৈত্যটি লুকিয়ে আছে। কতবার মা'র সামনে বসেই সে মনে মনে সেই কল্পিত যন্ত্রণার দুঃসহ ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত অথচ মা তার কিছুই জানত না। তার মনের মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র ভাবনা এক সঙ্গে এলোমেলোভাবে ভিড় ক'রে থাকত, সে ভয়ও পেত, সেই সঙ্গে আবার সেই ভয়কে সংগোপনে রাখবার সাহসও তাকে খুঁজে বের করতে হতো। অপরের করুণাপ্রার্থী হতে তার গর্বে বাধত, নিজে যে ভয় পেয়েছে, তার দরুন লজ্জাও বোধ করত ; মা'র প্রতি এমন একটা সজাগ মমতাবোধ ছিল যে, সবসময় নিজের ব্যাপার নিয়ে মাকে উত্যক্ত করতেও তার কুণ্ঠায় বাধত। অথচ মনের সেই সব দুর্ভাবনা বন্ধও করতে পারত না...'এবার নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে...খুব কঠিন অসুখ...বোধ হয় ডিপথিরিয়া'...সম্প্রতি কোথা হতে ডিপথিরিয়ার কথা শুনে থাকবে ! ..'দোহাই ভগবান ! এবারটি যেন না হয় !...'

ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট ধর্মভাবও জেগে উঠছিল। মার মুখ থেকে যা শুনত, পুরোপুরি তা বিশ্বাস ক'রে নিতেও পারত না : প্রায়ই শুনত, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা নাকি ভগবানের কাছে যায়, এবং পৃথিবীতে যদি

পুণ্যকাজ ক'রে গিয়ে থাকে, তা হলে মৃত্যুর পর সেই আত্মা নন্দনকাননে প্রবেশাধিকার পায়। কিন্তু এই নন্দনকাননে যাত্রার ব্যাপারটা শুনতে ভাল লাগলেও মনে আতঙ্কেরই সৃষ্টি করে। মার কাছে সে শুনত, ভগবান নাকি তাঁর অসীম করুণায় কোন কোন মানবশিশুকে ঘুমের মধ্যেই তাঁর কাছে টেনে নেন এবং সে-সব শিশুর তখন আর কোনই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। এই শ্রেণীর শিশুদের তথাকথিত সৌভাগ্যে তার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা জাগত না। ঘুমোবার সময় এই কথা মনে পড়লেই সে ভয়ে কেঁপে উঠত, যদি আজ রাত্রে ঘুমের মধ্যে ভগবান তার ওপর দিয়েই তাঁর সেই খেয়াল চরিতার্থ ক'রে বসেন! এই শয্যার স্নিগ্ধ উত্তাপ থেকে হঠাৎ তাকে যদি মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে ভগবানের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটা খুব প্র তিদায়ক ভ্রমণ হবে না। মনে মনে সে ভগবানকে প্রকাণ্ড আর এক সূর্যের মতন কল্পনা ক'রে নিয়েছিল, বজ্রের মতন যার কণ্ঠস্বর। সে-উত্তাপ সে সহ্য করতে পারবে কেন? নিশ্চয়ই তার চোখ, মুখ, কান…আত্মাও …জ্বলে যাবে! আর একটা মস্ত বড় কথা, ভগবান শাস্তি দিতেও তো পারেন, কে জানে?…তা ছাড়া, সে শুনেছে আরো অনেক যন্ত্রণার ব্যাপার নাকি আছে, সেগুলোর সঠিক পরিচয় যদিও তার জানা নেই, তবে যতটুকু শুনেছে তা থেকে তাদের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহই থাকে না, এবং সব চেয়ে বিপদের কথা, সেগুলোর হাত থেকে নাকি কেউই রেহাই পায় না…একটা কাঠের বাক্সের ভেতর দেহটাকে বন্ধ ক'রে রাখবে…গর্ত ক'রে মাটির তলায় নামিয়ে দেবে… দোহাই ভগবান! কি যাতনা! সে কি অসহ্য কষ্ট!…

কিন্তু তবুও বেঁচে থাকার মধ্যেও তো বিশেষ কোন আনন্দের কারণ নেই! বেঁচে থাকলেই খিদে পায়, মাতাল হয়ে বাবা বাড়ি ফিরছে দেখতে হয়, পাড়ার অন্য ছেলেদের হাতে নানারকমের নির্যাতন সহ্য করতে হয়, বড়রা তাচ্ছিল্য ক'রে যখন-তখন অপমান করে, মনের কথা কেউই বুঝতে চায় না, এমন কি নিজের মাও নয়। সবাই তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ভালো তো কেউ বাসে না। একলা, সম্পূর্ণ একলা তোমাকে থাকতে হয়…কেউ তা ভেবেও দেখে না। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত আর-এক চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। সেই জন্যেই, হাঁ সেইজন্যেই তো সে বেঁচে থাকবে, লোকে যাতে তাকে উপেক্ষা ক'রে না চলে, তাই সে দেখবে! মনের মধ্যে একটা তীব্র আক্রোশ—একটা রহস্যময় প্রাণ-শক্তি তাকে উদ্বেল ক'রে তোলে। বিচিত্র সে-শক্তি! আপাতত তার কোন ক্রিয়া নেই; এখনো যেন তা বহু দূরে, যেন অবরুদ্ধ, আবৃত, অচল পড়ে আছে; আজ সে বুঝতে পারে না,

কি তার দাবী, কি বা সে দেবে। কিন্তু তার মধ্যে সে আজ থেকে অনুভব করেছে, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তার নেই : ভিতর হতে বাইরে আসবার জন্যে সে-শক্তি তাকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে তুলছে। হয়তো আগামী কাল শুরু হবে তার বিজয়-অভিযান! সমস্ত অন্তর আলোড়িত ক'রে দুরন্ত এক দুর্বার বাসনা জেগে ওঠে বেঁচে থাকবার জন্যে, অত্যাচারীকে শাস্তি দিতে হবে, যা দুঃসাধ্য, তাকে আয়ত্ত করতে হবে! উল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠে : 'উঃ! যখন আমার বয়স হবে!…' কয়েক মুহূর্ত ভেবে নেয়: 'আঠারো…হাঁ…আঠারো…' কখন কখন ভেবে বয়সটা একুশে টেনে আনে, সেইটেই শেষ সীমা। পৃথিবী-জয়ের পক্ষে একুশ বছরই যথেষ্ট। যে সব বীরপুরুষদের সে সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসে, তাদের ব্যথা স্মরণ করে—নেপোলিয়ন…তার চেয়েও দূরকালে, আলেকজান্দার দি গ্রেট …নিশ্চয়ই সে তাদের সমকক্ষ কীর্তি অর্জন করবে, কোন সন্দেহ নেই তাতে, যদি সে কোন রকমে আর দশ বছর…না হয় বারো বছর বেঁচে থাকতে পারে। ত্রিশ বছর বয়সে যারা কিছু না ক'রে মরে যায়, তাদের জন্যে ক্রিস্তফের কোন সমবেদনা নেই। তারা বৃদ্ধ…দীর্ঘ জীবন তারা পেয়েছে, তাতেও যদি তারা কিছু ক'রে উঠতে না পেরে থাকে, তবে সে দোষ তাদেরই। কিন্তু এখনই যদি তাকে মরে যেতে হয়!…সর্বনাশ! চিরকাল লোকের মনে সে ছোট্ট শিশুটি হয়েই থাকবে, যে-শিশুকে যে খুশি সে ধমক দিতে পারে! এর অপেক্ষা ভয়াবহ আর কি হতে পারে! ভাবতে ভাবতে অসহ্য রাগে আর দুঃখে কেঁদে ওঠে, যেন সে সত্যিই মরে যাচ্ছে! মৃত্যু ভয়ের এই দুঃশ্চিন্তা তার সমস্ত শৈশবকালটাই যাতনা ক্লিষ্ট ক'রে দিল—শুধু মাঝে মাঝে জীবনের উপর বীতরাগ আর দুঃখ-বেদনা এই মরণের কোলে আশ্রয় নেবার লোভ দেখায়।

এই মৃত্যু-ঘন ভয়ার্ত ছায়ার মধ্যেই, তিমিরঘন রাত্রির প্রেত-কণ্টকিত অসহায় বেদনার মধ্যেই মহাশূন্যের নিঃসীম আঁধারে শুকতারার মতো, একদিন তার অন্তর-আকাশে সহসা দীপ্যমান হয়ে উঠল : আলোর শিখা, যে-আলোতে তার সমগ্র অনাগত জীবন আলোকিত হয়ে থাকবে : দিব্য সঙ্গীত…

বৃদ্ধ ক্রাফট তাঁর পৌত্রদের একটা পুরনো পিয়ানো উপহার দিয়েছিলেন। বৃদ্ধের এক পুরনো মক্কেল এই জরাজীর্ণ যন্ত্রটি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দান করে। বৃদ্ধ তাকে বাড়িতে এনে তার ওপর তার যন্ত্র-বিদ্যার কসরৎ প্রয়োগ ক'রে একরকম চলনসই ক'রে তোলেন। কিন্তু বৃদ্ধের উপহারটি বিশেষ সমাদরে গৃহীত হলো না। লুইসা আপত্তি তোলে, ইতিমধ্যেই তার ছোট্ট ঘরে একান্ত স্থানাভাব, তার মধ্যে

সেই জীর্ণ পিয়ানোর স্থান হবে কিভাবে? মেলশিয়রও স্পষ্ট ঘোষণা করল, বৃদ্ধ অকারণেই ওটার পেছনে খেটে মরছে, ওটা আর এখন বাজনা নয়, স্রেফ জ্বালানি কাঠ! একমাত্র জাঁ-ক্রিস্তফই খুশি হলো, তার মনে হলো পিয়ানোটা যেন যাদুকরের মায়া যন্ত্র, তার ভেতর আশ্চর্য সব কাহিনী লুকিয়ে আছে, রূপকথার কাহিনীর মতন, 'আরব-রজনীর সহস্র কাহিনীর মতন,' যে-সব কাহিনী সে তার ঠাকুরদার মুখে শুনেছে, তাদের মতন কত না বিচিত্র কাহিনী সেই যন্ত্রটির ভেতর ঘুমিয়ে আছে। পিয়ানোটি যেদিন প্রথম বাড়িতে এল, সেদিন তার বাবা একবার বাজিয়ে দেখেছিল। বর্ষার এক পশলা বৃষ্টির পর দমকা হাওয়ার তাড়নে সিক্ত শাখা থেকে যে-ভাবে টুপ টাপ ক'রে বৃষ্টির বিন্দু ঝরে পড়ে, তেমনি ধারা সেই পিয়ানোর ভেতর থেকে মেলশিয়রের অঙ্গুলি-স্পর্শে যেন বিন্দু বিন্দু আনন্দ ঝরে পড়ল। বালক আনন্দে করতালি দিয়ে বলে উঠল: 'আবার! আবার!' মেলশিয়র কিন্তু অবজ্ঞাভরে পিয়ানো বন্ধ ক'রে বলে উঠল: 'অপদার্থ!' ক্রিস্তফ আর অনুরোধ করল না বটে, কিন্তু সেই দিন থেকে যন্ত্রটির চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যখন দেখত কাছে-ভিতে কেউ নেই, পিয়ানোর ডালাটা তুলে অতি সন্তর্পণে একটা চাবি টিপে ধরত, যেন কোন বৃহৎ প্রাণীর জীবন্ত অঙ্গ স্পর্শ করছে। মনে হতো, সেই যন্ত্রের ভেতরে যে-সব প্রাণী বন্দী হয়ে আছে, তাদের সকলকে টেনে বের ক'রে আনে। কখনও বা তাড়াতাড়িতে এত জোরে টিপে বসতো যে শব্দ শুনে মা ধমক দিয়ে উঠত: 'বলি, আবার গোলমাল করছিস? সব জিনিস তোর না ছুঁলেই নয়!' কখন বা তাড়াতাড়িতে ডালাটা নামাবার সময় আঙুল চেপটে যেত, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃতি ক'রে আপনার মনে আহত আঙুল চুষতে আরম্ভ করত।

যন্ত্রটি আসার পর থেকে, সে সর্বদাই সুযোগ খুঁজত, কখন সে বাড়িতে একলা থাকতে পাবে। যখন তার মা কোন কাজে শহরে চলে যেত, কিংবা কারও সঙ্গে দেখা করবার জন্য কয়েক ঘণ্টার মতন বাড়ি থেকে বের হতো, তখন বালকের আনন্দের অবধি থাকত না। কান খাড়া ক'রে শুনত, মা সিঁড়ি দিয়ে নামল, দরজা পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল, ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন বাড়িতে সে একা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসে, ডালা খুলে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে। কোন রকমে চাবির ঘরগুলো তার কাঁধ বরাবর থাকে, তাতেই তার কাজ চলে যায়। কিন্তু বাজাবার আগে কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে সে যেন নিজেকে সংবরণ ক'রে নেয়। যখন লোকজন থাকে, তখনও সে ইচ্ছে করলে

বাজাতে পারে, অবশ্য যদি বিশেষ গোলমাল না হয়। কিন্তু লোকজনের সামনে তার লজ্জা করে, তাই সে পারে না। তা ছাড়া, বাজাবার সময় তারা গল্প করে, ঘুরে বেড়ায়, তাতে তার ব্যাঘাত জন্মায়, আনন্দ যায় কেটে। তাই যখন সে একা থাকে, তার এত ভাল লাগে। তাই পিয়ানোর সামনে বসে কয়েক মুহূর্ত সে যেন নিজের নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধরে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে তার নিঃশ্বাসের শব্দটুকু যেন চারপাশের নীরবতাকে ক্ষুণ্ণ না করে। পিয়ানোর দিকে হাত তুলতেই সহসা তার সমগ্র দেহ কি এক সুতীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে, যেন এই মুহূর্তে তার হাতের বন্দুক হতে গুলি ছুটে বের হবে। চাবিতে আঙুল দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। একটা চাবি একটুখানি টিপবার পর সে আঙুল তুলে নেয়, তার পর ধীরে আর একটা চাবির ওপর রাখে। দ্বিতীয় চাবিটার ভেতর থেকে কি রকম শব্দ বের হবে? প্রথম চাবিটার আওয়াজের মতন? না, অন্য আর একটা আওয়াজ? আগে থেকে সে কিছুই অনুমান করতে পারে না। একটার পর একটা টিপে যায়, নানারকমের বিচিত্র আওয়াজ জেগে ওঠে, কোনটা তীব্র, কোনটা গর্জমান, কোনটা বা ঘণ্টার মতো মৃদু টুং টাং ক'রে ওঠে। বালক কান পেতে শোনে, একটার পর একটা আলাদা ক'রে ক'রে শোনে, যতক্ষণ না সে-শব্দ ক্ষীণ হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, ততক্ষণ কান পেতে থাকে। দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির মতো বাতাসে তারা ভেসে বেড়ায়, কখনো দূর হতে বাতাসে ভর ক'রে এগিয়ে আসে, কখনো বা দূরে মিলিয়ে যায়। কান পেতে শুনতে শুনতে মনে হয় দূর থেকে যেন অন্য আলাদা সব আওয়াজ, পতঙ্গের আওয়াজের মতন, তাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বালকের মনে হয় যেন সদ্যজাগ্রত সেই সব শব্দ চলে যেতে যেতে তাকে ডেকে যাচ্ছে, দূরে, বহু দূরে, যে অজানা রহস্যালোকে গিয়ে তারা অবশেষে নিঃশেষে ডুবে হারিয়ে যাবে, সেইখানে যাবার জন্য তাকে ডাকছে···হায়! হারিয়ে যায় সুর ···তাই কি? তবে, কোথা হতে আসছে এই গুঞ্জন?···যেন ক্ষুদ্র পতঙ্গের অতি ক্ষুদ্র পক্ষ-বিতাড়নের শব্দ···কি বিচিত্র! কি অপরূপ! ক্রিস্তফের স্পষ্ট ধারণা হয়, এরাই সেই রূপকথার অশরীরী প্রাণী, দেহ নেই অথচ যারা আছে। কিন্তু কি ক'রে তাদের এত অনুগত ক'রেছে মানুষ? কি ক'রে তাদের এই পুরনো বাক্সের ভেতর বন্দী ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে? তার চেয়েও অদ্ভুত লাগে, যখন দু'টো চাবির ওপর এক সঙ্গে আঙুল গিয়ে পড়ে, তখন যে কি বের হয়ে আসবে, তা আগে থেকে অনুমান করা তার পক্ষে খুবই কঠিন। হয়তো দু'জনার মধ্যে শত্রুতা ছিল···জেগে উঠে একজন আর-একজনের ওপর ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে উঠে ঝগড়া শুরু

ক'রে দেয়, ঘৃণায় দু'জনে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে পরস্পরের কাছ থেকে সরে যায়। ক্রিস্তফের মন বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে, সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে, সেই পুরনো বাক্সের ভেতর অসংখ্য দৈত্য-দানব শৃঙ্খলিত হয়ে রয়েছে, সে স্পষ্ট শুনতে পায়, শৃঙ্খলের গায়ে দাঁত বসিয়ে তারা রাগে গর্জন করছে। আরব্য উপন্যাসের গল্পে সে শুনেছিল, সলোমন এমনি এক দৈত্যকে বোতলের ভেতর ছিপি এঁটে ধরে রেখেছিল; সেই বন্দী দৈত্য বোতল ভেঙ্গে বাইরে আসবার জন্যে ছটপট করতো। ক্রিস্তফের মনে হয় এই বাক্সের ভেতর বন্দী দৈত্যরাও তেমনি তাদের কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বার জন্যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মাঝে মাঝে আবার কোন কোন দৈত্য এমন আওয়াজ ক'রে ওঠে, মনে হয় যেন তারা খোসামোদ করছে, তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তবু সংশয় জাগে মনে, বুঝি তারা সুযোগ পেলেই দংশন করবে। ক্রিস্তফ বুঝতে চেষ্টা ক'রে কিন্তু বুঝতে পারে না তারা কি চায়, তবে এইটুকু বুঝতে পারে, তারা যেন তাকে লোভ দেখাচ্ছে, তাকে অকারণে উতলা ক'রে তুলছে, সে লজ্জিত হয়ে ওঠে। আবার কোন কোন সময় এমন সব সুর বেরিয়ে আসে, যেন তারা পরস্পরকে একান্তভাবে ভালোবাসে, জড়াজড়ি ক'রে একসঙ্গে যেন মিশে থাকে। মানুষ যেমন ভালোবেসে আলিঙ্গন করে, তেমনিধারা তারাও যেন তাকে আলিঙ্গন করে, চুম্বন করে, সুন্দর···সুমধুর। তারা ভালো জাতের দৈত্য, দয়ালু,—ক্রিস্তফ স্পষ্ট দেখতে পায়, মুখে তাদের আনন্দের স্নিগ্ধ হাসি···কোন কুটিলতার রেখা নেই সেখানে···ক্রিস্তফকে তারা ভালোবাসে··· ক্রিস্তফও তাদের ভালোবাসে। তাদের কথা শুনতে শুনতে জাঁ-ক্রিস্তফের দুই চোখ জলে ভরে আসে. বারবার তাদেরই সে খুঁজে বেড়ায়। তারাই তার বন্ধু··· দেখা দিয়ে কোথায় তারা যেন আবার হারিয়ে যায়।···

এই ভাবে বালক সুরের অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, স্পষ্ট অনুভব করে তাকে বেষ্টন ক'রে চারদিকে অপেক্ষা ক'রে আছে শত শত অশরীরী মূর্তি, কেউ বা ভালোবেসে আলিঙ্গন করবার জন্য ডাকে, কেউ বা তাকে তাকে গ্রাস ক'রে ফেলবার জন্যে···

একদিন এই অবস্থার মধ্যে মেলশিয়র তাকে ধরে ফেলল। পিতার জবরাট গলার আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিস্তফ আসন ছেড়ে ভয়ে লাফিয়ে উঠল। অন্যায় কাজে ধরা পড়ে গিয়েছে, অতএব এক্ষুণি শুরু হবে প্রহার, এই আশঙ্কায় দু'ই হাত তুলে প্রহারকে এড়াবার ভঙ্গী ক'রে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মেলশিয়র ধমকাল না তো, বরঞ্চ তার ভঙ্গী দেখে হেসে উঠল।

সস্নেহে বালকের মাথায় মৃদু করস্পর্শ বুলোতে বুলোতে পিয়ানোর দিকে আঙুল দেখিয়ে মেলশিয়র জিজ্ঞেস করল: 'ভাল লাগে? তাহলে বল, তোকে বাজাতে শেখাই! শিখতে ইচ্ছে যায়?'

আনন্দ উল্লসিত চিত্তে ক্রিস্তফ অস্ফুটকণ্ঠে বলে ওঠে: 'হাঁ!' তখন পিতাপুত্রে দু'জনে পিয়ানোর কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে, ক্রিস্তফ একরাশ বই থাকের পর থাক সাজিয়ে বসবার উচ্চাসন ক'রে নেয়; নিবিড় মনঃসংযোগে বাবার কাছ থেকে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। সেই প্রথম সে জানল, যাদুযন্ত্রের ভেতর যেসব শব্দময়ী অপ্সরীরা বাস করে, তাদের প্রত্যেকের একটা ক'রে স্বতন্ত্র নাম আছে এবং চীনা নামের মতন সেই সব নাম একটা মাত্রা বা একটা অক্ষরেই সম্পূর্ণ। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে এই সংবাদকে সে গ্রহণ করে। রূপকথায় রাজকুমারীদের যেমন সব গালভরা মিষ্টি নাম থাকে, এদেরও নিশ্চয়ই সেইরকম সব নাম আছে, এই ছিল তার দৃঢ় ধারণা। তা ছাড়া, আর একটা ব্যাপারেও সে কিছুটা আশাহত হলো, এই সব শব্দময়ী অপ্সরীদের কথা বলবার সময় তার বাবা এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাল যে, তা ক্রিস্তফের মোটেই মনঃপূত হলো না। মেলশিয়র যখন আলাদা আলাদা ভাবে তাদের এক-একজনের নাম ধরে ডাকতে লাগল, তা-ক্রিস্তফের কানে কেমন যেন খাপছাড়া, হাল্কা, প্রাণহীন মনে হতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মেলশিয়র যখন তাকে বুঝিয়ে দিল যে, এই সব সুর স্বতন্ত্র থাকতে ভালোবাসে না, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ক্রিস্তফ কিছুটা আশ্বস্ত হলো। যখন মেলশিয়র বাজিয়ে বুঝিয়ে দিল, তখন এই সব বিচ্ছিন্ন সুর এক নিমেষে শিক্ষিত সৈনিকের মতো যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠল, রাজার আদেশে রণযাত্রী সৈনিকের মতো একসঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলল। ক্রিস্তফ মহাখুশি হয়ে উঠল, যখন শুনল, এরা প্রত্যেকেই খুশিমত পালা ক'রে রাজা সেজে বসতে পারে, এবং অন্য সকলে ঠিক সমানভাবেই তখন সেই রাজাকে মেনে চলবে এবং এই সুদীর্ঘ পর্দার এক প্রান্ত পর্যন্ত সকলকেই প্রয়োজন হলে একসঙ্গে জাগিয়ে তুলতে পারা যায়। যে আদেশে এই অসংখ্য সুর-সৈনিকের দল সাড়া দিয়ে ওঠে, আজ এই মুহূর্তে যদি সে সেই আদেশ আয়ত্ত ক'রে নিতে পারত! তার ইঙ্গিতে তারা যাত্রা ক'রে চলবে···কিন্তু···হঠাৎ সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। এদের সম্বন্ধে এতদিন ধরে সে যে-সব কল্পনা ক'রে সুখ পেত, আজ মেলশিয়রের কথায় তার সেই কল্পনার বিমুগ্ধ-জগৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। যাক্, তার পরিবর্তে সে যা পেল, তাই বা কম সুখের কি? তবে, পরিশ্রম করতে হবে···সে

বুঝল রীতিমত তাকে চেষ্টা করতে হইবে। চেষ্টা করতে তার আনন্দই হলো, কই, বিন্দুমাত্র তো ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না? সকলের চেয়ে অবাক হয়ে গেল বাবার ধৈর্য দেখে। একই পর্দা শতবার ক'রে মেলশিয়র দেখিয়ে দেয়, শতবার ক'রে একই জায়গা থেকে সুরু করে, মেলশিয়রের বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই, খেদ নেই। জাঁ-ক্রিস্তফ বুঝে উঠতে পারে না, কেন তার বাবা এভাবে এতখানি কষ্ট স্বীকার করছে। তা হলে, তার বাবা সত্যিই তাকে ভালোবাসে? তার ভাবতে ভাল লাগে। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বাবার নির্দেশকে গ্রহণ করে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। এক মুহূর্তও সে আর আলস্যকে প্রশ্রয় দেবে না।

যদি সে জানত, সেই মুহূর্তে তার বাবা মনে মনে তার সম্বন্ধে কি পরিকল্পনা করছিল, তা হলে হয়তো নিজেকে এতখানি শান্ত ক'রে রাখতে পারত না।

সেই দিন থেকে মেলশিয়র তাকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে যেতে শুরু করল, সেখানে সপ্তাহে তিনদিন ক'রে বাড়ির ভিতরে তারা নিজেদের মধ্যে সঙ্গীতের জলসা বসাত। মেলশিয়র সেই দলের মোহড়ায় বেহালা বাজাত, বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল বাজাতেন চেলো। মাত্র আর দু'টি প্রাণী সেই দলে ছিল, একজন ব্যাঙ্কের কেরানী আর একজন 'শীলারস্ট্রশ' গলির বুড়ো ঘড়িওলা। মাঝে মাঝে পাড়ার ডাক্তারখানার কেমিষ্ট বাঁশী নিয়ে যোগদান করতো। বিকেল পাচটা থেকে তারা শুরু করতো, রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সমানে চলতো। এক-একটা গৎ বাজাবার পর কিছুক্ষণ তারা বিরাম দিত, অর্থাৎ সেই অবকাশে বিয়ার চলত। যখন যার খুশি প্রতিবেশীরা আসত, যেত, দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে শুনত, মাথা দুলিয়ে অথবা মেঝেতে পা ঠুকে তাল দিত, সারা ঘর তাদের তামাকের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠত। পাতার পর পাতা, সঙ্গীতের পর সঙ্গীত, তারা বাজিয়ে চলত, এতটুকু ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা যেত না। একমনে যে যার যন্ত্র বাজাত, কেউ কোন কথা বলত না, তাদের মুখের গম্ভীর চেহারা দেখে আদৌ বোঝা যেত না, তারা বাজাচ্ছে, তাতে সত্যিই তারা আনন্দ পাচ্ছে কি না। একটা নির্দিষ্ট অভ্যাসে যেন তারা নিখুঁতভাবে শুধু সঙ্গীতের ব্যায়াম ক'রে চলেছে। যে-জাতি জগতের মধ্যে সঙ্গীতে সব চেয়ে প্রতিভাশালী, সে-জাতির মধ্যে এই জাতীয় মধ্যস্তরের শিক্ষিত পটুত্ব খুব বিরল ব্যাপার নয়। বলিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষিধের মতন, এ ক্ষিধে খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করে না, পর্যাপ্ত খাদ্য পেলেই সন্তুষ্ট থাকে। এদের সঙ্গীতের ক্ষিধেও ছিল সেইরকম বলিষ্ঠ, সঙ্গীতের অন্তরের সৌন্দর্য নিয়ে এরা মাথা ঘামাতো না, এদের কাছে সব সঙ্গীতই ছিল সমান; বিটোফেন ও ব্রাহ্‌মসের মধ্যে কোন তফাৎই এদের কাছে

ধরা পড়ত না ; প্রত্যেক অমর সুর-স্রষ্টার সব রচনাই যে সমান আবেদনের নয়, তা এরা বুঝত না—; প্রাণহীন একটা কনসার্টের গৎ আর-একটা জীবন্ত সোনাটার আবেদনের কোন পার্থক্যই এদের অন্তরে ধরা পড়ত না।

পিয়ানোর পেছনে একটা নিরালা কোণ জঁা-ক্রিস্‌ফত নিজের জন্য বেছে নিয়েছিল, সেখানেই সে একলা চুপটি ক'রে বসে থাকত। সেখানে তাকে বিরক্ত করবার জন্যে আর কেউই যেতে পারত না, যেতে হলে রীতিমত হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতে হবে। আধ-অন্ধকারে তাকে স্পষ্ট চোখেও পড়ত না। তার আশে-পাশে হাত-কতক মাত্র জায়গা ছিল, ইচ্ছে হলে কোনরকমে সে সেখানে গড়াতে পারত মাত্র। তামাকের ধোঁয়ার আর ধুলোয় তার কণ্ঠ শুকিয়ে উঠত কিন্তু সে গ্রাহ্যই করত না, পরম ধৈর্যে উৎকর্ণ হয়ে সঙ্গীত শুনে চলত, মাঝে মাঝে পিয়ানোর পেছনে পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের ভেতর ধূলিসিক্ত আঙুল চালিয়ে দিয়ে ছিদ্রকে দীর্ঘতর করতে চেষ্টা করত। যে-সব সঙ্গীত তার কানে এসে বাজত, তার সব কিছুই যে তার ভাল লাগত তা নয়, কিন্তু কোন সঙ্গীতেই তার বিরক্তি ছিল না ; তা ছাড়া সঙ্গীত সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোন সিদ্ধান্তই গড়ে তুলতে সে চাইত না, কারণ, সে জানত, সে বিদ্যা তার আজও আয়ত্তে আসেনি। তাই, সমস্তই সে স্বীকার ক'রে নিত। তবে কোন কোন সঙ্গীতের সময় সে ঘুমিয়ে পড়ত, কোন কোন সঙ্গীত আবার তাকে ঘুম হতে জাগিয়ে তুলত। কেন যে এই প্রভাবের পার্থক্য ঘটত, তা সে বুঝে উঠতে পারত না। তবে, তার অজ্ঞাতসারে, তার চেতনা ঠিক আসল সঙ্গীতের জায়গাতেই তাকে জাগিয়ে তুলত। কেউই তাকে দেখতে পাচ্ছে না, সে-সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে সে আপনার খেয়ালে কখনো মুখ ভেংচিয়ে উঠত, কখনও নাক বেঁকিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রতিবাদ ক'রে উঠত, কখনো বা জিভ বের ক'রে বাদকদের ব্যঙ্গ করত ; কখনো চোখ অনুরাগে জল জল ক'রে উঠত, কখনো বা ঝিমতো ; হাত পা ছুঁড়ে চঞ্চল হয়ে উঠত, সাধ হতো, এই মুহূর্তেই কদম কদম পা ফেলে রণ-যাত্রায় বের হয়, বিশ্বকে পায়ের তলায় এনে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলে। সময় সময় সে এতদূর চঞ্চল হয়ে উঠত যে, পিয়ানোর ওপর হতে বাদক তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন হয়ে উঠত। অন্ধকার কোণ থেকে সহসা সে দেখতে পেত, একটি মাথা পিয়ানোর ওপর থেকে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তিক্ত-কণ্ঠে তাকে ভর্ৎসনা করছে : 'এই ছেলে, পাগল হয়ে গেলি নাকি ? পিয়ানোর ঘাড়ের ওপর এসেছিস কেন ? সরে যা···নইলে টেনে কান ছিঁড়ে দেবো !' সেই অকস্মাৎ তীব্র ভর্ৎসনায় জঁা-ক্রিস্‌তফের সমস্ত সুর কেটে যেত, মনে মনে ভীষণ রেগে উঠত। বা রে, সে

একা একা নিজের মনের আনন্দে নিজে আছে, সে-আনন্দে তারা ব্যাঘাত দেবার কে? সে তো কারও কোন ক্ষতি করছে না! সব সময় সবাই তাকে ভর্ৎসনা করবে? কেন? তার বাবাও সেই ভর্ৎসনায় যোগ দেয়। সবাই মিলে অনুযোগ করে, সে নাকি অনবরত গোলমাল করছে। গোলমাল করবেই তো, এ সঙ্গীত বালকের ভাল লাগে না। সেই নিরীহ ভদ্রসন্তানদের যারা কনসার্টের মক্স কত ভাবেই না জমাবার চেষ্টা করছে, যদি সে সময় কেউ জানাত যে, সেই ঘরের মধ্যে যত লোক ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র সেই ক্ষুদ্র বালকই প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গীতের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারছিল, তা' হলে হয়তো তাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকত না।

যদি তাকে শান্ত দেখবারই তাদের বাসনা থাকে, তা হলে কেন তারা এমন সঙ্গীত বাজায়, যা শুনলে তার মনে আপনা হতেই যুদ্ধে ছুটে যাবার বাসনা জাগে? চঞ্চল না হয়ে তখন সে কি ক'রে থাকবে? সে-সঙ্গীতের মধ্যে সে স্পষ্ট শুনতে পেত, রণোন্মত্ত অশ্বের দল ছুটে চলেছে, তরবারির সঙ্গে তরবারির সংঘাতের ঝন্ঝনা জেগে উঠছে, সে স্পষ্ট শুনতে পায় আহতের আর্তনাদ, বিজয়ীর জয়োল্লাস, জয়-গৌরবের শঙ্খধ্বনি! সেই সব শুনে, তারা আশা করে যে, তাদের মতো শুধু ঘাড় নেড়ে আর পা ঠুকে তাল দিয়েই সে শান্ত হয়ে থাকবে! সেই যদি তাদের সাধ, তা হলে তারা কেন শুধু নিস্তেজ ঘুমের বাজনাই বাজায় না? তাদের সামনের সঙ্গীতের বইতে তো পাতার পর পাতা বহু সঙ্গীতের স্বরলিপি আছে, যে-সঙ্গীত শুধু কলরবই ক'রে চলে, কোন কথাই বলে না। কিছুক্ষণ আগেই, বুড়ো ঘড়িওলা সেই রকমই একটা সঙ্গীত বাজাল, গোল্ডমার্কের সৃষ্টি বাজানোর পর বৃদ্ধ সগর্বে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে নিজের মন্তব্য করেছিল: 'চমৎকার। ভারী মিষ্টি। কোন রকম কর্কশতা নেই। সব কোণগুলো সুন্দরভাবে মোড়া, সুগোল—' বালক তো তখন চুপ করেই ছিল। তন্দ্রায় ঢুলছিল। কি বাজনা হচ্ছে, তা সে জানত না, স্পষ্ট ক'রে সব শুনতেও পায় নি, তবে তার ভাল লাগছিল, সে আবেশে চোখ বুঁজে ঘুমের দেশে স্বপ্নের সন্ধানে চলেছিল।

এমনি প্রায়ই সে স্বপ্নের খোঁজে বের হয়ে পড়ত; তার স্বপ্নের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা ছিল না, কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগও থাকত না। অসম্পূর্ণ, আবছা সব ছবি। ক্বচিৎ কখনো কোন ছবি সম্পূর্ণ মূর্তিতে ফুটে উঠত। তার মা কেক্ তৈরি করছে, হাতের আঙুলে রস জড়িয়ে গিয়েছে, একটা ছুরি দিয়ে তা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছে; আগের দিন রাতে বাড়ির পাশে নদীর জলে যে

ইঁদুরটাকে সাঁতার কাটতে দেখেছিল ; সেই শুকনো উইলোর ডালটা, যা নিয়ে সে চাবুক তৈরি করেছিল···এই জাতীয় সব টুকরো টুকরো জিনিসের ছবি। সে বুঝে উঠতে পারত না, এই গান শুনবার সময়েই তারা কেন তার মনে ফিরে ফিরে দেখা দেয়! অনেক সময় এই সব দিবাস্বপ্নে সে স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেত না, অথচ অনুভব করত যেন অসংখ্য বিচিত্র বস্তু তাকে ঘিরে রয়েছে। তাদের অস্তিত্ব সে শুধু অনুভব করতে পারত, কিন্তু প্রকাশ ক'রে তাদের কোন পরিচয়ই দিতে পারত না। তাদের মধ্যে কোন কোনটা তার চিত্তে তীব্র বিষাদ জাগিয়ে তুলত, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সে-বিষাদের মধ্যে সে কোন বেদনাই বোধ করত না, যে-বেদনা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ জীবনে তাকে ভোগ করতে হতো। আবার কোন কোনটা অকারণে তাকে উল্লসিত ক'রে তুলত, এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাকে ভরে দিত। তখন জাঁ-ক্রিস্তফ আপনার মনে বলে উঠত : 'এই তো, এই তো আমি চাই···' কিন্তু সেই "এই তো" যে কি পদার্থ, তার কোন সঠিক ধারণাই সে ক'রে উঠতে পারত না ; কেনই বা সে ঐরকম বলে উঠল, তাও ঠিক ক'রে উঠতে পারত না। কিন্তু সে যাই হোক্ সে বুঝত, সেই রকম বলতে তার ভাল লেগেছে, তাই সে বলেছে। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গীতের মধ্যে তার কানে এসে লাগত সমুদ্রের গর্জন, সে স্পষ্ট অনুভব করত, সমুদ্রের খুব কাছেই সে যেন এসে পড়েছে, তার আর সমুদ্রের মাঝখানে শুধু রয়েছে কতকগুলি বালির পাহাড়। জাঁ-ক্রিস্তফ জানত না, কি সে-সমুদ্র, আর কেনই বা সে-সমুদ্র তার এত কাছে এসে পড়েছে, কি বা সে চায় তার কাছে। সে স্পষ্ট অনুভব করত, এখনি সেই সমুদ্র তরঙ্গ তুলে মাঝখানের বালির আড়াল ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবে···তখন···তখন কি হবে ?—ভালই হবে, আনন্দে সে সাগরকে প্রাণের মাঝে ডেকে নেবে। তখন শুধু রাতদিন কান পেতে তার কলসঙ্গীত সে শুনবে, তার অতি কাছ থেকে সেই মহাসঙ্গীতের সুরে সুরে সে ঘুমিয়ে পড়বে. সে-ঘুমের মধ্যে তার ছোট্ট জীবনের ছোট ছোট সব বেদনা আর লাঞ্ছনা ডুবিয়ে নিঃশেষে কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে। বিষাদময়, তবুও তাতে নেই লজ্জা, নেই লাঞ্ছনা ; সব কিছুই মনে হয় স্বাভাবিক, সুন্দর, মিষ্টি।

সাধারণতঃ চলনসই মাঝারি গোছের সঙ্গীতই তার মধ্যে এই স্বপ্নের নেশা জাগিয়ে তুলত। এই জাতীয় সঙ্গীতের অপদার্থ রচয়িতাদের মাথায় অর্থ উপার্জনের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই থাকে না ; প্রচলিত পন্থা অনুসরণ ক'রে কোন রকমে একটা সুরের সঙ্গে আর একটা সুরকে গেঁথে তুলে তারা তাদের জীবনের শূন্যতাকে আড়াল ক'রে রাখতে চেষ্টা করে—কখনও বা শুধু স্বতন্ত্র হবার মোহে

প্রচলিত পন্থার বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু এই সব সুর-শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত এমন একটা স্বাভাবিক প্রাণ-শক্তি থাকে যে, মূর্খ অপদার্থ লোকের হাতের স্পর্শে জেগে উঠলেও, তা যে-কোন সহজ সরল অন্তরে সুবিশাল ঝঞ্ঝা জাগিয়ে তুলতে পারে। সত্যিকারের সঙ্গীত-প্রতিভাধরেরা মানুষের অন্তরে যে স্বপ্ন জাগিয়ে তোলেন, সে-স্বপ্নের উপর থাকে তাঁদেরই পূর্ণ আধিপত্য, তাঁদের সৃষ্ট সুর কঠিন স্বামিনীর মতন শ্রোতার অন্তরকে করে নিয়ন্ত্রিত. কিন্তু অপদার্থ লোকের হাতের সঙ্গীত শ্রোতার মনে যে-স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে, সে-স্বপ্নের উপর শ্রোতারই থাকে পূর্ণ আধিপত্য, সে তখন নিজের খুশীমত নিজের স্বপ্ন ভাঙ্গতে গড়তে পারে, সেখানে থাকে নিজের মতন ক'রে স্বপ্ন দেখবার অবাধ স্বাধীনতা।...তাই জাঁ-ক্রিস্তফ তার বাবার সেই সঙ্গীত-আসরে নিজের স্বপ্নের নেশায় নিজেই মশগুল হয়ে থাকত। তাই পিয়ানোর আড়ালে. অন্ধকার কোণায়, সে অবাধে নিজেকে ভুলে বসে থাকত, সে যে সেখানে আছে ঘরের লোকেরাও তা ভুলে যেত। অবশেষে একসময় তার চেতনা ফিরে আসত, দেখত তার গা বেয়ে পিঁপড়ের দল এগিয়ে চলেছে...তার মনে পড়ে যেত, সে একজন অসহায় ক্ষুদ্র বালক মাত্র নোংরা নখ...নোংরা ধুলোমাখা পোশাক... অন্ধকার এককোণে নিজের দু' পা দু' হাত দিয়ে ধরে কোন রকমে বসে আছে।

পিয়ানোর পর্দাগুলো এত উঁচুতে ছিল যে নাগাল পেতে তাকে রীতিমত কসরৎ করতে হতো। থাকের পর থাক বই সাজিয়ে উচ্চাসন ক'রে নিত। একদিন যখন সেইভাবে সে আপনার মনে পিয়ানো বাজিয়ে চলছিল, নিঃশব্দে কখন যে মেলশিয়র ঘরে ঢুকেছে, তা সে জানতেই পারে নি। ঘরে ঢুকেই ছেলের বাজনা শুনে মেলশিয়র স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, পুত্রের অজ্ঞাতে মিনিট কয়েক ধরে বাজনা শুনল; হঠাৎ তার মনে বিদ্যুৎ-ঝলকে এক মহাসম্ভাবনার আশা জেগে উঠল; 'আশ্চর্য! এ যে দেখছি, জন্ম-গুণী...রীতিমত একটা প্রতিভা!...তাই তো...ঠিক হয়েছে...ইস্...একথা আগে মনে হয় নি কেন? সংসারের আর ভাবনা কি?...' মেলশিয়র পুত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছিল, সে তার জননীর ধারা অনুযায়ী ছোট খাট একটা চাষাই হবে। আজ তার সে-ভ্রান্তি এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। 'চেষ্টা ক'রে দেখতে তো আর পয়সা খরচ হয় না! যদি শিখিয়ে নিতে পারি, তা হ'লে সংসারের দুর্ভাবনা এক নিমেষে দূর হয়ে যাবে। ওকে নিয়ে সারা জার্মানী ঘুরে বেড়াবো...জার্মানী কেন, জার্মানীর বাইরেও যে-কোন দেশে যেতে পারবো! পয়সা রোজগারও হবে...রীতিমত একটা উন্নত জীবনও যাপন করা হবে!'

মেলশিয়রের একটা গুণ ছিল, যা কিছুই করুক না কেন, তার মধ্যে একটা উন্নত জীবনের লক্ষণ সে স্পষ্ট দেখতে পেত···অন্ততঃ সে তা ভেবেই আত্মপ্রসাদ লাভ করত।

মনে মনে নিজের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে, খাবার টেবিলে শেষ-গ্রাস মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বালক-পুত্রকে সোজা পিয়ানোর সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। এবং যতক্ষণ না বালকের চোখ শ্রান্তি ও ঘুমে আপনা থেকে বুঁজে এল, ততক্ষণ সমানে তার তালিম চলল। তার পরের দিন একইভাবে পর পর তিনবার তাকে নিয়ে বসল। তার পরের দিনও তাই চলল।

তার পর, প্রতিদিন ঠিক একইভাবে অবিচ্ছেদ চলে সঙ্গীতের গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম। ক্রিস্‌তফ অচিরেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গীত-শিক্ষার নামে মৃত্যু-বিভীষিকা পেয়ে বসে তাকে···অবশেষে আর সহ্য করতে পারে না, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; তাকে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছিল, তার কোন সার্থকতাই সে খুঁজে পায় না; কি ক'রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পর্দার ওপর দিয়ে আঙুল চালাতে পারা যায়, শুধু তারই কসরৎ: এর মধ্যে কোথায় সঙ্গীত, কোথায় আনন্দ আর সৌন্দর্য, তা সে ভেবেই পায় না। সমস্ত স্নায়ু অবসন্ন হয়ে আসে। কোথায় গেল তার কল্পনার সুর-অপ্সরীরা? কোথায় বা সেই বন্দী দানবের দল, যারা অসহ্য আক্রোশে নিজেদের বন্ধন-শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে বের হতে চায়? নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার সুবিপুল স্বপ্ন সাম্রাজ্য। শুধু সেই পর্দা মুখস্থ করা আর আঙুল চালানোর কসরৎ···একঘেয়ে, বিরক্তিকর, প্রাণহীন। জাঁ-ক্রিস্‌তফ ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে উঠল, মেলশিয়র যা বলতো, জাঁ-ক্রিস্‌তফ তা কানেই তুলত না। অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত। তিরস্কৃত হলে, মুখ ভার ক'রে শুনবার ভান করতো মাত্র। মেলশিয়র গালাগাল দিয়ে উঠত, বালক ভ্রূক্ষেপও করতো না। বাবা রাগে মুখ বিকৃতি করলে, সে-ও তাচ্ছিল্যভরে মুখ-বিকৃতি ক'রে থাকত। একদিন মেলশিয়র পুত্রসম্বন্ধে তার পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করছিল, সেইদিন সর্বপ্রথম সে বাবার এত সমস্ত আগ্রহের কারণের সন্ধান পেল; চরম বিদ্রোহী হয়ে উঠল তার সর্ব সত্তা। সার্কাসের দল যেমন ক'রে জন্তুর খেলা দেখায়, তেমনি ক'রে তার বাবা তাকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়াবে, প্রচুর অর্থ আসবে, তারই জন্যে এই সঙ্গীত-শিক্ষার এত আগ্রহ! হাতীর দাঁত বইয়ে নেবার জন্যে এত সাধ্য-সাধনা! সঙ্গীত-শিক্ষার এমনি তাগাদা যে, একবার সে তার প্রিয়বন্ধু সেই গৃহান্তরালবর্তী নদীর ধারে গিয়ে বসবারও অনুমতি পাবে না! কেন তারা সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে এমন ক'রে লেগেছে? মনে মনে সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তার আত্মগর্বে নিদারুণ আঘাত লাগে। তার সমস্ত

স্বাধীনতা তারা কেড়ে নিচ্ছে। সে স্থির করলো, সে আর পর্দায় হাত দেবে না, দিলেও এমন বিশ্রীভাবে দেবে যাতে তার বাবা আপনা থেকেই বিরূপ হয়ে ওঠে। অবশ্যই এই বিদ্রোহের ভাব বজায় রাখা তার পক্ষে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। কিন্তু যত কষ্টই হোক্, সে কিছুতেই নিজের স্বাধীনতা হারাবে না।

মনে মনে সেই সংকল্প স্থির ক'রে, পরের দিনই যখন সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে মেলশিয়র ছেলেকে ডাকল, সে তার সংগোপন পরিকল্পনানুযায়ী বাঁকা পথ ধরল। ইচ্ছে ক'রেই ভুল পর্দায় আঙুল চালাতে লাগল, অন্যমনস্কভাব দেখিয়ে একটার পর একটা ভুল ক'রতে লাগল। মেলশিয়র ধমক দিয়ে ওঠে, ধমক গর্জনে পরিণত হয়, অবশেষে গর্জন প্রহারে রূপান্তরিত হয়। হাতের কাছেই একটা ভারী রুল ছিল। প্রত্যেকবার ভুল পর্দায় আঙুল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আঙুলের ওপর সবেগে রুলের আঘাত এসে পড়ে। বালকের কানের একেবারে কাছে মুখ এনে মেলশিয়র ভীমগর্জনে চিৎকার ক'রে ওঠে। সে-চিৎকারে ক্রিস্তফের কানে তালা লেগে যায়। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে কান্নাকে রোধ করতে চেষ্টা করে—কেঁদে সে দুর্বলতা প্রকাশ করবে না, কিছুতেই নয়। আজ সে পণ করেছে, কিছুতেই ঠিক মতো বাজাবে না। নিজের জেদ বজায় রেখে সমানে যা খুশি বাজিয়ে চলে; পর্দার দিকে না তাকিয়ে মেলশিয়রের হাতের দিকে চেয়ে থাকে, প্রহারের জন্যে হাত উঠতে দেখলেই মাথা ঘুরিয়ে সরিয়ে নেয়। মেলশিয়রও জেদ ধরে বসল, যদি দু'দিন দু'রাত্রি এমনি বসে থাকতে হয়, সে বসে থাকবে, যতক্ষণ জাঁ-ক্রিস্তফ প্রত্যেকটি পর্দায় ঠিক মতো হাত না দেবে, ততক্ষণ কিছুতেই তাকে রেহাই দেবে না। ক্রমশঃ মেলশিয়র যখন বুঝতে পারল, ছেলে ইচ্ছে ক'রেই সেইরকম বেয়াদবি করছে, ইচ্ছে ক'রেই ভুল বাজাচ্ছে, রাগ প্রহারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। ঘন ঘন হাতের আঙুলের উপর রুলের আঘাত পড়তে লাগল, আঙুল অবশ হয়ে আসবার মতন হলো। ভেতর থেকে চাপা কান্না বাইরে আপনা থেকেই উছলিয়ে পড়ে। তবুও জোরে ডাক ছেড়ে কাঁদল না। নীরবে গুমরিয়ে উঠতে লাগল। উদ্বেলিত অশ্রু আর কান্নাকে ঢোক গিলে জোর ক'রে চেপে রাখতে চেষ্টা করে। অবশেষে বুঝতে পারে, এই পন্থা অনুসরণ ক'রে কোন সুবিধে হবে না, স্পষ্ট বেপরোয়া বিদ্রোহই ঘোষণা করতে হবে। পিয়ানো হতে হাত তুলে নিল, সে আর বাজাবে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, এবার আর রুলের আঘাত নয়, প্রহারের ঝড় নামবে। ভয়ে সর্বদেহ থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। তবুও স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করল: 'বাবা, আমি আর বাজাবো না!'

উত্তেজনায় আর রাগে মেলশিয়রের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, গর্জন ক'রে ওঠে : 'কি ! কি বললি !.. '

বালকের ছু'হাত ধরে এমনভাবে ঝাঁকুনি দিল যে, আর একটু হলে হাত ভেঙ্গেই যেত।

জাঁ-ক্রিস্তফের সারা দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। তবুও, বাবার উদ্যত প্রহারকে এড়াবার জন্যে ছু'হাত তুলে বলে ওঠে : 'আমি আর বাজাবো না··· এরকমভাবে মার খেতে আমি পারবো না, কিছুতেই না—। তা ছাড়া···'

কথা শেষ করতে পারল না। প্রচণ্ড এক আঘাতে তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। মেলশিয়র গর্জন ক'রে উঠল : 'ওঃ ! মার খেতে তুমি পারবে না ?···'

সঙ্গে সঙ্গে প্রহারের বর্ষণ শুরু হলো। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসের ভিতর হতেই জাঁ-ক্রিস্তফ আর্তনাদ ক'রে উঠল : 'তা ছাড়া···গান আমি ভালোবাসি না···একটুও ভালোবাসি না ! · '

আঘাতের ধাক্কায় চেয়ার হতে ছিটকিয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেলশিয়র তাকে টেনে এনে আবার চেয়ারে জোর ক'রে বসিয়ে দিল। হাত টেনে নিয়ে পর্দার ওপর সজোরে ঠুকে ধরল : 'তোকে বাজাতেই হবে !'

তেমনি তীব্রকণ্ঠে জাঁ-ক্রিস্তফ প্রতিবাদ ক'রে উঠল : 'না, না, কিছুতেই না !'

অবশেষে মেলশিয়রকে হার মানতে হলো। প্রহার করতে করতে চেয়ার হতে তাকে টেনে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে ফেলে দিল। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল, সারাদিন একটা দানাও মুখে দিতে পাবে না···সারাদিন কেন, সারা মাস তাকে না খাইয়ে রাখবে যতক্ষণ না সে ভালোমানুষের মতো সমস্ত গৎগুলো ভাল ক'রে বাজাতে শিখছে, ততক্ষণ তাকে উপবাস ক'রেই থাকতে হবে। সজোরে একটা লাথি মেরে দূরে ফেলে দিয়ে, তার মুখের সামনেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

প্রহারের প্রত্যক্ষ ফল কাটিয়ে উঠে জাঁ-ক্রিস্তফ দেখল, সেই পুরনো জরাজীর্ণ অন্ধকার সিঁড়ির তলায় সে পড়ে আছে। দেয়ালের ওপর আলোক-বাতায়নের ভাঙ্গা কাঁচের ভেতর দিয়ে এক ঝলক জলো হিমেল হাওয়া গায়ে এসে লাগল। ভিজে পুরনো দেয়াল চুঁইয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছিল। জাঁ-ক্রিস্তফ সিঁড়ির এক ধাপ ওপরে উঠে বসল। রাগে আর আবেগে উন্মাদের মতন তার ভেতরটা টলছিল। চাপা গলায় বাবাকে গালাগাল দিয়ে উঠল : 'পশু ! পশু ! হাঁ, তুমি একটা আস্ত বুনো পশু !···যাচ্ছেতাই···পিশাচ···আমি ছু'চক্ষে তোমাকে দেখতে

পারি না…তোমাকে ঘেন্না করি…সত্যি ঘেন্না করি…তুমি মরে গেলে আমি খুশি হই…হাঁ, খুশি হই!'

সমস্ত বুকটা ভেতর থেকে ফুলে উঠতে থাকে। অসহায়ভাবে সামনের নোংরা সিঁড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে মাথার ওপরে দেয়ালে একটা মাকড়সার জাল বাতাসে দুলছে। অসীম বেদনায় নিজেকে মনে হয় সম্পূর্ণ একাকী, যেন কোথাও কেউ নেই তার। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে ভাঙ্গা জানালার ফাঁকের ওপর নজর পড়ে, সেখান দিয়ে যদি লাফিয়ে পড়ে? সেখান দিয়ে যদি না সম্ভব হয়, সিঁড়ির ওপর হতে কিংবা জানালা দিয়ে তো সে লাফ দিয়ে পড়তে পারে! তাদের জব্দ করবার জন্যে যদি সে আত্মহত্যাই করে, তখন…তখন নিশ্চয়ই তারা বুক চাপড়াতে থাকবে! ওপর থেকে নীচে সবেগে সে লাফিয়ে পড়ল। সে স্পষ্ট শুনতে পায়, ওপরের দরজা কারা যেন সশব্দে খুলে ফেলল…চারদিক থেকে কাতর আর্তনাদ উঠছে 'পড়ে গিয়েছে! কি সর্বনাশ! কি হবে?' নীচে চারদিকে পায়ের আওয়াজ হচ্ছে…এইবার তার মা-জননী আর বাবা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে তার দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে স্পষ্ট শুনল, বাবাকে ভর্ৎসনা করে মা-জননী কাঁদছে: 'তোমারই দোষে ছেলেটা আত্মহত্যা করলো…তুমিই…হাঁ… তুমিই ওকে মেরে ফেলেছো!' তার বাবা সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে তার মৃত-দেহের পাশে নতজানু হয়ে পাথরে মাথা ঠুকছে আর কাঁদছে: 'উঃ, কি পাপিষ্ঠ আমি…কি ঘোর পাপিষ্ঠ আমি!' সেই কাতর কান্না দেখে, তার সঞ্চিত বেদনার ভার যেন কমে আসতে থাকে, সে প্রায় আর একটু হলেই তাদের ক্ষমা ক'রেও ফেলত, কিন্তু কি দরকার? এই শাস্তি তাদের প্রাপ্য…সে আবার আপনার মনে তার কল্পিত প্রতিশোধের চিত্র এঁকে চলে…

সমস্ত কাহিনী যখন নিঃশেষে বোনা শেষ হয়ে গেল, তখন জাঁ-ক্রিস্তফ দেখে, কখন সিঁড়ির নীচ থেকে সে সিঁড়ির ওপর ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে সিঁড়ির নীচের দিকে সে একবার তাকিয়ে দেখল, কিন্তু লাফিয়ে আত্মহত্যা করবার বাসনা আর তার নেই। বরং সেকথা ভাবতেই ভয়ে তার দেহ ঈষৎ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং যদি কোন ক্রমে পড়েই যায়, তার জন্যে ধার থেকে সরে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মনে হলো, সে যেন খাঁচায়-বন্দী পাখি · খাঁচার গায়ে মাথা ঠুকে মরা ছাড়া তার আর করবার কিছুই নেই। সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেটে জল ঝরে পড়তে লাগল। সে কেঁদেই চলে। কাঁদে আর ধূলি-মলিন হাত দিয়ে চোখ মুছতে থাকে। ধুলোয় আর চোখের জলে সমস্ত মুখখানা ময়লা হয়ে ওঠে।

কিছুতেই সে কান্না থামে না। কাঁদে আর চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, যদি সেভাবে অন্ততঃ কান্না ভুলে থাকবার মতো কিছু দেখতে পায়। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে মাকড়সার জালের দিকে নজর পড়ে, মাকড়সাটা জালে চলাফেরা শুরু করেছে। মুহূর্তের জন্যে সেই দৃশ্যে তার কান্না থেমে যায়। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই, আবার কাঁদতে শুরু করে। তবে কান্নার পেছনে যেন আগের আবেগ আর তেমনভাবে অনুভব করে না। নিজের কান্নার আওয়াজ কান পেতে শোনে, অসাড়ের মতন কেঁদেই চলে। কিছুক্ষণ পরে নিজেই ভেবে ঠিক করতে পারে না, কেনই বা সে এত কাঁদছে। সিঁড়ি থেকে সরে গিয়ে জানালার ধারে চুপটি ক'রে বসে একমনে মাকড়সার দিকে তাকিয়ে থাকে। কুৎসিৎ লাগে অথচ সেদিক থেকে দৃষ্টিও ফেরাতে পারে না।

জানালার নীচে বাইরে বয়ে চলে রাইন নদী…বাড়ির দেয়ালের গায়ে তরঙ্গের স্পর্শ লাগিয়ে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে নদী। ওপরে চলমান আকাশ, নীচে নদী, দেয়ালের জানালাটা যেন মাঝখানে ঝুলে আছে। জানালার গরাদে মুখ লাগিয়ে সে বাইরের নদীর দিকে তাকিয়ে দেখত…সহসা মনে হয়, আজ নতুন ক'রে সেই পরিচিত নদীকে যেন দেখছে। বেদনার বিশেষ সার্থকতা সেখানেই, বেদনার স্পর্শে মানুষের ইন্দ্রিয় পায় নতুন তীক্ষ্ণতা, নতুন চেতনা। পুরনো স্মৃতির প্রাঙ্গণ ধৌত ক'রে দিয়ে অশ্রু এনে দেয় দৃষ্টিতে নতুন সজীবতা। গৃহ-প্রান্তবর্তী সেই নদী বালকের আশৈশব বন্ধু। কোনদিন বালক তাকে নদী বলে দেখে নি, তার কাছে সে নদী ছিল জীবন্ত প্রাণী অপরূপ, অদ্ভুত এক জীবন্ত সত্বা: তার আসে পাশে যে-সব প্রাণী ঘুরে বেড়ায়, তাদের অপেক্ষা শতগুণ শক্তিমান, শতগুণ জীবন্ত, অনির্বচনীয়, মহা-প্রবল! আজ যেন তাকে আরো বিচিত্র বলে তার মনে হয়। আরো ভালো ক'রে তাকে দেখবার জন্যে বালক গরাদের ভেতর হতে মুখ বার ক'রে দেখতে চেষ্টা করে। কোথায় চলেছে নদী? নিত্য কল কল শব্দে কি কথা সে বলে চলেছে? কি সে চায়? তাকে দেখলেই মনে হয়, সে মুক্ত, বন্ধনহীন…যে-পথে চলেছে, সে-পথ সম্বন্ধে এতটুকু ভ্রান্তি তার নাই…কেউ তার গতি রোধ করতে পারে না…দুর্নিবার, চিরমুক্ত। সারাদিন, সারারাত, বৃষ্টিই আসুক আর সূর্যই উঠুক, যে গৃহের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে, তাতে আনন্দই থাকুক বা বেদনাই পুঞ্জীভূত হোক, তাতে তার কিছুই এসে যায় না, যেন সুখ বা দুঃখ বলে কোন কিছুই সে জানে না, জানবার প্রয়োজন নেই তার…আপনার গতির আনন্দে আপনি মত্ত হয়েই বয়ে চলেছে। হায়! যদি ঐ নদীর মতন অবাধে প্রান্তর বেয়ে, অমনি নৃত্য-চপল ছন্দে তীরবর্তী উইলোদের

সরস ক'রে, রঙিন-উপলখণ্ডের অথবা অমলিন বালুশয্যার উপর দিয়ে অমনি কলোচ্ছ্বাসে সে বয়ে যেতে পারত ! কোন ভাবনা নেই, কোন বেদনা নেই, কোন বাধা নেই, চির-মুক্ত, নিত্য-প্রবহমান !···

ওপরের বাতায়ন হতে বালক লোভাতুর আকুল দৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে : সর্ব-অন্তঃকরণ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করে···মনে হয়, যেন সেই নদীর চলমান জলধারার সঙ্গে সে-ও ভেসে চলেছে···তার গতির সঙ্গে সে যেন এক হয়ে মিশে গিয়েছে : চোখ বুঁজে দেখে, চারদিকে রঙের খেলা—সবুজ, নীল, হলদে নানা রঙের সব ছায়া আর সূর্যকিরণ পরস্পর পরস্পরকে ধরবার জন্য যেন ছুটে বেড়াচ্ছে··· দেখতে দেখতে সেই সব অদৃশ্য ছায়াবর্ণ কল্পনায় কায়া ধরে উঠতে থাকে···দূর-প্রসারী প্রান্তর···ঘন সবুজ শস্যে ভরে আছে · নবোদ্ভিন্ন তৃণ আর বনলতার গন্ধ নিয়ে মৃদু বাতাস শস্যক্ষেত্রকে আন্দোলিত ক'রে বয়ে চলেছে। চারদিকে ফুল, অজস্র অফুরন্ত··· সর্ষে ফুল, ভায়োলেট, পপি, নানান্ রঙের নানান্ বনফুল। কি সুন্দর ! কি অপরূপ ! তাদের সুবাস যেন নাকে এসে লাগে ! ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে বাতাস ! ঐ ঘন সবুজ ঘাসের শয্যায় যদি শুয়ে থাকতে পারত !···পালে-পার্বণে উৎসবের দিনে তার বাবা রাইন-দেশের সুরা পরিবেশন করতো, সে-সুরা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার যেমন মধুর আবেশ লাগত, আজ সহসা এই বাতায়নে স্বপ্নের খেলা খেলতে খেলতে তেমনি আবেশ তাকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসে—তার ভাল লাগে। তেমনি বয়ে চলে নদী···কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে যায় নদী-তীরের দৃশ্য···কল্পনায় জেগে ওঠে আর-এক নতুন দেশ, নতুন গ্রাম · তীরে নতুন সব গাছ···অসংখ্য ডাল-পালা নদীর জলে নুইয়ে পড়েছে···ছোট ছোট হাতের মতন গাছের সবুজ ডালগুলো যেন নদীর জলে হাত ডুবিয়ে খেলা করছে···গাছের ফাঁক দিয়ে নদীর জলে গ্রামের ছায়া এসে পড়েছে···সাইপ্রাস-গাছ আর সমাধি-ক্ষেত্রের ছোট ছোট শাদা ক্রুশগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে···ক্রমশঃ গ্রামকে ছাড়িয়ে দূরে তার দৃষ্টি চলে যায়···সমুন্নতশির পাহাড় একটার পর একটা দাঁড়িয়ে আছে···গভীর অন্ধকার গুহা···গুহা-মুখকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে ঘন আঙুর-লতার বন···তার একপাশে পাইনের জঙ্গলের ভিতর ভগ্ন জীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাসাদ···ক্রিস্তফ তাদের ছাড়িয়ে আরো দূরে চলে যায়··· আবার দেখা দেয় সেই মুক্ত প্রান্তর, ঘন সবুজ শস্য, উড়ন্ত পাখির দল···এবং সেই চিরপরিচিত সূর্য।···

বিপুল নীল দেহ নিয়ে ধীরে রাইন বয়ে চলেছে, যেন ছেদহীন একটিমাত্র চিন্তার ধারা···কোন তরঙ্গ নেই, কোন বিক্ষোভ নেই, শান্ত, স্নেহ-মসৃণ। তাঁ-

ক্রিস্তফ দুই চোখ বন্ধ ক'রে থাকে ; চোখে দেখার অপেক্ষা সে কান পেতে আরো অন্তরঙ্গভাবে নদীকে ধরতে চায়। সেই নিরবচ্ছিন্ন মর্মর-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ পাত্রের মতন ভরে ওঠে মন ; আচ্ছন্ন, অবশ হয়ে আসে চেতনা। কেউ কি জানে, কোথায় বয়ে চলেছে এই অনাদি স্বপ্নের অনন্ত ধারা ? জাঁ-ক্রিস্তফ ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না ··তবে বুঝতে পারে, সে-স্বপ্নধারা প্রবল আকর্ষণে তাকেও টেনে নিয়ে চলেছে। অন্তরের সুগভীর আলোড়নকে আড়ালে রেখে ছুটে চলেছে অজস্র জলের অবারিত আকুল গতি অতি দ্রুত ছন্দে। এবং সেই ছন্দকে আশ্রয় ক'রে জেগে উঠছে সঙ্গীত, অবলম্বন-দণ্ডকে আশ্রয় ক'রে যেমন জেগে ওঠে আঙুরলতা— জাঁ ক্রিস্তফ কান পেতে শোনে সে-সঙ্গীত, নদীর জল-মর্মরে শোনে পিয়ানোর মধুর আলাপ, বেহালার করুণ কান্না, বাঁশীর কোমল আমন্ত্রণ।···কখন অদৃশ্য হয়ে যায় নদীকূল···সঙ্গে সঙ্গে নদীও হয়ে যায় অদৃশ্য ভেসে আসে এক মায়াময় ছায়াময় সুকোমল গোধূলি-লোক···অস্থির আবেগে কাঁপতে থাকে ক্রিস্তফের অন্তর : সেই গোধূলি-আলোকে তার চোখের সামনে কাদের মুখ ভেসে ওঠে ? মাথায় একরাশ বাদামি-রঙের চুল···ছোট্ট একটি মেয়ে···দুষ্টুমি ভরা আঁখি, তাকে ডাকছে, দুষ্টুমি ক'রে অতি ধীরে চুপি চুপি···ম্লান বিবর্ণ-মুখ একটি বালক দুটি সকরুণ নীল আঁখি তুলে যেন তারই দিকে চেয়ে আছে···আশেপাশে আরো অনেক মুখ···কেউ হাসছে···কেউ বা বিচিত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে···সে দৃষ্টিতে সে কুণ্ঠিত লজ্জিত হয়ে পড়ে—স্নেহ মাখানো আর বিষাদের ছোঁয়া লাগানো দৃষ্টি, অন্তর্ভেদী কিন্তু যাতনা বিজড়িত, যেন সারমেয়র চোখ।

এবং তাদের পাশেই ফুটে ওঠে আর একটি নারী-মুখ, সুন্দর ম্লান, ঘন কালো কেশগুচ্ছ, দৃঢ় সম্নিদ্ধ অধর, দীর্ঘ আয়ত চোখ—এত দীর্ঘ যে মুখের আর সব বৈশিষ্ট্য তাতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে···কি গভীর আকুলতায় জাঁ-ক্রিস্তফের দিকে চেয়ে আছে···সে-আকুলতা যেন তার মর্মমূল পর্যন্ত বিদ্ধ ক'রে যায় তারই পাশে জেগে ওঠে আবার আর-একটি মুখ : সকলের চেয়ে যেন প্রিয়, ঈষৎ-ভিন্ন অধর, দুটি স্বচ্ছ সুনীল নয়ন তুলে তারই দিকে হেসে চেয়ে আছে···সে-হাসির স্নিগ্ধ কারুণ্যে জাঁ-ক্রিস্তফের দেহ-মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়···নিমেষে জাগিয়ে তোলে কি এক অনির্বচনীয় মাধুরী···কি মাধুরী আছে ভালোবাসায় ! ওগো, অমনি ক'রে তুমি আবার হাস ! অমনি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে থাক ! চলে যেও না ! ওগো যেও না !···হায় ! কোথায় চলে গেলে ?···কিন্তু অন্তর ভরে রেখে গেলে একি অবিস্মরণীয় মাধুরী···দুঃখ, বেদনা, কোন ক্ষুদ্রতার কোন ভার নেই, কোথাও কিছু

গ্লানি আর পড়ে নেই! শুধু আছে স্বপ্ন, বাতাসের মতো বিদেহী স্বপ্ন…এ কি সব ঘটে গেল? কোথা হতে শিশুর অন্তরে জেগে উঠল এই মধুর বেদনার স্বপ্ন-মিছিল? কোনদিন পৃথিবীতে সে তো তাদের কাকেও দেখে নি…অথচ মনে হয়, সে যেন তাদের ভাল করেই জানে, চেনে। কোথা হতে তারা এল? সৃষ্টির কোন্ বিস্মৃত গহ্বরের নিগূঢ় অন্তস্তল হতে?…একদা যা ছিল, তারই সংবাদ কি এরা বহন ক'রে আনল? না, একদা যা হবে, তারই সংবাদ পূর্বাহ্নে দিয়ে গেল?…

অবশেষে খেলা শেষ হয়ে আসে, একটি একটি ক'রে সব স্বপ্ন-কাহিনী ফুরিয়ে যায়। আবারও চোখের সামনে ভেসে ওঠে জোয়ারে দুকূল-প্লাবী গৃহান্তরালবর্তী সেই পরিচিত নদী চারদিকের মাঠ ঘাট ভাসিয়ে দিয়ে তরল গাম্ভীর্যে ধীরে, এত ধীরে বয়ে চলেছে, মন হচ্ছে যেন স্থির অচল। এবং দূরে, বহু দূরে, দিগন্ত রেখার কোলে ইস্পাত-নীল আলোর মত চোখে পড়ে জলময় একটা কম্পমান রেখা—সাগর। তারই উদ্দেশে ছুটে চলেছে নদী। নদীরই জন্যে সাগর যেন এগিয়ে আসছে। সাগরের বুকে জেগেছে কামনার তরঙ্গ। সাগর যে নদীকেই চায়! সেই মিলনের মহাসঙ্গীত বাতাসকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে…জল তরঙ্গে বাজে উন্মাদ নৃত্যের ছন্দ—সে ছন্দ যেন বিজয়ীর মতন বিশ্বকে দেয় দোলা…মুক্ত বিহঙ্গমের মতন উধাও মহাশূন্যে ছুটে চলে মুক্ত মন…তার আলোর-মত্ত সঙ্গীতে ভরে যায় শূন্য দিগঙ্গনা…আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই বিশ্ব-ভুবনে! ওগো মহানন্দ, অনন্ত, অপার…!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। নিঃশব্দে নেমে আসে সন্ধ্যা। সামনের সোপানাবলী অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। বাইরে নদীর জলে ধীরে পড়তে থাকে একটি দুটি ক'রে বৃষ্টির বিন্দু, নদীজলে ক্ষণিকের বৃত্ত এঁকে নদীজলেই যায় অদৃশ্য হয়ে। মাঝে মাঝে আধ-অন্ধকারে স্রোতজলে ভেসে আসে ভগ্ন বৃক্ষ-শাখা, স্রোতজলে নীরবে আবার ভেসে চলে যায়। সামনে মৃত্যু-জাল বিস্তার ক'রে শিকারের আশায় যে মাকড়সাটি এতক্ষণ বসেছিল, নিরাশ হয়ে দূরে জালের প্রত্যন্ত দেশে যায় সরে। ছোট্ট ক্রিস্তফ তখনও বাতায়নের বাইরে মুখ বের ক'রে বসে থাকে। ম্লান, বিবর্ণ মুখ ধুলোয় মলিন হয়ে এসেছে; কিন্তু অন্তরে তার ধীরে ধীরে উদিত হচ্ছে আনন্দের সূর্য। তারই স্নিগ্ধ উত্তাপে সেইখানেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

৩

E la faccia del sol nascere ombrata

Purgatorio, xxx.

অবশেষে তাকে হার মানতেই হয়। দুরন্ত প্রতিবাদ আর দুর্দান্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও, প্রহারই জয়ী হলো, তার সমস্ত অনিচ্ছা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। প্রতি-দিন সকালে তিন ঘণ্টা এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা ক'রে পিয়ানোর সামনে তাকে বসতে হতো। আনন্দের, স্বপ্নের উৎস পরিণত হলো নির্যাতনের যন্ত্রে। ক্লান্তিতে অঙ্গ অবশ হয়ে আসত, তবুও মনকে সজাগ ক'রে রাখতে হতো, দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রু-বিন্দু গড়িয়ে পড়ত, সমানে সেই শাদা আর কালো পর্দাগুলোর ওপর ছোট্ট দু'টি হাত চালিয়ে যেতে হতো…শ্রান্তিতে, হিমে আঙুল অবশ হয়ে আসত, কিন্তু থামবার উপায় ছিল না, থামলেই কিংবা ভুল পর্দায় আঙুল পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ উদ্যত রুলার সবেগে এসে পড়ত। রুলারের আঘাতের চেয়েও কঠিন লাগত নির্দয় শিক্ষকের ক্রুর কুৎসিত ভর্ৎসনা। বালকের মনে সন্দেহ জাগত, বোধ হয় সে সত্যিই সঙ্গীতকে ঘৃণা করে। অথচ সমস্ত শ্রান্তির পেছনে কোথা হতে একটা আকুল আগ্রহও সে অনুভব করতো,—মেলশিয়রের প্রহারের ভয়ের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই ছিল না। এই সংগোপন আগ্রহের পেছনে ছিল তার ঠাকুরদার কতগুলো কথা। তাকে সেইভাবে কাঁদতে দেখে একদিন বৃদ্ধ গম্ভীর-ভাবে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, সঙ্গীত হলো চিরসুন্দর সাধনার বস্তু, আজ সে সেই সঙ্গীতের জন্যে যে দুঃখ বেদনা পাচ্ছে, তা কখনও ব্যর্থ হবে না, একদিন জীবনের গৌরবের মধ্যে তার পরিপূরণ হয়ে যাবেই। বৃদ্ধ কোনদিন জাঁ-ক্রিস্তফকে বালক বলে অবজ্ঞা করতেন না। যখনই তার সঙ্গে আলাপ করতেন, তখনই তাকে পুরো মানুষ হিসেবেই ধরে নিতেন। সুখ দুঃখের প্রতি শিশু-বয়সের যে নির্লিপ্ততা থাকে, আর থাকে সদাজাগ্রত গর্ববোধ, তার প্রতি বৃদ্ধের এই যে সানুজ্ঞ স্নেহ প্রদর্শন তার জন্য ক্রিস্তফ মনে মনে এই বৃদ্ধকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাই বৃদ্ধের এই সহজ স্বচ্ছ আশ্বাসের বাণী সংগোপনে তার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

নিজের সম্বন্ধে যে সুমহান্ ধারণা সে নীরবে অন্তরে পোষণ করত, বৃদ্ধের এই আশ্বাসে সে তারই পূর্ণ সমর্থন পেল। যত বিরোধিতাই করুক, সঙ্গীত-শিল্পের প্রতি তার মন যত বীতরাগই হোক্, সুরের যে মূর্ছনা তার অন্তরকে আপ্লুত ক'রে রাখে সে যেন তাতেই বন্দী হয়ে থাকে।

জার্মানীর অন্য সব শহরের মতন তাদের শহরেও একটা থিয়েটার ছিল, যেখানে অপেরা, কমেডি, ছোট ছোট নাটক, বড় নাটক, প্রহসন সব কিছুই অভিনীত হতো। প্রত্যেক সপ্তাহে তিন দিন ক'রে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত অভিনয় চলতো। বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল প্রত্যেকটি অভিনয় দেখতেন, রঙ্গমঞ্চের প্রত্যেক অভিনয়ে ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। একদিন তিনি সঙ্গে ক'রে জাঁ-ক্রিস্তফকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অভিনয়ের কয়েকদিন আগে, বৃদ্ধ কথায় কথায় ক্রিস্তফকে নাটকটির বিষয় সম্পর্কে গল্প ব'লে শোনান। জাঁ-ক্রিস্তফ সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু ভাল ক'রে বুঝতে পারল না, তবে এটুকু বুঝল যে, রঙ্গমঞ্চে একটা ভয়ঙ্কর কিছু সে দেখতে পাবে এবং দেখবার জন্যে তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে কিন্তু একটা অস্পষ্ট ভয়ও তাকে পেয়ে বসল, তবে সে-কথা প্রকাশ করল না। ঠাকুরদার মুখে শুনল, যে-নাটকটি তারা দেখতে যাবে, তার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের ব্যাপার আছে, রঙ্গমঞ্চের ওপর তুমুল ঝড় দেখা দেবে। জাঁ-ক্রিস্তফের ভয় হলো, অত কাছাকাছি যদি ঝড়ের বিদ্যুৎ তার গায়ে এসে লাগে! একটা বড়রকমের যুদ্ধও নাকি হবে, সে-যুদ্ধে সে যদি জড়িয়ে পড়ে? অভিনয়ে যাবার আগেরদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আগামী দিনের কথা ভাবতে ভাবতে তীব্র আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসল, না-জানি কি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেই গিয়ে পড়বে। পর দিন সকালে সে মনে মনে প্রার্থণা করল, যদি কোন কারণে তার ঠাকুরদার থিয়েটারে যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে, ভালই হয়। কিন্তু বিকেলে যখন থিয়েটারের যাবার লগ্ন আসন্ন হয়ে উঠল, অথচ ঠাকুরদার দেখা নেই, তখন সে, আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে উঠল। বারেবারে জানালায় গিয়ে মুখ বাড়িয়ে পথে চেয়ে দেখে। অবশেষে বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হলেন। এবং তারা থিয়েটারের জন্য পথে বেরিয়ে পড়ল। জাঁ-ক্রিস্তফের বুক ঘন ঘন কেঁপে ওঠে, কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে, সমস্ত জিভ আড়ষ্ট বোধ হয়, একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারে না।

এতদিন ধরে বাড়িতে যে রহস্যালোকের কথা সে শুধু গল্পেই শুনেছে, আজ সেই রহস্যালোকের ভিতরে সে প্রথম প্রবেশ করবে। দেখতে দেখতে তারা তার দ্বার-প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। পাছে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়, এই ভয়ে জাঁ-

ক্রিস্তফ প্রাণপণ জোরে ঠাকুরদার হাত ধরে রইল। থিয়েটারের দরজার সামনে বৃদ্ধের সঙ্গে কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর দেখা হলো এবং তারা হেসে কি সব বলাবলি করল। জাঁ-ক্রিস্তফ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ভেবে পায় না, এ হেন ভীষণ সময়ে এরা কি ক'রে অমন হেসে কথা বলে চলেছে!

অর্কেষ্ট্রার পিছনে প্রথম সারিতে বৃদ্ধ তাঁর নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। সামনের রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে তিনি অর্কেষ্ট্রাদলের একজন বাদকের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। সেখানে বৃদ্ধের অসীম প্রতিপত্তি, সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সবাই বৃদ্ধকে সমীহ ক'রে চলে, বৃদ্ধের কথা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে এবং বৃদ্ধ তা ভাল করেই জানতেন এবং তার সুযোগ নিতে কোন দ্বিধা করতেন না। জাঁ-ক্রিস্তফ কান পেতে থাকে, কিন্তু কিছুই যেন স্পষ্ট ক'রে শুনতে পায় না। মুহূর্ত কয়েক পরে যে সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে ব'লে তার ঠাকুরদার মুখে শুনেছিল, তারই সম্ভাবনার আতঙ্কে তার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তা ছাড়া, সেই রঙ্গমঞ্চের অপরূপ সজ্জাসমারোহ, প্রেক্ষাগৃহের সেই সুবিপুল বৈভব দেখে সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে সেই বিপুল জনসমারোহ দেখে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। সাহস ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পারে না, মনে হয় যেন সেই অসংখ্য লোকের দৃষ্টি তারই ওপর পড়েছে। মাথার টুপীটা দুই জানুর মধ্যে চেপে ধরে স্থির দৃষ্টিতে সামনের আলোক-উজ্জ্বল রহস্য যবনিকার দিকে চেয়ে থাকে।

এমন সময় পর পর তিনটি ঘণ্টা-ধ্বনি বেজে উঠল। ঠাকুরদা ভাল ক'রে নাক মুছে নিয়ে পকেট থেকে নাটকের সঙ্গীত-লিপির পুস্তিকাটি বের করেন। অপেরা দেখবার সময়, বৃদ্ধ সর্বদাই আগে নাটকের সঙ্গীত-লিপিটি সংগ্রহ ক'রে নিতেন এবং নিষ্ঠাসহকারে লাইনের পর লাইন মিলিয়ে দেখতেন, এবং তাতেই এমন মশগুল হয়ে থাকতেন যে, রঙ্গমঞ্চে কি ঘটছে, তা অনেক সময় তাকিয়েও দেখতেন না। অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠল। সঙ্গীতের শুরুতে জাঁ-ক্রিস্তফ যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। এই শব্দের জগৎ তার কাছে অতি সুপরিচিত, সে এই পৃথিবীরই বাসিন্দা, তাই সেই সঙ্গীতের মধ্যে সে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেল।

ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হলো। পেষ্টবোর্ড দিয়ে তৈরি গাছ আর নির্জীব অরণ্য-প্রাণী রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল। বালক বিমূঢ় আনন্দে চেয়ে দেখে, কিন্তু বিস্মিত হবার মতো কিছুই দেখতে পায় না। নাটকটির ঘটনাস্থল হলো পূর্ব-জগতের কোন দেশ। পূর্বাঞ্চলের বিচিত্র দৃশ্য-সংস্থান সম্বন্ধে বালকের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। তা ছাড়া, যে-কাব্যের ওপর নির্ভর ক'রে অপেরাটি রচিত, তার অবাস্তব

বিষয়-বস্তুর মধ্যে মানবীয় রক্ত-মাংসের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই ক্রিস্তফ প্রকৃতপক্ষে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না, চরিত্রগুলোকে আলাদা ক'রে চিনতে পারে না, একজনকে চিনতে গিয়ে অপরজনকে ভুল ক'রে বসে, বারবার ঠাকুরদার জামার কোণ টেনে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে, সেই সব প্রশ্ন থেকে জাঁ-মিচেল স্পষ্ট বুঝতে পারেন, বালক কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু তাই ব'লে তার আদৌ খারাপ লাগছিল না, একটা তীব্র কৌতূহল তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। সঙ্গীতাংশ হতে সে আপনার মনে একটা স্বতন্ত্র স্বপ্নজগৎ রচনা ক'রে নিয়েছিল, যার সঙ্গে চোখের সামনের রঙ্গমঞ্চের জগতের কোন সম্পর্কই ছিল না। তাই পদে পদে রঙ্গমঞ্চের বাস্তবতার সঙ্গে তার স্বপ্ন ঘটনার সংঘর্ষ বেঁধে যায়, তার অনুমানের বিপরীত এমন একটা কিছু ঘটে বসে, যাতে তার স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে যায়, নতুন ক'রে তখন আবার গড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু তাতে সে বিশেষ কিছু ক্ষুণ্ণও হয় না। রঙ্গমঞ্চে তার চোখের সামনে যে-সব চরিত্র আসে যায়, তাদের মধ্যে থেকে সে নিজের পছন্দমত কয়েকজনকে বেছে নিয়েছে, এবং নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শুধু তাদের গতিবিধি এবং পরিণতি লক্ষ্য ক'রে চলে। বিশেষ ক'রে একটি সুন্দরী নারী, তার বয়স সে ঠিক অনুমান ক'রে চলে। বিশেষ ক'রে একটি সুন্দরী নারী, তার বয়স সে ঠিক অনুমান ক'রে উঠতে পারে না: একরাশ দীর্ঘ কেশ, আয়ত দুই চক্ষু, নগ্ন পদ...তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। নাটক বা অভিনয়ের মধ্যে যেসব অস্বাভাবিক ত্রুটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, বালকের রসবোধে তা আদৌ আঘাত করে না। তার শিশু-চেতনায় অভিনেতাদের কুৎসিত ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুই ধরা পড়ে না। বৃহৎ-উদর, মাংসল অভিনেতাদের নিরর্থক অঙ্গ-ভঙ্গী, সারি-বদ্ধ কোরাসের মধ্যে নানা সাইজের দেহের বীভৎস বৈষম্য, বেমানান্ পরচুলার অসামঞ্জস্য, নায়িকার মুখে অতিরিক্ত মেক্-আপের কড়া পেনসিলের দাগ, কিছুই তার চোখে পড়ে না। প্রথম প্রণয়মুগ্ধ পুরুষ যেমন কামনার তীব্রতার মধ্যে প্রণয়িনীর ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুই দেখতে পায় না, তেমনি ক্রিস্তফের চোখে অভিনয়ের কোন ত্রুটিই ধরা পড়ে না। শিশুর অন্তরে যে স্বাভাবিক মায়াশক্তি থাকে, যার সহায়ে সে বাস্তবকে নিমেষে তার মনের রঙে রাঙিয়ে নিতে পারে, সেই অপরূপ শক্তির সহায়ে ক্রিস্তফ রঙ্গমঞ্চের সমস্ত বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতি আর বৈষম্যকে নিজের মতো ক'রে রূপান্তরিত ক'রে নেয়।

সঙ্গীতই এই অসাধ্যসাধনে তাকে সকলের চেয়ে বেশী সহায়তা করল। রঙ্গ-মঞ্চের সমস্ত দৃশ্যের ওপর তা যেন আবছায়ার এক মায়া রচনা ক'রে দিল, যার স্পর্শে সব কিছুই সুন্দর সুমধুর ও বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠল। সব কিছুকেই ভালোবাসবার

এক দুরন্ত সাধ অন্তরে জাগিয়ে তুলল এবং সম্মুখের বাস্তবতাকে পঙ্গু ক'রে দিয়ে যে-শূন্যতাকে সৃষ্টি করল, নিজের সৃজিত ভালোবাসার ছায়ামূর্তি দিয়ে তাকে আবার ভরিয়ে তুলল। নিজের অন্তরের সেই আবেগের আকুলতায় বালক যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নাটকের কথাবার্তা বা অভিনেতাদের অঙ্গ-ভঙ্গী তাকে বিব্রত ক'রে তোলে, তার সুর যেন কেটে যায়, তখন চোখ বন্ধ ক'রে থাকে, সাহস ক'রে তাকিয়ে দেখতে পারে না। ভেবে ঠিক করতে পারে না সেই ভাবে থাকা ঠিক হচ্ছে কি না, তাই ক্ষণে ক্ষণে লজ্জিত বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, শঙ্কিত হয়ে ওঠে, পাছে তার সেই যন্ত্রণার ব্যাপার লোকের কাছে ধরা পড়ে যায়। সাধারণ অপেরায় সচরাচর চতুর্থ অঙ্কে সেই অনিবার্য হৃদয়-বিদারক লগ্ন দেখা দেয়, যেখানে গায়ককে রঙ্গমঞ্চ কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দেবার এবং নায়িকাকে তারস্বরে মর্ম-বেদনা নিবেদন করবার জন্য চিৎকারের সুযোগ দেওয়া হয়। এই নাটকটিতেও ক্রমশঃ সেই হৃদয়বিদারক লগ্ন এগিয়ে এল। জাঁ-ক্রিস্তফের অন্তর বেদনায় ভেঙ্গে পড়ল; কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল; দু' হাত দিয়ে জোর ক'রে কণ্ঠ রোধ ক'রে রইল, চোখ ফেটে জল পড়বার উপক্রম হলো, হাত-পা হিম হয়ে এল। ঠাকুরদা পাশেই বসেছিলেন, আশ্চর্য! তার মধ্যে কিন্তু কোন ভাবান্তরই সে লক্ষ্য করল না। শিশুর সারল্য নিয়েই বৃদ্ধ অভিনয় দেখে যাচ্ছেন, মাঝে হৃদয়ানুভূতি আড়াল দেবার জন্য খুক খুক ক'রে দু'একবার কাসলেন। ভীষণ গরম লাগছে, ক্রিস্তফের অসহ্য লাগছে। বার বার তার মনে হচ্ছে, 'ওঃ, আর কতক্ষণ!' এমন সময় অভিনয় শেষ হয়ে গেল, হঠাৎ সেইভাবে কেন যে শেষ হয়ে গেল, তা জাঁ-ক্রিস্তফ বুঝে উঠতে পারল না। আবার ধীরে যবনিকা পড়ল; শ্রোতারা সব উঠে দাঁড়াল; স্বপ্ন-সৌধ ভেঙ্গে গেল।

রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দু'জন শিশু আবার ঘরমুখো পথ ধরল: একজন বৃদ্ধ আর একজন বালক। অপরূপ রাত্রি! চারদিক টলমল করছে জ্যোৎস্নার প্লাবনে! কেউ কোন কথা বলল না; উভয়েই স্মৃতিতে রোমন্থন ক'রে চলছিল। অবশেষে বৃদ্ধই জিজ্ঞেস করলেন: 'কিরে, কেমন লাগলো?'

জাঁ-ক্রিস্তফ হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না। তখনও পর্যন্ত সে মনে মনে তার আবেগের স্রোতে ভেসে চলছিল; কোন রকমে চেষ্টা ক'রে অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বললে: 'খুব ভাল!'

বৃদ্ধ খুশি হলেন। কিছুক্ষণ পরে যেন আপনার মনেই বলে উঠলেন:

'চমৎকার জিনিস—এই সঙ্গীত আর সুরের সৃষ্টি! ঐরকম অপূর্ব সঙ্গীত,

অপরূপ স্বপ্ন সৃষ্টি করা, তার চেয়ে গৌরবের আর কি থাকতে পারে? এই তো পৃথিবীর দেবতা!'

বৃদ্ধের কথায় বালকের অন্তর সহসা উচ্চকিত হয়ে ওঠে। সত্যিই তো! যে-বিস্ময় সে এই মাত্র দেখে এল, তা তো মানুষই তৈরি ক'রেছে! কই, এ কথা তো একবারও তার মনে হয় নি! যেন আপনা থেকেই হয়েছে, প্রকৃতির গাছপালা যেমন হয়ে থাকে, এ ভাবেই তো সে ধরে নিয়েছিল! তারই মতন একজন মানুষ এ সমস্ত সৃষ্টি ক'রেছে···একদিন সেও তো এমনি ক'রে সৃষ্টি করতে পারে! সেও তো একদিন সঙ্গীতে, সুরে এই ইন্দ্রজাল রচনা করতে পারে! জীবনে যদি কোন দিন সে তাই করতে পারে, অন্ততঃ একদিনের জন্যেও! 'তারপর···তারপর যা খুশি তাই হোক···মরতেও যদি হয় দুঃখ কি!'

আবেগ-আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে দাদুকে: 'এ সব যে তৈরি করেছে সে কে?'

বৃদ্ধ বলেন: 'বার্লিনে ফ্রাঁসোয়া মারি হাস্‌লার নামে একজন জার্মান শিল্পী আছেন, এ তাঁরি সৃষ্টি। যুবক হাস্‌লারের সঙ্গে আমার একবার আলাপ-পরিচয়ও হয়েছিল—'

জাঁ-ক্রিস্‌তফ উৎকর্ণ হয়ে শোনে। হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে: 'আর তুমি?'

বৃদ্ধ কেঁপে ওঠেন, বলেন: 'আমি, আমি···কি?'

'তুমিও ওরকম সৃষ্টি করেছ?'

ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বৃদ্ধ জবাব দেন: 'নিশ্চয়ই!' তারপর নীরব হয়ে যান। নীরবে কয়েক পা অগ্রসর হবার পর, আপনা হতে একটা দীর্ঘশ্বাস বৃদ্ধের বক্ষ আলোড়িত ক'রে বের হয়ে আসে। বালক অজ্ঞাতে তাঁর জীবনের এক বৃহৎ বেদনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। রঙ্গমঞ্চের জন্যে অপেরা ও সঙ্গীত রচনা করবার বহু বাসনা বহুকাল ধরে তিনি অন্তরে পোষণ ক'রে এসেছিলেন কিন্তু অনুকূল প্রেরণার অভাবে কোনদিনই তা আর সার্থক হয়ে উঠতে পারল না। এখনও পর্যন্ত তাঁর বাক্সে দু'এক অঙ্কের পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে, কিন্তু সেই রচনার সার্থকতা সম্পর্কে তাঁর মনে এতটুকু ভ্রান্তি নেই যে, বিচারের জন্য বাইরে কাউকেও তিনি দেখাবেন।

নীরবে দুজনে বাড়ি এসে উপস্থিত হলো। পথে কোন কথা কেউ আর উচ্চারণ করল না। রাত্রে দু'জনেই ঘুমোতে পারল না। ব্যর্থতার বেদনায় বৃদ্ধের অন্তর ভারাতুর হয়ে থাকে। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাইবেল খানি বুকে তুলে নেন। ওধারে জাঁ-ক্রিস্‌তফ বিছানায় শুয়ে বারবার ক'রে সন্ধ্যার অভিজ্ঞতাকে

মনের মধ্যে নেড়ে চেড়ে দেখে। যা কিছু দেখেছে শুনেছে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে আনতে চেষ্টা করে। এভাবে রোমন্থন করতে করতে সেই নগ্নপদ তরুণীর মূর্তি জেগে ওঠে। তন্দ্রায় চোখ বুঁজে আসতে আসতে সহসা কানে এসে যেন বাজে সন্ধ্যায় শোনা সঙ্গীতের একটা কলি··· অতি সুস্পষ্ট···যেন তার সামনে কেউ বাজাচ্ছে। সারা দেহ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। তন্দ্রা ভেঙ্গে সে লাফ দিয়ে বালিশের ওপর উঠে বসে। মাথায় ভ্রমর-গুঞ্জনের মতো সেই সঙ্গীতের কলি ঘুরতে থাকে। আপনার মনে বলে ওঠে: 'একদিন আমিও এইরকম সঙ্গীত রচনা করবো! সত্যি রচনা করতে পারবো কি?'

সেইদিন থেকে বালকের সর্বোত্তম কামনা হলো, আবার একদিন থিয়েটারে যাওয়া। মেলশিয়র বুঝতে পেরে তাকে বললে, যদি সে মন দিয়ে তার নির্দিষ্ট সঙ্গীত-পাঠ শেষ করতে পারে, তা হলে পুরস্কারস্বরূপ তাকে সামনের সপ্তাহে থিয়েটারে যেতে দেওয়া হবে। বালক উল্লসিত হয়ে নবীন নিষ্ঠায় পিয়ানো বাজাতে শুরু ক'রে দেয়। তার একমাত্র চিন্তা, কখন আবার সে থিয়েটারে গিয়ে বসতে পারবে। সপ্তাহের প্রথমদিকে সে শুধু গত-অভিনয়ের কথাই চিন্তা করল, সপ্তাহের শেষের দিকে সে-চিন্তা চলে গেল, তার পরিবর্তে এল নতুন বই: এবার কি দেখবে! যদি থিয়েটারের দিনে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, যদি কোন অসুখ দেখা দেয়! সে ভাবনার সঙ্গে তার মনে হতো যেন তিন চার রকমের অসুখের লক্ষণ তার দেহের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। কিছুতেই তা প্রকাশ করা চলবে না। অবশেষে যখন সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিন এসে উপস্থিত হলো, সকাল বেলা সে কিছু খেতেই পারল না। সারা দিন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। পঞ্চাশবার ক'রে ঘড়িতে সময় দেখে, সন্ধ্যা বুঝি আজ আর আসবে না। অবশেষে টিকিট-ঘর খুলবার প্রায় একঘণ্টা আগেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো, টিকিটের অভাবে যদি সীট্ না পায়! টিকিট-ঘর খুলতেই টিকিট কিনে ভিতরে প্রবেশ করল। দেখল, সেই বিরাট প্রেক্ষাগৃহে সে শুধু একাই বসে আছে। একটা নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ঠাকুরদার মুখে সে গল্প শুনেছিল দুই-একবার নাকি তেমন লোক হয় নি বলে অভিনয় আর হয় নি, কর্তৃপক্ষ টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ যদি আবার সেই রকম হয়: তাই উদগ্রীব হয়ে প্রবেশ-পথের দিকে চেয়ে থাকে, একজন দুইজন ক'রে মনে মনে গুনতে শুরু ক'রে দেয়: 'তেইশ···এইবার চব্বিশ···পঁচিশ···উহু··পঁচিশ জনে কি আর থিয়েটার হয়! কই, আর যে কেউ আসছে না! আজ আর তাহ'লে লোক হচ্ছে না!' এমন সময়

তার দৃষ্টি পড়ল, উপরের বক্সে এবং ড্রেস-সার্কেলে কয়েকজন রীতিমত সম্ভ্রান্ত লোক এসে বসল। তাদের দেখে বালক যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে: 'এরকম সম্ভ্রান্ত লোকদের নিশ্চয়ই থিয়েটার না দেখে ফিরে যেতে বলতে পারে না। অন্ততঃ ওঁদের দেখবার জন্যে থিয়েটার করতেই হবে!' কিন্তু সে-যুক্তিও খুব অকাট্য বলে মনে হয় না। এক ভরসা যদি অর্কেস্ট্রা বাজাবার জায়গায় বাদকরা এসে বসে! তা হলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে যে, থিয়েটার হবে! কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ঠাকুরদা বলেছিলেন, একদিন এইরকম অবস্থায় বাদকরা এসে বসল, যথারীতি যবনিকাও উত্তোলিত হলো, কিন্তু থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা এসে জানাল, অনিবার্যকারণে আজ প্রোগ্রামের পরিবর্তন করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। ঈগল-পাখির দৃষ্টি নিয়ে সে সামনের অর্কেস্ট্রায় যেখানে বেহালা-বাদকের ষ্ট্যাণ্ডের ওপর আজকের সঙ্গীতের অনুলিপি লেখা ছিল, তা পড়ে দেখতে চেষ্টা করে। হাঁ, ঠিকই আছে, প্রোগ্রাম ঠিকই আছে। কিন্তু দু'মিনিট দেখতে-না-দেখতে, তার মনে হয়, হয়তো ভুল দেখে থাকবে, তাই আবার ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করে। না, সে ভুল দেখে নি! কিন্তু সঙ্গীত-পরিচালক তো এখনও এলেন না! অসুস্থ হয়ে পড়েন নি তো! যবনিকার অন্তরালে সহসা কিসের যেন চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, অস্পষ্ট কথাবার্তা আর সেই সঙ্গে দ্রুতপদক্ষেপ কানে আসে। বোধহয় কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে, বোধ হয় কোন বিরূপ বিঘ্ন ঘটে গিয়েছে! পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। সঙ্গীত-পরিচালক তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসেছেন। মনে হয়, এতক্ষণে সবই প্রস্তুত···কিন্তু, কৈ আরম্ভ তো হলো না! কি ব্যাপার? অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। বুকের ভিতরটা যেন সজোরে কেঁপে উঠল। অর্কেস্ট্রা আরম্ভ হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা এখন ক্রিস্‌তফ আনন্দের সাগরে ডুবে থাকবে, একমাত্র দুঃখ এত শিগ্‌গির শেষ হয়ে যাবে!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, একটা সঙ্গীত-অনুষ্ঠান ক্রিস্‌তফের অন্তরে তীব্রতর আলোড়ন এনে দিল। যে-প্রথম অপেরাটি শুনে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, তার রচয়িতা স্বয়ং মারি হাস্‌লার তাদের নগরে আসবেন। তাঁর নিজের সৃষ্ট একটা নতুন রচনার কনসার্ট তিনি নিজেই পরিচালনা করবেন। সারা শহর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। সেই নবীন সঙ্গীত-স্রষ্টাকে নিয়ে তখন জার্মানীতে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক চলছিল, একপক্ষকাল ধরে সর্বত্র তাঁর সম্বন্ধেই আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব বিতর্ক থেমে গেল। মেলশিয়র আর বৃদ্ধ জাঁ-

মিচেলের বন্ধুরা অষ্টপ্রহর তাঁদের কাছে এসে সেই সম্মানিত সঙ্গীত-স্রষ্টা সম্বন্ধে হাজার রকমের কৌতূহলী প্রশ্ন করেন ; তাঁর বিচিত্র সব রীতিনীতি আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গল্পে শহর ভরে ওঠে। বালক নিরুদ্ধ নিশ্বাসে এই সব কাহিনী শোনে। সেই মহাপুরুষ যে-মাটিতে এখন বিচরণ করছেন, যে-বাতাস তিনি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করছেন, ক্রিস্তফও সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেই একই বাতাস নিঃশ্বাসে নিচ্ছে, ভাবতে এক বিপুল গর্বে বালকের মন ভরে ওঠে।

গ্রাণ্ড ডিউকের অতিথি হয়ে হাসলার রাজপ্রাসাদেই এসে উঠেছিলেন। থিয়েটারে রিহার্সাল দেবার জন্য ছাড়া তিনি বাইরে আর কোথাও যেতেন না। তখন থিয়েটারে অবশ্য ক্রিস্তফের উপস্থিত থাকবার কোন উপায়ই ছিল না। অন্যসময় শিল্পী প্রিন্সের গাড়িতে চড়েই একটু-আধটু বেড়াতে বের হতেন। তাই শত ইচ্ছা সত্ত্বেও ক্রিস্তফ সেই ঈপ্সিত মহাপুরুষের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করতে পারল না। একবার শুধু তিনি যখন প্রিন্সের গাড়িতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, ক্রিস্তফ দূর হতে ক্ষণিকের জন্য তাঁকে দেখতে পায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার দু'ধারে পথচারীদের ধাক্কা সামলে অপেক্ষা ক'রে থাকার ফলে, সে শুধু হাস্‌লারের গায়ে যে ফার কোটটি ছিল, তাই দেখতে পেল। প্রাসাদের যে ঘরে তিনি আছেন, ক্রিস্তফ তার খবর নিয়ে প্রাসাদের সামনে রাস্তায় সেই ঘরের জানালার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দেখে সে-ঘরের জানালা বন্ধ হয়েই আছে, কারণ হাস্‌লার নাকি খুব বেলা করেই শয্যা থেকে ওঠেন, দিনের বেলা অধিকাংশ সময়ই তাঁর ঘরের জানালা বন্ধই থাকে। যারা খবরাখবর একটু বেশী রাখত, তারা বলে, হাস্‌লার নাকি দিনের আলো সহ্য করতেই পারেন না, চির-রাত্রির মধ্যেই নাকি তিনি বাস করেন।

অবশেষে একদিন সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত শুভলগ্ন জাঁ-ক্রিস্তফের জীবনে এসে উপস্থিত হলো, ক্রিস্তফ তার উপাস্য দেবতার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পারল। কনসার্টের দিন। সারা শহর ভেঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সু-উচ্চ রয়েল বক্সের দু'ধারে দুই মুকুটদণ্ড নিয়ে দু'জন সুসজ্জিত বালক-ভৃত্য দাঁড়িয়ে, আর তার ভিতর গ্রাণ্ড ডিউক সপারিষদ বসে আছেন। সমস্ত থিয়েটার-বাড়ি আলোকে, পুষ্পে সুশোভিত। রঙ্গমঞ্চকে ওকের শাখা আর পুষ্পমাল্যে সাজান হয়েছে। শহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, এমন সব বাজিয়েই আজ অর্কেস্ট্রায় যোগদান করেছেন। মেলশিয়রও আজ বেহালা হাতে এসেছে। বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল নিজে কোরাস পরিচালনা করছিলেন।

এমন সময় হাস্‌লার এসে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল, হাস্‌লারকে ভাল ক'রে দেখবার জন্য মহিলারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জাঁ-ক্রিস্‌তফ দু'চোখ দিয়ে যেন তাঁকে গিলতে লাগল : যুবকের মতন মুখখানা কিন্তু ক্লান্তির ছায়া যেন পড়েছে ; কপালের উপরে দু'ধার দিয়ে কেশ বিরল, বাকি মাথার চুল কিছুটা কোঁকড়ানো ; নীল চোখ দুটো ভাসা ভাসা ; ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফ, মুখখানা নমনীয় ভাবব্যঞ্জক। বেশ দীর্ঘদেহ কিন্তু দেহভঙ্গী মোটেই সুশ্রী নয়—যেন ক্লান্তির জন্যেই। হাস্‌লার যখন নিজের প্রোগ্রাম শুরু ক'রে কনসার্ট পরিচালনা করতে লাগলেন, তখন সঙ্গীতের ভাব অনুযায়ী তাঁর নমনীয় মুখে নিমেষে নিমেষে রেখায় পরিবর্তন হয়ে চলল ; তাঁর অঙ্গভঙ্গীতে, তাঁর মুখের বিচিত্র রেখায় রেখায় তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতের ছায়া এসে পড়ল। ক্রিস্‌তফ সারা মনপ্রাণ দিয়ে শোনে। কিন্তু হঠাৎ মাঝে মাঝে কিসের ধাক্কা লেগে সুরের স্নিগ্ধ ধারার সমতা যেন ছিন্ন হয়ে যায়, কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য সুরের মধ্যে ফুটে ওঠে, বালকের ভালো লাগে না। আপনার অজ্ঞাতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বাতাস অতিরিক্ত ভারী বোধ হয়। যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। স্থির হয়ে আসনে বসে থাকতে কষ্ট হয়, ছটফট করতে শুরু ক'রে দেয়। ভয় হয়, পাছে তার এই অস্বস্তির কথা জানতে পেরে আশেপাশের লোকেরা তার দিকেই চেয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সঙ্গীতের সুর ধাক্কা মেরে যেন তাকে আসন থেকে ঠেলে ফেলে, সে উঠে দাঁড়ায়, আবার বসে, বিরক্ত হয়ে সঙ্গীতের প্রতিবাদে এমন ভাবে ঘাড় নাড়ে আর হাত-পা ছোড়ে যে, পাশের আসনের শ্রোতা আহত হবার ভয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ক্রিস্‌তফ বিস্মিত হয়ে দেখে, ঘরভর্তি শ্রোতারা কিন্তু উল্লসিত হয়ে উঠেছে ; রচনার কৃতিত্বে নয়, অনুষ্ঠান রীতিমত জমে উঠেছে বলে যেন তারা খুশি। জলসার শেষে অভিনন্দন আর জয়ধ্বনির ঝড় শুরু হলো এবং জার্মান-প্রথা অনুযায়ী বিজয়ীর অভিনন্দনকে সম্পূর্ণ করবার জন্য শ্রোতাদের সেই উল্লাস-ধ্বনির সঙ্গে অর্কেস্ট্রার জয়-ঢাকও বিজয়োল্লাসে ঘন ঘন বেজে উঠল। সেই সমবেত বিজয়োল্লাসের উন্মাদনায় ক্রিস্‌তফের অন্তরও মেতে ওঠে, এক বিচিত্র গর্বে তার সারা অঙ্গ কাঁপতে থাকে, যেন তারই জন্যে এই জয়োল্লাস উঠছে। দেখে, সেই অভিনন্দনের উত্তরে হাস্‌লারের মুখ শিশুর মতন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, দেখে তার বড় ভাল লাগল। মহিলারা তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ফুল ছুঁড়তে থাকেন, পুরুষরা টুপী খুলে ঘন ঘন আন্দোলিত করে। সকলে রঙ্গমঞ্চের দিকে অধীর আগ্রহে ছোটে। সকলের

সাধ সেই সঙ্গীত-সম্রাটের সঙ্গে করমর্দন করবে। ক্রিস্তফ দেখল, একজন ভক্ত হাস্লারের হাতটি তুলে ধরে নিজের অধরের কাছে এনে চুম্বন করল, আর একজন ভক্ত সেই ফাঁকে টেবিল থেকে হাস্লারের রুমালটি তুলে নিয়ে সরে পড়ল। তারও ইচ্ছে করছিল, ছুটে রঙ্গমঞ্চে হাস্লারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু যদি সেই মুহূর্তে কোন রকমে সে সত্যিই হাস্লারের সামনে গিয়ে পড়ত, তা হলে লজ্জায় আর আবেগের তাড়নায় সেখান থেকে সে ছুটেই পালাত। তবুও সে এগোবার জন্য চেষ্টা করল কিন্তু তার ক্ষুদ্র দেহ নিয়ে সেই স্কার্ট আর চলন্ত পায়ের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারল না।

সৌভাগ্যবশতঃ কনসার্ট শেষ হয়ে যাবার পর তার ঠাকুরদা একদল বাদক সঙ্গে নিয়ে গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদে হাস্লারকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করবার জন্যে যাত্রা করলেন। সঙ্গে জাঁ-ক্রিস্তফকেও নিলেন। তখন রাত্রি গভীর। চারদিকে মশাল জ্বলছে। পথে সারাক্ষণ ধরে তাঁরা শুধু একটি কথাই বললেন—এই মাত্র যে সুর-সঙ্গীত তাঁরা শুনেছেন, তারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এভাবে তাঁরা প্রাসাদের সামনে এসে যখন উপস্থিত হলেন, ক্রিস্তফ লক্ষ্য করল, নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে তাঁরা হাস্লারের ঘরের জানালার তলায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের হাব-ভাব দেখে ক্রিস্তফ বুঝল তাঁদের যেন কোন সংগোপন মতলব আছে। উৎকণ্ঠিত আবেগে সে অপেক্ষা ক'রে থাকে। রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সহসা তাঁরা যে-যার যন্ত্র তুলে নিয়ে হাস্লারের রচনা থেকে বেছে বেছে বিখ্যাত কয়েকটি অংশ বাজাতে শুরু ক'রে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল প্রিন্সকে সঙ্গে নিয়ে হাস্লার মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে ভক্ত-যাত্রীর দল জয়োল্লাস ক'রে উঠল। সে-জয়োল্লাসের উত্তরে প্রিন্স এবং হাস্লার উভয়েই মাথা নত ক'রে প্রত্যভিবাদন জানালেন। একজন রাজভৃত্য প্রাসাদের ভেতর থেকে এসে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাল, প্রিন্স তাঁদের ভেতরে ডাকছেন। বড় বড় হলঘরের ভেতর দিয়ে, বৃহদাকার লৌহ-শিরস্ত্রাণ পরিহিত নগ্নদেহ পুরুষদের রঙিন প্রাচীর-চিত্রের তলা দিয়ে, লৌহ-বস্ত্র-পরিবৃত নানা নারীপুরুষদের প্রস্তর মূর্তির পাশ দিয়ে, তাঁরা এগিয়ে চলেন। পায়ের তলায় কার্পেট এত পুরু যে কোন পদশব্দই কানে আসে না। অবশেষে তাঁরা যে-ঘরে এসে উপস্থিত হলেন, ক্রিস্তফ দেখে আলোয় আলোয় যেন সেখানে দিন হয়ে আছে। সামনেই প্রশস্ত সব টেবিলে নানারকমের সুরার বোতল আর সেই সঙ্গে থরে থরে কত না উপাদেয় খাদ্য সাজান রয়েছে।

ঘরের ভিতর গ্রাণ্ড ডিউকও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ক্রিস্তফ তাঁকে দেখতেই

পেল না, কারণ, তার দৃষ্টি একমাত্র শুধু সুরকারের উপরেই নিবদ্ধ। হাস্‌লার আসন ছেড়ে উঠে এসে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন। ধীরে, অতি সাবধানে বেছে বেছে তিনি শব্দ প্রয়োগ করেন। কথা বলতে বলতে উপযুক্ত কথার অভাবে হঠাৎ থেমে যান, তার পর একটা উদ্ভট হেঁয়ালির মতন কিছু বলে সকলকে হাসিয়ে অসম্পূর্ণ উক্তির দায়িত্ব হতে কৌশলে নিজেকে রক্ষা করেন। টেবিলে খেতে বসবার সময় হাস্‌লার কয়েকজন বাদককে বেছে নিয়ে তাঁর পাশে স্থান দিলেন এবং বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের পরম সৌভাগ্য যে সঙ্গীত-সম্রাট তাঁরই মারফৎ অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। হাস্‌লার বৃদ্ধের বাজনার রীতিমত প্রশংসা করলেন এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেন: তিনি ভোলেন নি যে তাঁর রচনাকে যারা সর্বপ্রথম গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে একদিন জাঁ-মিচেল ছিলেন এবং তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে,—সে বন্ধু জাঁ-মিচেলেরই ছাত্র, তিনি তাঁর সম্বন্ধে বহু প্রশংসার কথা শুনেছেন। কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধের অন্তর ভরে ওঠে এবং আবেগের আতিশয্যে বৃদ্ধ এমন অতিরিক্ত আড়ম্বরে হাস্‌লারের স্তব করতে শুরু ক'রে দিলেন যে, ক্রিস্‌তফ লজ্জিতই হয়ে উঠল। কিন্তু হাস্‌লারের কাছে তা মোটেই অস্বাভাবিক বোধ হলো না, তিনি উপভোগই করলেন। অবশেষে বৃদ্ধ নিজের উচ্ছ্বাসের অরণ্যে যেন পথভ্রান্ত হয়ে ক্রিস্‌তফের হাত ধরে হাস্‌লারের কাছে উপস্থিত করলেন। হাস্‌লার হেসে বালকের দিকে চাইলেন এবং অন্যমনস্কভাবে তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে বালক তাঁর সঙ্গীতের ভক্ত এবং তাঁকে দেখবে বলেই রাত্রির পর রাত্রি জেগে কাটিয়েছে, বালককে কাছে টেনে নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। লজ্জায় আর আনন্দে বালক বাক-শক্তিহীন হয়ে যায়, সাহস ক'রে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পর্যন্ত পারে না। হাস্‌লার নিজের হাত দিয়ে তার চিবুক তুলে ধরেন। ক্রিসতফ বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় ক'রে তাকিয়ে দেখে। দেখে, দেবতার দু' চোখ স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে ভরা। সে-হাসির সংস্পর্শে বালকও হেসে ওঠে। হাস্‌লার তাকে দু' হাত দিয়ে বুকে টেনে নেন। এক অপরূপ আনন্দে বালকের চেতনা ডুবে যায়, দু' চোখ ভরে আনন্দাশ্রু বের হয়। এই সহজ সরল স্নেহ হাস্‌লারকেও মুগ্ধ করে, মমতায় তিনি বালকের শিরচুম্বন করেন। তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিবিড় স্নেহ। নানারকম হাসির গল্প উত্থাপন ক'রে বালককে হাসাতে চেষ্টা করেন। বিগলিত অশ্রুর ভিতর দিয়ে একটু একটু ক'রে বালকের মুখে ফুটে ওঠে নির্ভয় হাসি। দেখতে দেখতে বালক কখন সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, নির্ভয়ে হাস্‌লারের সব প্রশ্নের জবাব দেয়। অস্ফুট কণ্ঠে হাস্‌লারের কানে কানে তার কিশোর-মনের

সংগোপন সব দুরাকাঙ্ক্ষার কথা বলতে শুরু ক'রে দেয়, যেন তারা দু'জনে বহুদিনকার পরিচিত বন্ধু। বালক নিঃসঙ্কোচে জানায়, একদিন সে হাস্লারের মতোই অমনি বড় সঙ্গীতজ্ঞ হবে, তাঁরই মতো অপরূপ সঙ্গীত রচনা করবে, তার একমাত্র বাসনা সে ইতিহাসের বীরদের মতো একজন সত্যিকারের বীরপুরুষ হবে। কোথায় ভেসে যায় তার লজ্জা আর সঙ্কোচের বাঁধ, একান্ত সংগোপন সব কথা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় বলে চলে। আবেগের আকুলতায় এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, কি যে সে বলছে, তার কোন ধারণাই তার ছিল না। হাস্লার আনন্দে তার কলোচ্ছ্বাস শুনে চলেন। বলেন: 'যখন তুমি বড় হয়ে একজন সত্যিকারের বড় সঙ্গীত-রচয়িতা হবে, তখন বার্লিনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, কেমন? তখন আমি তোমাকে দিয়ে একটা কিছু করাবো!'

ক্রিস্তফ আনন্দে কোন উত্তরই দিতে পারে না।

হাস্লার উত্তরের জন্যে তাকে ক্ষেপাতে শুরু করেন:

'তাহলে তুমি আসতে চাও না? কেমন?'

ক্রিস্তফ তবুও মুখ ফুটে বলতে পারে না। তার বদলে পাঁচ ছ'বার জোরে ঘাড় দুলিয়ে হাঁ বলতে চেষ্টা করে।

'তাহলে তোমার সঙ্গে এই চুক্তি রইলো, কেমন!'

ক্রিস্তফ আগেকার মতন তেমনি ঘাড় দোলায়।

'তাহলে, একটা চুমু দাও!'

'ক্রিস্তফ দু' হাত দিয়ে সজোরে হাস্লারের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে।

'আরে আমাকে ভিজিয়ে দিলে দেখছি! ইস্! নাক দিয়েও যে কান্না ঝরতে শুরু করেছে!'

হাস্লার হেসে ওঠেন এবং ঈষৎ সচেতন ভাবেই নিজে বালকের নাক মুছিয়ে দেন। বুক থেকে নামিয়ে হাত ধরে তাকে একটা টেবিলের সামনে নিয়ে যান, নিজের হাতে কেক তুলে বালকের দুই পকেটে ভর্তি ক'রে দেন, বলেন: 'বেশ, এ কথাই রইল কেমন!'

ক্রিস্তফ আনন্দের সাগরে ডুবে যায়। সেই মুহূর্তে তার কাছে অবশিষ্ট পৃথিবীর যেন কেন অস্তিত্বই থাকে না। মনের মধ্যে সন্ধ্যার সব ঘটনার স্মৃতি যেন হারিয়ে যায়। যতক্ষণ সেখানে থাকে, নিবিড় অনুরাগে শুধু হাস্লারের প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু হাস্লারের একটা কথা সহসা তার মনকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলল। হাস্লার একটা গ্লাস হাতে তুলে

ধরলেন, কথা বলতে বলতে সহসা তাঁর মুখের রেখা শক্ত হয়ে উঠল, স্থির কণ্ঠে বললেন :

'আজকের দিনের এই আনন্দে আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদের শত্রুদের। যারা আমাদের শত্রু, কোনদিনই কোনমতেই তাদের ভুলে থাকা চলবে না। আমরা যে আজও পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই নি, তার জন্যে তাদের যে কোন ত্রুটির অভাব আছে, তা নয়। তারাও যদি নিশ্চিহ্ন না হয়ে গিয়ে থাকে তাতেও আমাদের ত্রুটির অভাব নেই। তাই আজ আমি এই গ্লাস তুলে এই কথাই প্রস্তাব করছি, জগতে এমন জাত আছে, যাদের স্বাস্থ্যপান আমরা করতে পারি না।'

এই স্বাস্থ্যপান-প্রস্তাবের অভিনব রীতিতে সকলেই উল্লসিত হয়ে অনুমোদন জ্ঞাপন করল এবং হেসে উঠল। তাঁর মুখের কঠিন রেখা আবার কোমল হয়ে গেল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রস্তাব আর অনুবর্তী উল্লাসে ক্রিস্তফের সমস্ত আনন্দ যেন সহসা নিভে গেল। অবশ্য তার উপাস্য বীর-পুরুষের কোন বিরূপ সমালোচনা করতে তার মন চাইল না, কিন্তু আজের এমন ক্ষণে তিনি যে-জাতীয় বিরূপ জিনিসের উল্লেখ করলেন, তাতে সে মনে মনে ক্ষুণ্ণই হলো। আজের এই অপরূপ মুহূর্তে, যা কিছু উজ্জ্বল, যা কিছু আনন্দময়, তাই শুধু ভাবতে ভাল লাগে, তাই শুধু ভাবা উচিত। কিন্তু এই বিরূপ চিন্তার ব্যথা বেশীক্ষণ তার মনে স্থায়ী হলো না, অন্তরের আনন্দের জোয়ারে তা কোথায় ভেসে চলে গেল। বিশেষ ক'রে তার ঠাকুরদা নিজের স্যাম্পেনের গেলাস থেকে তাকে পান করতে দিয়েছিলেন, স্যাম্পেনের মধুর আবেশে সেই ক্ষীণ আঘাতের রেখা কোথায় তলিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরবার পথে বৃদ্ধ অনর্গল বকে চললেন। হাস্লার যে তাঁকে প্রশংসা ক'রেছেন, সেই আনন্দে বৃদ্ধ উদ্বেল হয়ে ওঠেন। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ঘোষণা করেন, হাস্লার যে শুধু একজন প্রতিভাবান সঙ্গীত-রচয়িতা তাই নয়, তাঁর মতন প্রতিভা এক শতাব্দীর মধ্যে আর দেখা যায় নি। ক্রিস্তফ একটি কথাও বলল না। তার অন্তরে আজ ভালোবাসা যে অপরূপ উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছে, তাকে সে তার অন্তরের মধ্যেই অর্গলবদ্ধ ক'রে রেখে দেবে। হাস্লার তাকে চুম্বন ক'রেছেন, তাকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন! কি অসম্ভব ভাল তিনি! কত বড়, কত মহৎ!

শয্যায় আবেগে বালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে করতে আপনার মনে ভাবে : 'যদি দরকার হয়, আমি তাঁর জন্যে জীবন দিতেও পারি নিশ্চয়ই পারি!'

সেদিন রাত্রে সেই ক্ষুদ্র শহরের আকাশকে চকিতে আলোকিত ক'রে যে জ্যোতিষ্ক চলে গেল, ক্রিস্তফের জীবনের ওপর তা একটা স্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত ক'রে দিয়েই গেল। সারা শৈশব ধরে বালক হাস্লারের মূর্তিকে অষ্টপ্রহর চোখের সামনে ধরে রাখল এবং তাঁরই আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলবার জন্যে সেই ছয় বছরের মানুষটি সঙ্গীত রচনা করবার সঙ্কল্প করল। প্রকৃতপক্ষে, তার অজ্ঞাতসারে সে তার চেতনার প্রথম দিন থেকেই মনে মনে সেই সঙ্কল্পকেই অনুসরণ ক'রে চলে ছিল, সঙ্গীত রচনা যে কি বস্তু তার জ্ঞান জন্মাবার আগে থেকেই সে সঙ্গীত-রচনা ক'রে চলেছিল।

রক্তের মধ্যে সুর নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে, তাদের কাছে সবই সঙ্গীত। যা কিছু গতিবান, যা কিছু স্পন্দমান, যা কিছু সচল, কম্পমান,—সূর্যালোক-স্পন্দিত গ্রীষ্মের দিন, ঝড়ের কাঁদন-ভরা অন্ধকার নিষুতি রাত্রি, প্রদীপের কম্পমান আলোকের শিখা, দূর নক্ষত্রের জ্যোতির স্পন্দন, গর্জমান ঝঞ্ঝা, প্রভাতে-সন্ধ্যায় পাখির কূজন, পতঙ্গের লঘু পক্ষ-বিতাড়ন, বৃক্ষের পল্লব মর্মর, মানুষের কণ্ঠ, কখনো বা প্রেমসিক্ত কথন বা তিক্ত, ক্রুদ্ধ, প্রতিদিনের জীবনের অতি-পরিচিত সব শব্দ, দরজা বন্ধ হওয়া বা খোলার আওয়াজ, চলে-যাওয়া মানুষের পায়ের শব্দ, নিস্তব্ধ রাত্রে শিরায় শিরায় চলমান রক্তের গতির ছন্দ, যা কিছু নড়ে, চলে, কাঁপে, তাই সঙ্গীত। একমাত্র শুধু প্রয়োজন, তাদের শুনবার মতো কান। এই বিপুল ধরণীর অস্তিত্বের মহাসঙ্গীত জাঁ-ক্রিস্তফের অন্তরে আপনা থেকেই জাগিয়ে তোলে প্রতিধ্বনি, অনুরণন। যা কিছু সে দেখত, যা কিছু সে অনুভব করত, তার অজ্ঞাতসারে তাই তার অন্তরে সঙ্গীতের সুরে রূপান্তরিত হয়ে যেত। সে যেন নিত্য শব্দায়মান একটা মৌচাক। কিন্তু কেউই তা জানত না। সে-নিজেও না।

সচরাচর বালকেরা যেমন ক'রে থাকে, তেমনি ক্রিস্তফও সারাদিন ধরে আপনার মনে গুন গুন ক'রে চলত। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, কিংবা এক পায়ে লাফাতে লাফাতে, কিংবা ঠাকুরদার ঘরে মেঝেতে শুয়ে গালে হাত দিয়ে একমনে যখন ছবির বই দেখত, রান্নাঘরের কোণে নিজের ছোট্ট চেয়ারটিতে বসে যখন দিবাস্বপ্ন দেখত, যখনই যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ঠোঁট বন্ধ ক'রে আপনার মনে সে গুন্ গুন্ ক'রে সুর ভেঁজে চলত। লুইসা কর্ণপাতই করত না, কালেভদ্রে বিরক্ত হলে গোলমাল করতে নিষেধ করত শুধু।

যখন এই অর্ধ-তন্দ্রাভাব আর ভাল লাগত না, নড়ে চড়ে একটা কিছু করবার বাসনা জেগে উঠত, তখন সে সশব্দেই জেগে উঠত। গলা ছেড়ে সুরের ঝংকার

তুলত। নিজের সুবিধা মতো সে প্রত্যেক কাজের জন্য এক-একটা স্বতন্ত্র সুর নিজেই গড়ে নিয়েছিল। সকালবেলা স্নানের সময় জলে লাফিয়ে পড়বার একটা আলাদা সুর ছিল, কতকটা হাঁসের ডাকের মতো। পিয়ানোর সামনে টুলে গিয়ে বসবার সুর একরকম, আবার গানের কসরৎ শেষ ক'রে টুল ছেড়ে উঠবার সুর আর-একরকম, দ্বিতীয় সুরটি অবশ্য প্রথম সুরের অপেক্ষা ঢের বেশী আনন্দোজ্জল। খাবার টেবিলে লুইসা যখন স্যুপের পাত্রটি তার সামনে ধরত, তখন তার সুরে যেন ঢাক-ঢোল বেজে উঠত; আহার-অন্তে খাবার-ঘর থেকে যখন শোবার-ঘরে যেত, তখন গুরুগম্ভীর ছন্দে বিজয়-সঙ্গীতের মতো সুর কণ্ঠ থেকে নির্গত হতো; মাঝে মাঝে ছোট ভাই দু'টিকে নিয়ে সে শোভাযাত্রা ক'রে চলত, আগে-পিছু লাইন বেঁধে দাঁড়াত পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের জন্যে একটা ক'রে আলাদা সুর সে ঠিক ক'রে দিত, অবশ্য, সব চেয়ে ভাল সুরটি নিজের জন্যেই রেখে দিত। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার ছিল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যাপারের চরিত্র অনুযায়ী সে স্বতন্ত্র ক'রেই সুর তৈরি করত এবং একটার সঙ্গে অন্যটার কিছুতেই গোঁজামিল হতে দিত না। সেদিকে তার কড়া নজর ছিল। অবশ্য, সাধারণ লোকের কাছে সব সুরই প্রায় একইরকমের মনে হতো, সে ছাড়া আর কেউই এই সব বিভিন্ন সুরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল তা ধরতে পারত না।

একদিন ঠাকুরদার বাড়িতে ঘরের ভেতর সে সশব্দে পদচারণা করছিল; মাথা উঁচু ক'রে, বুক সোজা রেখে, পায়ের শব্দে তাল দিয়ে সেই ছোট্ট ঘরটার ভেতর ঘুরে একটা নতুন সুর তৈরি করছিল। কতবার যে সেইভাবে ঘুরপাক খেল, তার কোন হিসাবই ছিল না, এতটুকুও তার ক্লান্তিবোধ ছিল না। বৃদ্ধ তখন আয়নার সামনে দাঁড়ি কামাচ্ছিলেন। হঠাৎ একগাল সাবান-মাখা মুখ ফিরিয়ে বালকের দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং সুর-রচনার মাঝখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে জিজ্ঞেস করেন:

'ও কি সুর তুই গাইছিস?'

ক্রিস্তফ বলে, তা তো সে জানে না।

বৃদ্ধ বলেন: 'আবার গা দেখি!'

ক্রিস্তফ চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই আর মনে ক'রে উঠতে পারে না। তার সঙ্গীত যে বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, সেই গর্বে বালক বৃদ্ধের মুখ থেকে তার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার তারিফ আদায় করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং তার কণ্ঠস্বর যে কত মিষ্টি তার প্রমাণ হিসেবে পুরনো অপেরার একটা গান গেয়ে বৃদ্ধকে শোনায়। কিন্তু বৃদ্ধ তো তা শুনতে চান নি। যে-সুর নিয়ে সে খেলা করছিল,

বৃদ্ধ যে কেন তাকে আবার তাই গাইতে বললেন, তা ক্রিস্তফ বুঝতে পারল না। আপনার মনে যে কি সুর সে সৃষ্টি ক'রে চলেছিল, তা সে নিজেই জানত না। বৃদ্ধ তাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না, যেন তাকে আর লক্ষ্যই করছেন না, এমন ভাবে পাশের ঘরে চলে গেলেন, কিন্তু চলে যাবার সময় দরজাটি ঈষৎ-মুক্ত ক'রে রেখে দিলেন, যাতে বালক যখন আপনার মনে খেলা করতে করতে গান গাইবে, তখন যেন তিনি তা শুনতে পান।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, একদিন ক্রিস্তফ ঘরের সমস্ত চেয়ার টেনে এনে অর্কেষ্ট্রার বসবার মতো ক'রে সাজাল। এক নতুন সুরের খেলা তাকে পেয়ে বসেছে। থিয়েটারে যেসব সঙ্গীত সে শুনেছিল, তার টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে নিজের মতন ক'রে জুড়ে একটা সঙ্গীত সে রচনা ক'রে ফেলল। সঙ্গীত-পরিচালকদের যেমন মঞ্চের ওপর এগিয়ে আসতে দেখেছিল, দেখেছিল যেভাবে মাথা নাড়াতে ঠিক তেমনিভাবে এগিয়ে এসে, মাথা নেড়ে, সে নিজের সঙ্গীত নিজেই পরিচালনা করে। সামনের দেয়ালে বিটোফেনের একটা ছবি ছিল। নতমস্তকে বিটোফেনকে উদ্দেশ ক'রেই সে শেষ-অংশ গায়। পরিচালনা শেষ ক'রে নাচতে নাচতে পিছন ফিরেই দেখে, ঠাকুরদা ঈষৎ-মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হলো, বৃদ্ধ বুঝি তার কাণ্ড দেখে হাসছেন, লজ্জায় সে কাঠ হয়ে যায়। ছুটে জানালার কাছে গিয়ে কাঁচে মুখ রেখে বাইরে তাকিয়ে থাকে, যেন বাইরে বিশেষ কোন দৃশ্য সে একমনে দেখছে। বৃদ্ধ কিন্তু কোন কথাই বললেন না, ধীরে তার কাছে এসে তাকে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বন করলেন। ক্রিস্তফ বুঝল বৃদ্ধ তার কৃতিত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, কিন্তু ভেবে পায় না, তার ঠিক কোন্ বিশেষ বিষয়টির কৃতিত্ব বৃদ্ধকে স্পর্শ করেছে, তার নাট্য-প্রতিভা, না, সঙ্গীত-রচনা, কণ্ঠ-সঙ্গীত, না, নৃত্য! পরেরটাই তো ভাল. তার ঝোঁকও ওদিকেই।

এক সপ্তাহ পরে, এই ঘটনার স্মৃতি যখন বালকের মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন একদিন বৃদ্ধ রহস্যভরাকণ্ঠে তাকে জানালেন, একটা জিনিস আজ তাকে দেখাবেন। ডেস্ক খুলে একটা হাতে-লেখা সঙ্গীত-লিপির বই বার ক'রে পিয়ানোর ষ্ট্যাণ্ডের উপর খুলে ধরলেন। সেই স্বরলিপি দেখে ক্রিস্তফকে বাজাতে বললেন। জাঁ-ক্রিস্তফের কৌতূহল জেগে উঠল এবং চেষ্টা ক'রে মোটামুটি একরকম ঠিক বাজাল। স্বরলিপির বইটি হাতে লেখা, বৃদ্ধের নিজের হাতের লেখা অতি যত্নে গোটা ক'রে তিনি লিখেছেন। ক্রিস্তফ যখন বাজাল, বৃদ্ধ পাশে বসে

একটি একটি ক'রে পাতা উল্‌টিয়ে দিচ্ছিলেন। বাজানা শেষ হয়ে গেলে, বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন : 'বল্‌ তো দাদু, কি বাজালি ?'

ক্রিস্‌তফ পিয়ানোর পর্দায় এমন তন্ময় হয়ে ছিল যে, কি বাজাল তার কোন ধারণাই তার ছিল না। ঠাকুরদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল : 'তা তো জানি না!'

'ভেবে বল্‌!...সত্যি জানিস্‌ না, কি বাজালি তুই ?'

ক্রিস্‌তফ নিজের মনের ভিতর তাকিয়ে দেখে। হাঁ...হাঁ...অস্পষ্ট যেন মনে পড়ছে...কোথায় যেন এই সুর শুনেছে...কিন্তু কোথায় শুনেছে, তা ঠিক করতে পারে না। বৃদ্ধ হেসে ওঠেন !

'আবার ভেবে দেখ !'

ক্রিস্‌তফ ঘাড় নেড়ে জানায় : 'না, মনে পড়ছে না তো !'

কিন্তু না বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভিতর কি যেন একটা কথা মাথা তুলে জেগে উঠতে থাকে...এই সুর...এই সুর যেন...না, না, সেকথা ভাবতে তার সাহসে কুলোয় না...

'জানি না, ঠাকুরদা !'

স্নেহজড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলেন : 'হাঁরে মুখ্যু, নিজের তৈরি জিনিস, নিজে চিনতে পারলি নে ?'

মনের মধ্যে এই কথাই তার জেগে উঠছিল...সাহস ক'রে বলতে পারে নি... ঠাকুরদার মুখে শুনে তার বুক সজোরে কেঁপে উঠল। আনন্দের আবেগে চিৎকার ক'রে উঠল : 'দাদু দাদু গো !...'

বৃদ্ধের মুখ আনন্দের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বইটি তুলে নিয়ে একটি একটি ক'রে লাইন বালককে দেখান। বালক আপনার অজ্ঞাতে কিশোর-মনের খেলায় যেসব সুর সৃষ্টি করেছিল, বৃদ্ধ সংগোপনে তার স্বরলিপি ক'রে প্রথামত তাকে সাজিয়ে একটি সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন।

'এই দেখ, প্রস্তাবনা...মঙ্গলবার ঘরের মেঝেতে শুয়ে তুই যে সুর গাইছিলি... তারপর, এটা হলো বিস্তার...গত সপ্তাহে মনে আছে, আমি যখন দাঁড়ি কামাচ্ছিলাম, তোকে আবার গাইতে বললাম, কিন্তু তুই মনে ক'রে আর গাইতে পারলি না—। আর এইটে হলো তার মিহুয়ে সেদিন বিটোফেনের ছবির সামনে নেচে নেচে যা গাইছিলি। দেখ !'

বইটির প্রচ্ছদপত্রে এই রচনায় যে নামাকরণ বৃদ্ধ করেছিলেন, বড় বড় গথিক অক্ষরে তা লেখা রয়েছে :

'শৈশবের সুখ-স্মৃতি : আরিয়া, মিনুয়েতো, ভাল্‌সি এবং মার্সিয়া, অপেরা নং ১, জাঁ-ক্রিস্‌তফ ক্রাফট কর্তৃক রচিত।'

ক্রিস্‌তফ বিমুগ্ধ বিহ্বল হয়ে যায়। এত বড়একটা বই…এমন সুন্দর নাম… তারই নিজের সৃষ্টি! চোখের সামনে বড় বড় অক্ষরে তারই নাম…কোন কথা সে বলতে পারে না। শুধু সঙ্গীতের মতো গুঞ্জন ক'রে চলে : 'দাদু, দাদু গো!…'

বৃদ্ধ তাকে কোলের কাছে টেনে নেন। বৃদ্ধের জানুর ওপর বসে ক্রিস্‌তফ তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে। আনন্দের আতিশয্যে আরক্তিম কাঁপতে থাকে। নাতির থেকেও অধিক আনন্দ বৃদ্ধের সমগ্র অন্তরকে আপ্লুত ক'রে ফেলে। বৃদ্ধ নিজেকে যেন আর সম্বরণ ক'রে রাখতে পারেন না, তাই উদাসীন থাকবার প্রাণপণ চেষ্টায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন : 'অবশ্য গানটার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে হার্মনি আর বাজনার অংশ আমি যোগ করেছি…আর,' বৃদ্ধ দু' একবার কেশে নিয়ে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নেন : 'আর…মিনুয়ে-র সঙ্গে একটা ত্রিয়ো জুড়ে দিতে হয়েছে…মানে…ওটা এমনি দিতে হয়…রেয়াজ তবুও… হাঁ, বলতে হবে বৈ কি, আসলে চমৎকার জিনিসই হয়েছে!'

বৃদ্ধ বেহালা নিয়ে নিজে বাজাতে শুরু করলেন। ক্রিস্‌তফ পিয়ানোতে অনুসরণ ক'রে চলল।

'কিন্তু দাদু, ও-তে তোমারও নাম নিশ্চয়ই দিতে হবে!'

বৃদ্ধের কণ্ঠ অশ্রু-রুদ্ধ হয়ে আসে। বহু কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে বলেন : 'তার কোন প্রয়োজন নেই দাদু…তুই ছাড়া জগতে আর কারুর এ বিষয়ে জানবার কোন প্রয়োজন নেই…শুধু…'

বৃদ্ধের কণ্ঠ বুঝি ভেঙ্গে পড়ে : 'শুধু…একদিন…যখন আর আমি এই পৃথিবীতে থাকবো না…তখন এই রচনা হয়তো তোকে মনে করিয়ে দেবে, তোর একজন দাদু ছিল…তাই না? বল্, তুই তাকে কোনদিন ভুলে যাবি না?'

বঞ্চিত-ভাগ্য সেই বৃদ্ধ বুঝেছিলেন যে তাঁর পৌত্রের এই প্রতিভার দান তাঁর জীবনকে ছাড়িয়ে অনাগত কালেও বেঁচে থাকবে। তাঁর নিজের কোন রচনাই সেই-সৌভাগ্য লাভ করতে পারে নি। তাই পৌত্রের এই রচনার মধ্যে নিজের রচনার অংশকে জুড়ে দিয়ে রাখতে সে-সহজ সুখ স্বভাবতঃই জাগে, তা ছাড়াও বৃদ্ধের অন্তরে এক সকরুণ দুরাশা সংগোপনে তাঁকে এই কার্যে প্রণোদিত করেছে। একদা

এই রচনা পৌত্রকে যে-যশ এনে দেবে, তার মধ্যে নামহীন তাঁর সামান্য দানও লুকিয়ে থাকবে এবং এই ভাবে তাঁর অন্তরের একটা সামান্য টুকরোও অনাগত কালের মধ্যে সংগোপনে হলেও, বেঁচে থাকবে। নাই বা থাকল তাঁর নাম, তবুও তিনি জেনে গেলেন, তাঁর সবটুকুই চিরান্ধকারে হারিয়ে যাবে না।

বৃদ্ধের সেই সংগোপন সকরুণ বাসনার কথা ক্রিস্‌তফ বুঝতে পারে। চুম্বনে চুম্বনে বৃদ্ধকে অভিষিক্ত করে দেয়। বৃদ্ধও তার মস্তক মুখের কাছে টেনে নিয়ে চুম্বনের আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। অর্ধ গদগদ কণ্ঠে বলেন: 'তাই দাদু, এ বুড়োকে ভুলিস নি! একদিন যখন তুই একজন খুব বড় সঙ্গীত-স্রষ্টা হবি, তোর কৃতিত্বে তোর বংশ উজ্জল হবে, তোর দেশ উজ্জ্বল হবে, তোর কৃতিত্বে এই শিল্প আরো মহীয়ান হয়ে উঠবে, দেশে বিদেশে তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে, তখন মনে রাখিস ভাই, তোর এই বুড়ো ঠাকুরদাই সর্বপ্রথম তোর সেই প্রতিভাকে স্বীকার করেছিল, একদিন তুই যা হবি এই বুড়োই সর্বপ্রথম তার ভবিষ্যৎবাণী ক'রে গেল!'

বৃদ্ধের দুই চোখ অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে, এত চেষ্টা ক'রেও এই অশ্রু-দুর্বলতা ঢেকে রাখতে পারেন না। তবু বৃদ্ধ কিছুতেই এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না। হঠাৎ যেন কাশির বেগ শুরু হয়, কাশতে কাশতে আবার গম্ভীর হয়ে যান। বালককে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। অমূল্য পাণ্ডুলিপিখানি বুকে জড়িয়ে ধরে জাঁ-ক্রিস্‌তফ বিদায় নেয়।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে ক্রিস্‌তফ বাড়ি ফেরে। মনে হয় পথের পাথরগুলো যেন তাকে ঘিরে আনন্দে নৃত্য ক'রে চলেছে। কিন্তু গৃহে ফিরে এসে যে অভিনন্দন পেল, তাতে বিহ্বলতার সুর ছিন্ন হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যখন নিজের কৃতিত্বের কথা বলল, কেউই তাতে বিশেষ আনন্দিত হলো না, বরঞ্চ ভৎর্সনা ক'রে উঠল। লুইসা শুনে হেসে উঠল, অবিশ্বাসের হাসি। মেলশিয়র রেগে উঠে বললে, বৃদ্ধের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, এই ভাবে ছেলেটির মাথা চিবিয়ে না খেয়ে তিনি যদি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তা হলেই ভাল হয়। এবং সেই সঙ্গে ক্রিস্‌তফকে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিল, মাথা থেকে ও-সব বাজে কল্পনা দূর ক'রে দিয়ে অবিলম্বে চারঘণ্টা ধরে পিয়ানোতে যথারীতি তাকে গৎ সাধতে হবে। কি ক'রে যথা নিয়মে বাজাতে পারা যায়, আগে তা ভাল ক'রে শিখতে হবে; এখন হতে সঙ্গীত-রচনা নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই, পরে জীবনে যখন তেমন আর কিছু করবার থাকবে না, তখন সঙ্গীত-রচনার যথেষ্ট অবকাশ মিলবে।

মেলশিয়রের এই জাতীয় বিজ্ঞ উক্তি থেকে অবশ্য একথা মনে করা ঠিক হবে

না যে, মেলশিয়র পুত্রকে এই অস্বাভাবিক অল্প-বয়সী গর্বের বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যেই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। বরং উল্টো। তা ছাড়াও অন্য একটা ব্যাপার ছিল। মেলশিয়রের মনে কোনদিন এমন কোন ভাবের উদয় হয় নি, যাকে সঙ্গীতে সে রূপান্তরিত করতে পারত, কিংবা অন্তরের ভাবনাকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করতে হলে, মনের পেছনে যে দুর্বার তাগিদ থাকে, তাও কোনদিন সে নিজের জীবনে অনুভব করে নি। তাই সঙ্গীত-রচনার ব্যাপারকে সে কোনদিনই প্রথম শ্রেণীর শিল্পকার্যের মর্যাদা দিতে পারে নি। তার কাছে সঙ্গীত-রচয়িতার অপেক্ষা গায়ক বা বাদকেরই বেশী মূল্য ছিল। অবশ্য হাস্‌লারের মতো সঙ্গীত-রচয়িতা লোকের কাছ থেকে যে বিপুল অভিনন্দন পেতেন, তা যে সে বুঝত না, তা নয়। তবে সে তার অন্য ব্যাখ্যা করত। বিজয়ী হওয়ার একটা সার্থকতা আছে, সে সেইটি বুঝত, কি উপায়ে সে-বিজয় অর্জিত হলো, তা নিয়ে সে মাথা ঘামাত না। এবং যখনই হাস্‌লারের মতো সঙ্গীত-রচয়িতাকে লোকে জয়োল্লাসে অভিনন্দিত করত, মেলশিয়রের মনে হতো, বাদক হিসেবে তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে চুরি ক'রেই তাঁরা সেই যশ ভোগ করছেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিল, বাদক হিসেবে কৃতিত্বেরও কম মূল্য নেই, বরং সে-কৃতিত্ব তার কাছে আরো বেশী লোভনীয় এবং গৌরবজনক বোধ হতো। যে সব বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতার নামে লোকে উল্লসিত হয়ে উঠত, মেলশিয়র তাঁদের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের চরিত্র এবং বুদ্ধি-বৃত্তি সম্বন্ধে নানারকমের আষাঢ়ে গল্প সানন্দে প্রচার ক'রে তাঁদের ছোট করতে একটা বিশেষ সুখ পেত। তার বিবেচনায় আর্টের ক্ষেত্রে বাদক আর গায়কই হলো সর্বপ্রথম স্তরের জীব। তার প্রমাণস্বরূপ সে বলত : 'কে না জানে, আমাদের দেহের মধ্যে আর্টের দিক থেকে জিহ্বাই সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ কিন্তু শব্দ ছাড়া চিন্তার অস্তিত্ব কোথায়? বাদক আর গায়ক যদি না থাকত, তা হলে সঙ্গীত থাকত কোথায়?'

ক্রিস্তফকে ভর্ৎসনা করবার কারণ যাই থাকুক না কেন, মেলশিয়রের ভর্ৎসনা বালকের কিঞ্চিৎ উপকারই করল। ঠাকুরদার প্রশংসায় তার মধ্যে যে উদ্বেল-ভাব জেগে উঠেছিল, মেলশিয়রের ভর্ৎসনায় তা সঙ্কুচিত হয়ে স্বাভাবিকতায় ফিরে এল। সে অবশ্য ভাল করেই জানত যে, তার বাবার অপেক্ষা ঠাকুরদার বুদ্ধিবৃত্তি ঢের বেশী প্রখর। তবু পিতার ভর্ৎসনায় সে যে পিয়ানোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত সাধবার জন্য নিজেকে টেনে বসাল, তার পেছনে পিতৃ-বাক্যের প্রতি আদৌ বিশ্বাস ছিল না। সে জানত, এবং পিয়ানোর সামনে বসে পর্দায় যখন আঙুল চালাত,

তখন নির্বিবাদে সে আপনার মনে স্বপ্ন রচনা করবারই অবকাশ পেত। সেই স্বপ্ন-সুখই তাকে যন্ত্রের কাছে টেনে আনল। যখন পর্দায় আঙুল দিয়ে বারবার ক'রে একই গৎ বাজাতে হতো, তখন তার ভিতর থেকে গর্বোৎফুল্ল কণ্ঠে কে যেন বলে চলত: 'আমি সুর স্রষ্টা···আমি সত্যিকারের একজন সুর-স্রষ্টা!'

যেদিন ঠাকুরদার কাছ থেকে সে নিজের সঙ্গীত-রচনার ক্ষমতার সন্ধান পেল, সেইদিন থেকেই সে সেই সাধনায় নিজেকে ব্রতী করল। বর্ণমালা লিখতে শেখার আগেই সে স্বরলিপির সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো লিখতে আরম্ভ ক'রে দিল। বাড়ির হিসাবের খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সে সংগোপনে তাতে সেই সব বিচিত্র সঙ্কেতের চিত্র এঁকে চলে। কিন্তু সেই সব সঙ্কেত চিহ্ন দিয়ে যখনই কোন মনের ভাবনাকে লিখতে চেষ্টা করে, দেখে কোন ভাবনাই তাতে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। শুধু কতকগুলো চিহ্ন কাগজে পড়ে থাকে। ক্রিস্তফ বিপন্ন বোধ করে কিন্তু হতাশ হয় না; জন্মসূত্রে লব্ধ সৃজনী-প্রতিভার প্রেরণায় সে নিজের মতো ক'রে নানাভাবে সেই সব সঙ্কেত চিহ্নকে সাজিয়ে চলে, তার মধ্যে কোন সঙ্গীতের রূপ ফুটে উঠছে কি না, তা নিয়ে সে নিজেকে বিব্রত করতে চায় না। তারপর, সংগোপনে সেই কাগজগুলো নিয়ে শুধু ঠাকুরদাকে দেখায়। ঠাকুরদার দুই চোখ জলে ভরে আসে, অবশ্য বার্ধক্যের দরুন তখন স্বভাবতঃই তাঁর চোখ ভিজেই থাকত। বালক-স্রষ্টাকে তিনি অকপটে উৎসাহিত করেন: 'সত্যিই, অপূর্ব হয়েছে রে!'

অবশ্য, এই জাতীয় প্রশংসা তার মতো বালকের মাথা বিগড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বালকের স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা সাধারণ বুদ্ধির রাশটান ছিল যে, তা বালকের কোন ক্ষতিই করতে পারল না। তা ছাড়া, এই সময় বালক এমন আর-একজন লোকের প্রভাবে এসে পড়ল, যার মধ্যে অতিশয্যের কোন বালাই ছিল না, কারও ওপর আধিপত্য করবারও কোন বাসনা যার ছিল না, এবং যে ব্যক্তি সর্বদাই এই পৃথিবীকে সাধারণ বুদ্ধির স্থির চোখে দেখত। সে ব্যক্তি হলো, লুইসার ভাই।

লুইসার মতোই তারও গড়ন পাতলা, ছোটখাটো। তাকে দেখে বুঝবার উপায় ছিল না, তার বয়স ঠিক কত। আসলে তার বয়স চল্লিশের ওপর হবে না, কিন্তু দেখাত যেন পঞ্চাশের বেশী। ছোট্ট রেখাঙ্কিত মুখ, গায়ের রঙ ম্লান গোলাপী, দুটি সকরুণ নীল চোখ, যেন দুটি বিশুষ্ক ফরগেট্-মি-নট্ ফুল। পাছে হঠাৎ কোন এক ফাঁকে ঠাণ্ডা লেগে যায়, সেই ভয়ে ভদ্রলোক সব সময় মাথায় টুপি ব্যবহার করেন। টুপি খুললেই, চোখে পড়ে, মোচার মতো একখণ্ড গোলাপী টাক—ক্রিস্তফ

আর তার ভাইদের এই টাকটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যখনই সুযোগ জুটত, তখনই তারা এই টাকের ব্যাপার নিয়ে মাতুলকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলত, চুলগুলো কোথায় উড়ে চলে গেল, তার হদিশ জানবার জন্য তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত ক'রে তুলত। মেলশিয়রও এই বিষয় নিয়ে সর্বদাই রসিকতা করত, ছেলেরা তাতে আরো উৎসাহিত হয়ে উঠত। মাতুল কিন্তু হেসেই তাদের এইসব আক্রমণকে গ্রহণ করত, বিন্দুমাত্র ধৈর্য হারাত না। ভদ্রলোক জীবিকা-অর্জনের জন্য ফেরিওলার বৃত্তি নিয়েছিল। পিঠে এক বৃহৎ বোঝা নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামন্তরে ঘুরে বেড়াত, সেই বোঁচকায় পাওয়া যেত না হেন জিনিস ছিল না : মুদিখানার জিনিস থেকে শুরু ক'রে তাতে যাবতীয় দ্রব্য, কেক্ বিস্কুট, রুমাল, জুতো, চাটনি, দেয়াল-পাঞ্জি, গানের বই, এমন কি ওষুধও থাকত। দু'একবার চেষ্টা করা হয়েছিল, পায়ে হেঁটে ফেরি না ক'রে, ছোটখাট একটা দোকান-ঘর নিয়ে যাতে ভদ্রলোক বসে কেনাবেচা করতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোকের ধাতে তা সইত না! হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা বোঁচকা গুছিয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ত। দোকানের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়ত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, তার আর দর্শন মিলত না। তারপর হঠাৎ একদিন ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে আসত। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা যেন ইতস্ততঃ করত, তারপর মাথা থেকে টুপি খুলে দরজার ফাঁক দিয়ে টাক-ওলা মাথাটি বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলে উঠত : 'সবাই ভাল তো, নমস্কার, নমস্কার!' তারপর পায়ের জুতোর ধুলো ভাল ক'রে ঝেড়ে নিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করত, ছোট-বড় প্রত্যেককে সমান সম্ভ্রমের সঙ্গে অভিবাদন জানাত, ধীরপদক্ষেপে ঘরের একেবারে এক কোণে গিয়ে চুপটি ক'রে বসত। ধীরে পাইপটি জ্বালিয়ে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে চেয়ারে নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকত, জানত অবিলম্বেই প্রশ্নের ঝড় উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলবে। অসীম ধৈর্যে সে-ঝড় কাটিয়ে উঠতে হতো। ক্রিস্তফের বাবা, ঠাকুরদা, দু'জনেই এই আত্মীয়টিকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে তা লুকোতেও তাঁরা চেষ্টা করতেন না। তাঁদের নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে একজন যে ফেরিওলা, একথা ভাবতেই তাঁদের আত্মসম্মানে কঠিন আঘাত লাগত। এবং সেকথা স্পষ্ট ক'রে তাকে বুঝিয়ে দিতে তাঁরা কোন ত্রুটি করতেন না, কিন্তু এই অবজ্ঞা সে গায়েই মাখত না। বরং তাঁদের দু'জনকেই এমন গভীর শ্রদ্ধা সে নিবেদন করত যে, মেলশিয়র না হোক্, বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল তাতে একেবারে নিরস্ত্র হয়ে পড়তেন। বৃদ্ধকে যে শ্রদ্ধা করত, তার যত

দোষই থাকুক, বৃদ্ধ তার উপর বিরূপ হতে পারতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে পিতা-পুত্রে মিলে ভদ্রলোককে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রূপবাণে এমন ভাবে বিদ্ধ করত যে, লুইসা ভাইয়ের অবস্থা দেখে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠত। ক্রাফটদের বংশগত বিদ্যা-বুদ্ধির আভিজাত্যের কাছে লুইসা বিনা প্রশ্নে অবনত মস্তকে নিজেকে সমর্পণ করেছিল, তাই স্বামী বা শশুরের উক্তিকে সে সত্য বলেই গ্রহণ ক'রে নিত, কিন্তু নিজের ভাইকেও অস্বীকার করতে পারত না। ভাইয়ের প্রতি একটা সহজাত গভীর ভালোবাসা ছিল এবং লুইসা জানত যে, তার ভাইও নীরবে তাকে কতখানি ভালোবাসত। তাদের বংশের মধ্যে তারা এই দুই ভাই-বোনই শুধু বেঁচেছিল, দু'জনই সমান ভাগ্যহত, দীন, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত। তাদের দু'জনের ভাগ্যে সেই একই ব্যর্থতা নিঃশব্দে সংগোপনে তাদের অন্তরকে এক সকরুণ প্রেমে এক ক'রে বেঁধে রেখেছিল। ক্রাফটদের বলিষ্ঠ আনন্দ আর কোলাহল-মুখর প্রাণদীপ্ত সতেজ আত্মগর্বিত জীবনের পাশে, এই দুটি ক্ষীণ, দুর্বল, ভীরু প্রাণীকে অত্যন্ত বেমানান্ দেখাত, মনে হতো যেন তাদের জীবনের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কই নেই। ভাই-বোনে তা জানত এবং বুঝতোও কিন্তু তা নিয়ে কোনদিন নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনাই করত না।

শৈশবের স্বাভাবিক নিষ্ঠুর বিচারহীনতায় ক্রিস্তফও ফেরিঙলা মাতুল সম্পর্কে তার বাবা আর ঠাকুরদার মতোই ভাবত। তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুক করত, সার্কাসের ক্লাউনের মতো তাকে দেখত, অকারণে মূঢ়ের মতো উত্যক্ত ক'রে চলত, কিন্তু অসীম ধৈর্যে মামা তা সহ্য করত। তবুও ক্রিস্তফ তাকে ভালোবাসত, কেন যে বাসত তা অবশ্য ভেবে দেখত না। হয়তো শিশু-সুলভ চপলতায় এই লোকটিকে নিয়ে সে তার নিজের খেয়াল-খুশিমত খেলা করতে পারে, তাই তাকে সে ভালোবাসে। তা ছাড়া, আর একটি কারণও ছিল, এই লোকটির কাছ থেকে ক্রিস্তফ প্রায়ই কিছু-না-কিছু উপহার পেত, সামান্য একটা খেলনা, একটা ছবি, নানারকমের ছোটখাট মন ভোলান জিনিস। তাই বহুদিন অদর্শনের পর যখন সে দেখা দিত, শিশুদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত, এবার তাদের জন্যে কি উপহার নিয়ে এসেছে, তা দেখবার জন্যে কৌতূহলের অবধি থাকত না। গরীব হলেও প্রত্যেক শিশুর জন্যে একটা-না-একটা কিছু সে নিয়ে আসত ; তাদের সংসারে কার কবে জন্মদিন, মামা তা ঠিক মনে ক'রে রাখত। এবং যেখানেই ঘুরে বেড়াক না কেন, ঠিক জন্মদিনের উৎসবে এসে হাজির হতো এবং ভালোবেসে বেছে চমৎকার একটা উপহার সংগ্রহ ক'রে আনত। এই উপহার-পাওয়া তাদের

কাছে এমন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তাঁর জন্যে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা পর্যন্ত তারা ভুলে গিয়েছিল! কিন্তু ক্রিস্তফ সারাদিন উৎপাতের পর রাত্রিতে যখন বিছানায় গিয়ে শুতো,—সাধারণতঃ যেদিন তার ভাল ঘুম হতো না —সারাদিন যা ঘটেছে মনের মধ্যে তা নেড়ে চেড়ে দেখত, তখন এই মাতুলের কথা বিশেষ ক'রে তার মনে জাগত, বুঝত কত স্নেহশীল এই লোকটি, এক অপূর্ব কৃতজ্ঞতার বন্যায় তার অন্তর তখন উচ্ছল হয়ে উঠত। কিন্তু পরের দিন দিনের আলোয় সেকথা সে মুখ ফুটে বলতে পারত না, লজ্জা করত, মনে হতো যেন লোকে হাসাহাসি করবে। তা ছাড়া, তার শিশু-চেতনায় এই সহৃদয়তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ ক'রে উঠতে পারত না। শিশুর ভাষায়, ভালোমানুষ আর বোকা, প্রায়ই একার্থবোধক হয়ে থাকে, তার স্পষ্ট প্রমাণ জাঁ-ক্রিস্তফ চোখের সামনে তার মাতুলের ব্যাপারেই যেন দেখতে পায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, মেলশিয়র বাড়িতে ছিল না, মা ছেলেদের ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত, মামা একা বাইরের ঘরে বসেছিল। হঠাৎ মামা নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বের হয়ে, সামনেই কয়েক গজ দূরে নদীর ধ'রে গিয়ে সে বসল। ক্রিস্তফ তাকে অনুসরণ ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং শিশু সুলভ দুষ্টুমিতে তাকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সামনের ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে শুয়ে ঘন ঘাসের মধ্যে নাক ডুবিয়ে দিল। দুষ্টুমি করতে করতে তার দম ফুরিয়ে আসছিল। খানিকটা বিশ্রামের পর নতুন কোন দুষ্টুমির ফিকিরে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। কি বলে মামাকে ক্ষেপানো যায়! ভেবে-চিন্তে যখন তার সন্ধান পেল, তৎক্ষণাৎ চিৎকার ক'রে বলে উঠল এবং ঘাসে মুখ গুঁজে নিজেই হেসে অস্থির হলো। কিন্তু তার পরিহাসের কোন জবাবই এল না মামার কাছ থেকে। হঠাৎ মামা কেন নীরব হয়ে গেল তা দেখবার জন্যে মুখ তুলে তাকিয়ে পরিহাসটি আবার চেঁচিয়ে বলল। দেখল অস্তসূর্যের শেষরশ্মির আভায় মামার মুখ যেন জলে উঠেছে। সেই মুখের দিকে চাইতেই তার মুখের কথা যেন সে নিজেই গিলে ফেলল। অর্ধনিমীলিত চোখে মামা হেসে উঠল, তার ম্লান মুখে কি এক অবর্ণনীয় বিষাদ আর বেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্রিস্তফ দু' হাত দিয়ে দু' গাল চেপে ধরে নীরবে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমশঃ রাত্রির ছায়া ঘন হয়ে ওঠে। অন্ধকারে মামার মুখের সেই রহস্যঘন ছায়া যেন আপনা থেকে ক্রিস্তফের অন্তরে প্রতিফলিত হয়। একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন-মোহ যেন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। নীচে ধরণী আঁধার-ভরা, উপরের আকাশ আলোময়। নক্ষত্রের দল চেয়ে আছে পৃথিবীর

দিকে। পায়ের কাছে তটভূমিতে ওঠে নদীর জল-মর্মর। তন্দ্রা ছেয়ে আসে বালকের চোখে। কাছেই ঝিঁঝিঁ ডাকে। মনে হয় যেন সেখানেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।

সহসা, সেই নীরব অন্ধকারে মামা, গান গেয়ে উঠল। ক্ষীণ, চাপা গলায়, যেন নিজেকেই নিজে গান শোনাচ্ছে, কুড়ি গজ দূরে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না! কিন্তু সেই ক্ষীণ কণ্ঠে ছিল প্রাণ, ছিল আবেগ, ছিল সরলতা। তার অন্তরের ভাবনাই যেন গানের রূপ ধরে ফুটে উঠেছে; স্বচ্ছ জলের মতো, সেই গানের ভিতর দিয়ে তার অন্তরের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত দেখা যায়। জীবনে আর কোন দিন ক্রিস্তফ সেইভাবে গাইতে কাউকে শোনে নি, সেরকম গানও আর কোনদিন সে শোনে নি। কোন তাড়াহুড়ো নেই, ধীর, স্থির, শিশুর মতো শান্তগতি, অথচ সুগম্ভীর, মাঝে মাঝে থেমে যায়, আপনার খেয়ালে অনেকক্ষণ থেমে থাকে, আবার চলতে আরম্ভ করে, কোথায় চলেছে তার কোন স্থিরতা নেই, কোথায় পৌঁছল তা জানবারও যেন কোন তাগিদ নেই, ক্রমশঃ সে-গানের সুর চলতে চলতে হারিয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে, হারিয়ে যায় স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে। ক্রিস্তফের মনে হয় যেন বহু বহু দূর থেকে এই সুর যাত্রা শুরু করেছে, কতদূরে যাবে কে জানে? অতি শান্ত-গতি বেদনায় মন্থর, তার আড়ালে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে যুগ-যুগান্তের ক্রন্দন। ক্রিস্তফ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা ক'রে থাকে, বিন্দুমাত্র নড়তে পর্যন্ত পারে না, রুদ্ধ আবেগে প্রস্তর-হিম হয়ে আসে। গান শেষ হয়ে গেলে, হামাগুঁড়ি দিয়ে মামার গায়ের কাছে এসে আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকে: 'মামা!'

মামা নিরুত্তর, নিশ্চল।

উঠে বসে মামার হাঁটুর ওপর হাত আর থুতনি রেখে ক্রিস্তফ আবার ডাকে: 'মামা!'

স্নিগ্ধকণ্ঠে এবার মামা উত্তর দেয়: 'কি রে?'

'কি গাইলে? বল আমাকে, কি গাইছিলে?'

'তা তো জানি নে!'

'বলবে না? বল—'

'সত্যি, জানি না রে। এমনি একটা গান।'

'তোমার তৈরি গান?'

'আরে, না, না! কি সর্বনাশ!...একটা পুরনো গান—'

'কার তৈরি?'

'তা কেউ জানে না…'

'কোন্ সময়কার ?'

'তাও কেউ জানে না !'

'যখন তুমি খুব ছোট্ট ছিলে…সেই সময়কার ?'

'না, আমার জন্মাবার আগে…আমার বাবার জন্মের আগে…বাবার বাবার জন্মেরও আগে…বহু বহু কাল আগে—চিরকাল হ'রে আছে…'

'কি আশ্চর্য ! এরকম হয় ? কেউ তো আমাকে তা বলেনি !'

এক মিনিট কি যেন ভেবে নিল, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল : 'মামা, তুমি এই রকম অন্য কোন গান জানো ?'

'জানি !'

'দোহাই তোমার গাও !'

'তার তো কোন দরকার নেই ! আবার আর-একটা গান গাইবো কেন ? একটাই তো যথেষ্ট। গান না গাইলে যখন আর চলে না, তখনি গান গাইতে হয়। মন যখন চায়, তখনই…নইলে গান গাইতে হবে বলে, গান গাইতে নেই !'

'কিন্তু যখন গান রচনা করতে হয়… ?'

'সেটা গান নয় !'

বালক পথ হারিয়ে ফেলে। ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু বোঝাবার জন্যে কোন তাগিদও করে না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারে, সঙ্গীত বলে যা কিছু সে শুনেছে, তা যেন আজকের এই সঙ্গীতের মতো নয়।

তবু জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে : 'মামা, তুমি কোন দিন তৈরি করেছ ?'

'তৈরি ? কি ?'

'গান !'

'আমি কি ক'রে গান তৈরি করবো ? গান যে তৈরি করা যায় না !'

বালকের যুক্তিতে বিভ্রম লাগে। একথা সে কি ক'রে স্বীকার করে নেবে ? তাই আবার জিজ্ঞেস করে : 'কিন্তু একদিন কেউ না কেউ তো তৈরি করেছিল…'

মামা তেমনি প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বলে :

'না, তারা চিরকাল এমনি তৈরি হয়েই আছে…'

বালক কিছুতেই তা স্বীকার করবে না। তাই অন্যভাবে সেই প্রশ্ন করে :

'কিন্তু অন্য কোন গান, অন্য কোন নতুন গান, কেউ কি আর তাহলে তৈরি করতে পারবে না ?'

'কি দরকার তৈরি ক'রে ? এই পৃথিবী-ভরা সব জিনিসের জন্যেই রয়েছে পর্যাপ্ত গান। দুঃখের দিনের গানও আছে, আছে সুখের দিনের গান। ক্লান্তিতে যখন মন ছেয়ে আসে, তখনকার গানও আছে, বাড়ির জন্যে যখন মন কেমন করে, তখনকারও গান আছে। গান আছে, যখন নিজেকে নিজেরই আর ভাল লাগে না, মনে হয় এই পৃথিবীতে শুধু একটা পোকার মতোই রয়ে গেলাম, গান আছে, যখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে সাধ যায়, যখন মানুষের কাছ থেকে তুমি পেলে না যা তোমার প্রাপ্য; আবার গান আছে যখন আনন্দে ভরে যায় মন, সুন্দর লাগে পৃথিবীকে, সুন্দর লাগে এই পৃথিবীর সব কিছু…গান আছে যখন চোখের সামনে হেসে ওঠে ভগবানেরই এই আকাশ ভগবানের মতোই বিরাট, তাঁরই মতো স্নেহময় দয়াময়… সব কিছুরই, সব কিছুরই আছে গান…তবে আবার কেন তৈরি করতে যাবো, বল্ ?'

জাঁ-ক্রিস্তফের মনে পড়ে ঠাকুরদার কথা, ঠাকুরদার দুরাকাঙ্ক্ষার কথা, উত্তর দিয়ে ওঠে : 'কেন তৈরি করবো ? গান তৈরি করবো, বড় হবো ব'লে…পৃথিবীর ইতিহাসে মস্ত বড় নাম করবো…'

মামা হেসে ওঠে। মৃদু হাসি।

সে-হাসিতে জাঁ-ক্রিস্তফ আহত হয়, ক্ষুণ্ণ হয়। জিজ্ঞেস করে : 'হাসলে যে ?'

মামা বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে : 'ওঃ · না…আমি আমি তো কেউ নই… কিছু নই!' বালকের শিরচুম্বন ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে : 'তুই বুঝি মস্ত বড়লোক হতে চাস ?'

গর্বিতকণ্ঠে বালক বলে উঠে : 'হাঁ!' ভাবে, তার এই স্পষ্ট উত্তরে মামা খুশীই হবে।

কিন্তু মামা বলে উঠল : 'কেন ? কিসের জন্য ?'

এ-প্রশ্নের সে কি উত্তর দেবে ? ক্রিস্তফ বিব্রত হয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে উত্তর দেয় : 'ভাল ভাল সঙ্গীত তৈরি করবার জন্যে।'

মামা আবার হেসে ওঠে। বলে : 'তুই ভাল ভাল গান তৈরি করতে চাস বড় লোক হবি বলে, আবার বড় লোক হতে চাস্, ভাল ভাল গান তৈরি করতে পারবি বলে। ব্যাপ রটা কি রকম হলো জানিস ? একটা কুকুর যেন তার নিজের ল্যাজকে ধরবার জন্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে!'

জাঁ-ক্রিস্তফ নিজেকে পরাজিত বোধ করে। মামা যে তাকে এভাবে হেসে উড়িয়ে দেবে, অন্যসময় হলে ক্রিস্তফ কিছুতেই সহ্য করত না, এতকাল ধরে তারই

মুখের সামনে সে হেসে এসেছে এবং তর্কে যে মামার কাছে এভাবে তাকে হার স্বীকার করতে হবে, একথা ভাবতেই পারে না। এর আগে আর কোন দিনই সে তার মাতুলকে ততখানি বুদ্ধির অধিকারী ভাবে নি। তাই ব্যর্থ-রোষে প্রতি-আক্রমণের জন্যে মনের মধ্যে একটা উপযুক্ত উত্তরের সন্ধান ক'রে বেড়ায়, অন্ততঃ কোন একটা বিদ্রূপও যদি লাগসই পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই মিলল না। মামা বলে চলল :

'এখান থেকে কোবলেন্‌ৎজ্‌ যত দূর যদি ততটাই বড় হোস্‌, তবুও একটা গানও তৈরি করতে পারবি নে।'

ক্রিস্‌তফের পক্ষে এতটা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। সে বিদ্রোহ ক'রে উঠল : 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারবো! আমি বলছি, আমি পারবো!'

'যত জোর করবি, তত কম পারবি। গান তৈরি করতে হলে ঐ, ঐ যে-সব প্রাণী অন্ধকারে ডাকছে, ওদের মতো হতে হবে রে…শোন্‌ মন দিয়ে…ঐ যে ডাকছে—'

মাঠের ওপারে আকাশে তখন পরিপূর্ণ আলো-ঝলমল চাঁদ উঠেছে। মাটির ওপরে চারদিকে, চিকন জল-ধারার ওপরে ম্লান কুয়াশা চাঁদের আলোয় রূপালী হয়ে উঠেছে। কাছে কোথাও নদী-তটে ব্যাঙরা ডেকে চলেছে, দূরের মাঠে তাদের আত্মীয়রা সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে। আকাশে নক্ষত্রের আলোক-স্পন্দনের উত্তরে মাটিতে পতঙ্গরা অবিরাম গুঞ্জন ক'রে চলে। ঘন আন্ধারের বনে বাতাসে পল্লব-মর্মর জাগে। নদী-পারে পর্বতের অরণ্য থেকে ভেসে আসে নাইটিঙ্গেলের সুর।…

বহুক্ষণ নীরব থাকবার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মামা বলে ওঠে : 'ক্রিস্‌তফ, বল দেখি এই বিরাট জলসার মধ্যে আর বাকি কি আছে গাইবার?' জাঁ-ক্রিস্‌তফ বুঝতে পারে না, মামা কার সঙ্গে কথা বলছে, জাঁ-ক্রিস্‌তফের সঙ্গে, না, নিজের সঙ্গে! 'ওদের গান শুনে কি মনে হয় না যে, আমাদের সব তৈরি গানের চেয়ে ঢের মধুর ওদের ঐ গান?'

বহুদিন ক্রিস্‌তফ রাত্রির এই সঙ্গীত কান পেতে শুনেছে। শুনতে তার ভাল লাগে। কিন্তু আজ যেমন ক'রে শুনল যেন আগে আর কোনদিন তেমন ক'রে শুনতে পায় নি। সত্যিই তো! এই গানের পর আর গাইবার কি দরকার থাকতে পারে?…এক অপরূপ সকরুণ মমতায় অন্তর ভরে ওঠে। মনে হয়, এই মুহূর্তে যেন বুকে জড়িয়ে ধরে এই চন্দ্রালোকিত তৃণ-ভূমি, এই নদী, তারায় ভরা ঐ আকাশ। দেখে, মামার মুখে যেন আজ কোথা থেকে এক নতুন আলো এসে পড়েছে,

মনে হয়, সে যেন ফেরিওলা নয়, তার পরিবর্তে তার সামনে বসে আছে জগতের মধ্যে যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবলের চেয়ে যে সুন্দর! সমস্ত অন্তর তাকে ভালোবাসবার জন্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই লোককে সে এতদিন কি অন্যায়ভাবেই না ভুল বুঝে এসেছে! হঠাৎ তার মনে হলো মামা যে বিষণ্ণ হয়ে থাকে, তার জন্য বুঝি সে-ই দায়ী: সে মামাকে এই ভাবে ভুল বোঝে বলেই বুঝি সে এমনি বিষণ্ণ হয়ে থাকে। অনুশোচনায় অন্তর ভরে যায়। ইচ্ছে হয় ডাক ছেড়ে কেঁদে সে বলে: 'মামা, দুঃখ করো না! আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমাকে ভালবাসি!' কিন্তু মুখ ফুটে তবু বলতে পারল না। হঠাৎ মামার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু মন যা বলতে চায়, কিছুতেই মুখে তা বের হয় না। শুধু কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে অস্ফুট গুঞ্জনের মতো বলে চলে: 'আমি তোমাকে ভালোবাসি! সত্যি, আমি তোমাকে ভালোবাসি মামা!'

মামা বালকের সেই অকস্মাৎ ভাবোচ্ছ্বাসে বিস্মিত হয়ে যায়; বুঝতে না পারলেও, তার ভাল লাগে। বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। আদরে তার শিরচুম্বন ক'রে জিজ্ঞেস করে: 'কি হলো রে? কি?'

ক্রিস্তফ আর কিছুই বলতে পারে না।

তখন গৎফ্রীদ উঠে পড়ে। ক্রিস্তফের হাত ধরে চলবার জন্যে পা বাড়ায়: 'চল, এবার বাড়ি ফিরে যাই।'

ক্রিস্তফের মন অভিমানে ভারী হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, মামা তাকে বুঝতে পারে নি। বাড়ির কাছাকাছি এসে মামা বলে: 'তোর যদি ভাল লাগে, তাহলে আবার একদিন নদীর ধারে ভগবানের নাটশালায় গিয়ে বসবো, তোকে আরো গান গেয়ে শোনাবো!'

বিদায়ের কালে চুম্বন করতে গিয়ে ক্রিস্তফ দেখে, মামার দুই চোখ আলোতে, হাসিতে ভরে উঠেছে। সে-হাসিতে ক্রিস্তফ বুঝতে পারে, মামা তাকে বুঝতে পেরেছে! বুক থেকে নেমে যায় যত দুঃখের ভার।

সেইদিনের পর থেকে তারা দু'জনে প্রায়ই সন্ধ্যায় বেড়াতে বের হতো; নদীর ধার ধরে অথবা মাঠের ভিতর দিয়ে নীরবে দু'জনে হেঁটে চলত। অন্ধকারে গৎফ্রীদ আপনার মনে আস্তে আস্তে পাইপ টেনে চলত, সামনে ঘনায়মান অন্ধকারে মাঝে মাঝে ভীত হয়ে ক্রিস্তফ হাত বাড়িয়ে মামার হাত জোর ক'রে ধরত। ক্লান্ত হয়ে নদীর ধারে কিংবা মাঠের মাঝখানে ঘাসের ওপর বসে পড়ত, কয়েক মুহূর্ত নীরবেই কেটে যেত, তারপর গৎফ্রীদ কথা বলতে আরম্ভ করত, আকাশের দিকে

তাকিয়ে নক্ষত্রের আর মেঘের গল্প বলত। রাত্রির সেই সুবিশাল নাটশালায় অনাদি সঙ্গীতের যে অনন্ত বৈচিত্র্য প্রতিমুহূর্তে ধ্বনিত হয়ে উঠছে, তাকে জানতে, তাকে চিনতে, তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ক'রে দেখতে তাকে শেখাত। এই পৃথিবী, তাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে আছে যে মহাশূন্য, এই নদী, সাগর, প্রত্যেকের চলার একটা আলাদা সুর আছে; বাতাসে পাখার ওপর ভর ক'রে যারা উড়ে বেড়ায়, তাদের প্রত্যেকের কান্না-ভালোবাসার, তাদের প্রত্যেকের পাখার স্পন্দনের আলাদা আলাদা সঙ্গীত আছে; অন্ধকারে সঞ্চরমান কত না প্রাণী, পায়ে হেঁটে, মাটিতে বুক দিয়ে, পাখা মেলে সাঁতার কেটে কত ভাবে চলছে ফিরছে, তাদের প্রত্যেকেরই গতির আছে স্বতন্ত্র একটা রূপ, স্বতন্ত্র একটা সঙ্গীত...রাত্রির এই মহা-সঙ্গীতের সুবিশাল জলসায়, দূর-নক্ষত্রের আলোক স্পন্দন থেকে অন্ধকারে পল্লবের মৃদু পত্র-মর্মর পর্যন্ত কত না বিচিত্র তন্ত্রীতে নিত্য উঠছে কত না বিচিত্র সুর! মামা একটি একটি ক'রে তাদের পরিচয় দিয়ে চলে, এই বিরাট অর্কেষ্ট্রার প্রত্যেক যন্ত্রটি আলাদা আলাদা ক'রে চিনিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তারি মধ্যে মাঝে মাঝে মামা দু' একটা সুর গেয়ে ওঠে, কিন্তু যেসব সুরের ধরন একই রকমের, এবং প্রত্যেকটি সুরই জাঁ-ক্রিস্তফের মনকে কি এক অজানা বেদনায় আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে যায়। কিন্তু কোন দিনই মামা একবারের জায়গায় দু'বার গায় না। ক্রিস্তফ লক্ষ্য করত, যেদিনই অনুরোধে তাকে গাইতে হতো, সেইদিনই তার কণ্ঠে তেমন ক রে আর খুশী ফুটে উঠত না। কোন কোন দিন অনেকক্ষণ ধরে তারা দু'জন পাশাপাশি বসে থাকত, নীরবে...কেউ কোন কথাই বলত না। ক্রিস্তফ নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকত, কখন আপনা থেকে মামা গেয়ে উঠবে, কিন্তু বহুক্ষণ ধরে এইভাবে অপেক্ষা ক'রে থাকতে থাকতে যখন সে নিরাশ হয়ে ভাবত, তা হলে আজ আর মামা গাইবে না, তখনই অকস্মাৎ মাতুল গেয়ে উঠত।

একদিন এইরকম এক সন্ধ্যায়, ক্রিস্তফ যখন বুঝল আজ আর কিছুতেই মামা গাইবে না, তার মাথায় এক বাসনা জেগে উঠল, মামার কাছে তারই রচিত একটি ছোট্ট সঙ্গীতকে সে উপস্থিত করবে! কি বিপুল চেষ্টায় আর নিষ্ঠায় তার এই গর্বের ধনকে সে সৃজন করেছে। তার সাধ, সে-মামাকে দেখাবে, সত্যিই সে কতখানি শিল্পী হয়ে উঠছে! গৎফ্রীদ নীরবে সব শুনল। তারপর বলে উঠল: 'ওরে হতভাগা, যা শোনালি তা কুৎসিত...অতি কুৎসিত!'

সেই সোজা কথা অকস্মাৎ ক্রিস্তফের মনকে এমন রূঢ়ভাবে আঘাত করল যে, সে কি বলবে তা খুঁজেই পেল না।

গৎফ্রীদ তেমনি অনুকম্পা-কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে: 'কেন তৈরি করতে গেলি? এতে যে কোন সৌন্দর্যই নেই! কেউ তো তোকে এর জন্যে বাধ্য করে নি?'

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ক্রিস্তফ প্রতিবাদ ক'রে ওঠে: 'হতে পারে কুৎসিত তোমার কাছে, কিন্তু আমার দাদু রীতিমত তারিফ করেছেন, বলেছেন, চমৎকার হয়েছে।'

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মামা বলে: 'তা হবে! তিনি যখন বলেছেন, তখন ঠিকই বলেছেন। তাই হবে! তিনি একজন পণ্ডিত লোক…সঙ্গীত সম্বন্ধে সব কিছুই তিনি জানেন। সত্যি, আমি তো এ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুই জানি না…' তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বলে ওঠে: 'তবু…আমার মনে হয়… আমার নিজের মনে হয়, কুৎসিত।'

কথা শেষ ক'রে ক্রিস্তফের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে · দেখে রাগে কঠিন হয়ে গিয়েছে মুখের রেখা। হেসে বলে: 'আর কোন কিছু রচনা করেছিস নাকি? হয়তো এটার চেয়ে আমার কাছে অন্য আর-একটা ভাল লাগতে পারে!'

কথাটা ক্রিস্তফ ফেলে দিতে পারল না। এটা হয়তো কোন কারণে মামার ভাল না লাগতে পারে! তাই প্রথমটার স্মৃতি তার অন্তর থেকে মুছে ফেলবার জন্যে ক্রিস্তফ একে একে তার অধিকাংশ রচনাই মামাকে শোনাল। মামা কোন কথাই বলল না; যতক্ষণ না ক্রিস্তফ শেষ করল, ততক্ষণ চুপ ক'রে শুনল। তারপর মাথা নেড়ে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল: 'এগুলো প্রথমটার চেয়ে আরো বেশী কুৎসিত!'

ক্রিস্তফ দাঁতে দাঁত দিয়ে, কোন রকমে নিজেকে সম্বরণ ক'রে রাখে। সমস্ত থুতনিটা থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। মনে হয়, এখুনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই গৎফ্রীদের। গৎফ্রীদ নিজেকেই যেন সেই রচনার জন্য অপরাধী মনে করে, এমনিভাবে বলে ওঠে: 'সত্যি, কি কুৎসিত!'

অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে ক্রিস্তফ চিৎকার ক'রে ওঠে: 'কেন? কেন তুমি বলছো যে এগুলো কুৎসিত হয়েছে?'

স্বচ্ছ দৃষ্টিতে গৎফ্রীদ ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে বলে: 'কেন?…তা তো আমি জানি না…তবে…হাঁ…দাঁড়া বলছি…এগুলো কুৎসিত, প্রথমতঃ, একদম বাজে…হাঁ, নিরর্থক, কোন মানেই হয় না…বুঝেছিস? যখন তৈরি করেছিলি, তখন মনে তোর বলবার মতো কিছুই ছিল না। কেন তৈরি করতে গেলি?'

আর্তকণ্ঠে ক্রিস্তফ বলে ওঠে : 'তা জানি না ! যা হোক্ একটা সুন্দর কিছু তৈরি করতে চেয়েছিলাম···'

'আমিও তো তাই বলছি। একটা কিছু তৈরি করতে হবে, তাই তৈরি করেছিস! কি তৈরি করছিস তার কোন ধারণাই তোর ছিল না। তুই একজন মস্ত বড় সঙ্গীত-রচয়িতা হবি, লোকে তোর যশ গাইবে, এই জন্যেই তুই গান বাঁধতে গিয়েছিলি, তাই না। ওরে, ওটা হলো গর্ব···গর্বের পাল্লায় প'ড়ে তুই মিথ্যাচার করেছিস, তাই তার শাস্তিও পেলি! মনে রাখিস, সঙ্গীতে যখনি কোন মানুষ মিথ্যাচার করে, প্রবঞ্চনা করে, সঙ্গীতের মধ্যে নিয়ে আসে গর্ব, তখনি মাপা থাকে তার শাস্তি। সঙ্গীতকে হতে হবে সহজ, সরল, আন্তরিক—তা ছাড়া সঙ্গীত আর কি? অন্তরের সহজ সত্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই, বিশ্বের এই সেরা সঙ্গীতের যিনি রচয়িতা, তিনি আমাদের দিয়েছেন গান, দিয়েছেন সুর। তাই সেখানে ঔদ্ধত্য আর গর্ব মানেই হলো তাঁকে অস্বীকার করা, তাঁকে অসম্মান করা!'

গংফ্রীদ বুঝল, ক্রিস্তফ তার কথা বুঝতে পারে নি, ব্যথিত ক্রুদ্ধ হয়েছে। তাই আদর ক'রে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে গেল। কিন্তু ক্রিস্তফ রেগে হাত ছাড়িয়ে ছিটকিয়ে চলে গেল এবং তার পর থেকে কয়েক দিন ধরে মামার সামনেই এল না। মামাকে রীতিমত ঘৃণা করতে লাগল। মামার কথা মনে হলেই সে বারবার নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলতে চেষ্টা করত : মামাটা কিছু জানে না, একটা গাধা, একটা আস্ত গাধা! কিছু জানে না···কিছু না! দাদু ওর চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধি ধরেন, রীতিমত পণ্ডিত, দাদু আমায় তারিফ করেছেন—

কিন্তু হায়, তার সমস্ত স্তোতবাক্য সত্ত্বেও, তার মনের গভীরে সে বুঝেছিল, মামা সত্য কথাই বলেছে, মামার ওপর তার যতই কেন রাগ বা ঘৃণা থাকুক না, তার প্রত্যেকটি কথা তার অন্তরে গভীর রেখাপাত ক'রে থেকে গিয়েছে, সে যে মিথ্যাচার করেছে, মামা তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। তাই সংগোপন লজ্জার হাত থেকে নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারে না।

সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে যখনই সে সঙ্গীত-রচনা করতে বসত, মামার কথা তার মনের ওপর ভেসে উঠত। এবং রচনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ধরে নিত, মামা সে-সম্বন্ধে কি মন্তব্য করবে। রাগে দুঃখে রচনাটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিত। এইভাবে একদিন সে একটা ছোট "মেলডী" রচনা করল : নিজেই বিচার ক'রে বুঝল, তার মধ্যে সত্যিকারের আন্তরিকতা ষোল আনা ফুটে ওঠে নি, তবুও সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিল না, সযত্নে লুকিয়ে রাখল, যাতে মামা না

দেখতে পায়। মামার সমালোচনাকে সে রীতিমত ভয় করত। কিন্তু একদিন তার নব-রচিত একটা সঙ্গীত দেখে মামা আপনা থেকে বলে উঠল :

'এটা আগেকার মতন তত খারাপ তো লাগছে না ; বরঞ্চ ভালই ঠেকছে—'

জাঁ-ক্রিস্তফের ভয় অনেকটা কেটে গেল।

মামাকে জব্দ করবার জন্যে ক্রিস্তফের মাথায় এক ফন্দি জেগে ওঠে : নাম-করা পুরনো সঙ্গীত-রচয়িতাদের রচনা থেকে অংশ-বিশেষ উদ্ধার ক'রে, নিজের রচনা বলে মামার সামনে উপস্থিত করা। যখন মামা মুখ ভার ক'রে কুৎসিত ব'লে তেমনি তীব্রভাবে তাদেরও প্রত্যাখ্যান করত, ক্রিস্তফ উল্লসিত হয়ে উঠত। কিন্তু গৎফ্রীদ বিন্দুমাত্র বিচলিত হতো না। ক্রিস্তফ তাকে ঠকাতে পেরেছে বলে হাত-তালি দিয়ে নেচে উঠত গৎফ্রীদ তার উল্লাসে কোন বাধাই দিত না। বরং সেই খেলায় সে-ও হেসে যোগদান করত। কিন্তু নিজের মতের কোন পরিবর্তন করত না। সব কথার শেষে বারেবারে সেই একই মন্তব্য সে করত : 'হয়তো রচনার দিক থেকে ভালই বলা যায় কিন্তু কোন অর্থ নেই, কি বলছে তা রচয়িতা নিজেই জানে না।' মেলশিয়রের বাড়িতে মাঝে মাঝে ছোটখাট জলসার আয়োজন হতো। গৎফ্রীদ কিছুতেই সেসব জলসায় উপস্থিত থাকত চাইত না। যত ভালই কনসার্ট হোক না কেন, কিছুক্ষণ পরেই তার হাই উঠতে আরম্ভ হতো, বিরক্তিতে ঝিমিয়ে পড়তো এবং এমন অসহ্য বোধ হতো যে, নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে চুপি চুপি সেখান থেকে সরে পড়ত। ক্রিস্তফকে প্রায়ই বলত : 'বুঝেছিস রে, এই ঘরের ভেতর থেকে চেয়ারে বসে তোরা যে সঙ্গীত তৈরি করিস তা সঙ্গীত নয়। ঘরে-তৈরি এই সঙ্গীত কেমন জানিস ? যেমন ঘরের ভিতর সূর্যের আলো। সঙ্গীত আছে ঘরের পাঁচিলের বাইরে যেখানে বয়ে চলেছে অবাধে ভগবানের আলো আর বাতাস!'

গৎফ্রীদের আর-একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সব কথাতেই সে ভগবানের নাম করত। ক্রিস্তফের বাবা আর ঠাকুরদা, দু'জনেই ছিলেন স্বাধীন চিন্তাওলাদের দলে, তাঁরা ভগবানকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করতেন না, দরকার হলে শুক্রবার রীতিমত মাংস ভক্ষণ করতেন। সেদিক দিয়ে গৎফ্রীদ ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী রীতিমত একজন ধর্ম-ভীরু লোক।

সহসা মেলশিয়র তার মত পরিবর্তন করল। কেন যে করল, ক্রিস্তফ তার কোন কারণই খুঁজে পেল না। তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একদিন বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলের ওপর মেলশিয়র রীতিমত ক্রুদ্ধই হয়েছিল, কিন্তু সহসা কি হলো কে জানে, ক্রিস্তফের সেই সব টুকরো টুকরো খেয়ালের দানকে একসঙ্গে গেঁথে

সঙ্গীতের রূপ দেবার জন্যে মেলশিয়র তার বুড়ো বাবাকে সমর্থন করতে লাগল এবং শুধু যে মুখের কথায় সমর্থন করল তাই নয়, ক্রিস্তফের সেই প্রথম সঙ্গীত-রচনার পাণ্ডুলিপি থেকে নিজের হাতে দু'তিনখানি কপি প্রস্তুত ক'রে ফেলল। সেসম্বন্ধে ক্রিস্তফ যদি কোন কথা তুলত, তাকে ভৎর্সনা না ক'রে এখন মিলশিয়র গম্ভীরভাবে বলত : 'আচ্ছা, সে-সম্বন্ধে ভেবে দেখা যাবে…' কখনও বা হাতে হাতে ঘসে হেসে উঠত, কিংবা আদর ক'রে ছেলের মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠত… কখনও বা রহস্য ছলে বালকের পিঠে মৃদু করাঘাত করত। হঠাৎ এতখানি আদর ক্রিস্তফ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না, তবে একটা কথা তার মনে হচ্ছিল যে, বাবা তার সম্বন্ধে সন্তুষ্টই হয়েছে, কেন যে হয়েছে তা সে ভেবে ঠিক পেত না।

ইদানীং তার বাবা আর ঠাকুরদা দু'জনে মিলে রহস্যজনকভাবে কি সব মতলব করতেন তাও সে বুঝে উঠতে পারত না। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে জানতে পারল, তার সেই প্রথম সঙ্গীত-রচনা, "শৈশবের স্মুখ-স্মৃতি" মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউক লিও-পোল্ডের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে মেলশিয়র প্রিন্সের মনোভাব যাচাই ক'রে দেখেছে এবং বুঝেছে যে রাজ-সুলভ-উদারতায় তিনি এই সম্মান আনন্দেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত আছেন। গ্রাণ্ড ডিউকের সেই সম্মতি পাওয়ার পর মেলশিয়র ঘোষণা করল : প্রথম, আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না ক'রে প্রথম প্রিন্সের নামে উৎসর্গ-পত্রটি যথোপযুক্ত লিখে ফেলতে হবে ; দ্বিতীয়, এই বইটি সঙ্গে সঙ্গে ছাপিয়ে ফেলতে হবে ; তৃতীয়, এই সঙ্গীতকে সাধারণের কাছে প্রচার করবার জন্যে একটা কনসার্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সম্পর্কে বাবা আর ঠাকুরদার মধ্যে বহুক্ষণ ধরে আলোচনা চলতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দু'জন রীতিমত উত্তেজিতভাবে বচসা করে। বাড়ির সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাদের কথাবার্তায় যেন কেউ কোন রকমের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে মেলশিয়র পত্র লিখতে বসে, লেখে আর কাটে কাটে আর লেখে। পাশে বসে বৃদ্ধ অনর্গল বকে চলেন, যা লিখতে হবে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তা কবিতার মতো আবৃত্তি ক'রে চলেন। হঠাৎ কোন একটা শব্দ ঠিক উপযুক্ত হলো কি না, তা নিয়ে দু'জনের তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়, টেবিল চাপড়িয়ে, চিৎকার করে দু'জনে যেন বাড়িখানা মাথায় ক'রে তোলেন।

খসড়া তৈরি হয়ে গেলে, ক্রিস্তফের ডাক পড়ে। জাঁ-ক্রিস্তফের হাতে কলম দিয়ে তার ডান দিকে বাবা চেয়ার নিয়ে বসল, বাঁ দিকে কাছ ঘেঁষে বসেন বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল। বৃদ্ধ খসড়া দেখে বলে চলেন, আর ক্রিস্তফ কলম নিয়ে লিখতে

আরম্ভ করে, কিন্তু সেই দীর্ঘপত্রের অধিকাংশ শব্দেরই মানে সে বুঝতে পারে না ; বুঝবার চেষ্টা করলেও, তার কোন সুযোগই পায় না ; কেন না, একদিকে বাবা তারস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে, আর বৃদ্ধ সেই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে ওঠেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ারে আর বসে থাকতে পারেন না, চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়-চারি করতে করতে রীতিমত অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে বক্তৃতা দিয়ে চলেন এবং ঠিকমত লেখা হচ্ছে কি না, তা দেখবার জন্য কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েন। মেলশিয়রও ঝুঁকে পড়ে দেখে, ছেলে তার সংশোধনকে গ্রহণ করছে কি না ; মাঝখানে বিহ্বলভাবে ক্রিস্তফ সেই দুই উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে কি লিখছে সেকথা ভুলে যায়, এবং মাঝে মাঝে জিভ বের ক'রে কলম তুলে বোকার মতো বসে থাকে। চোখের সামনে যেন সব ঝাপ্সা হয়ে যায়, লিখতে গিয়ে ভুল ক'রে বসে, অক্ষরগুলো অসমান হয়ে যায়, কাটাকুটি করতে হয়, একদিকে মেলশিয়র গর্জন ক'রে ওঠে, আর একদিকে ঝড়ের মতো এসে ভৎর্সনা করে। নতুন ক'রে আবার আরম্ভ করতে হয়, আবার ভুল হয়ে যায়, আবার নতুন ক'রে শুরু করতে হয়, এইভাবে যখন ক্রিস্তফ হাঁফ ছেড়ে বুঝল, লেখা শেষ হয়ে আসছে, তখন অকস্মাৎ কলম হতে এক ফোঁটা কালি কাগজের ওপর পড়ে গেল। দু'দিক থেকে দুজনে কান ধরে তাকে সজোরে চেয়ার থেকে টেনে তুলল, ক্রিস্তফের চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই চিৎকার ক'রে উঠল : 'খবরদার কাঁদবি না, চোখের জলে যে লেখা নষ্ট হয়ে যাবে মুখ্যু !' কাঁদবারও উপায় নেই ! আবার নতুন ক'রে গোড়া থেকে লিখতে হয়, ক্রিস্তফ লেখে আর ভাবে, বুঝি অনন্তকাল এই ভাবে লিখেই চলতে হবে।

অবশেষে পর্ব সমাপ্ত হলো। ক্রিস্তফের কাছ থেকে কাগজখানি নিয়ে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বৃদ্ধ আবৃত্তি করতে থাকেন, মেলশিয়র পা ছড়িয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ার দোলাতে দোলাতে মহাবিজ্ঞের মতো সায় দিতে থাকে। বৃদ্ধ পড়ে চলেন :

"হে মহামহিমার্ণব মান্যবর !
অনুগৃহীত-জনের মহদাশ্রয় ! হে রাজন্,

"মদীয় জীবনের চতুর্থ বর্ষ বয়ঃকাল হইতে সঙ্গীতই হইল আমার শৈশব-জীবনের সর্ব-প্রথম সাধনা। সেই অতি শিশুকালেই আমি আমার অন্তর সঙ্গীতের বরদাত্রী দেবীর চরণে অর্পণ করিয়াছি, দেবী পরম অনুগ্রহে আমার অন্তরকে বিমল মহা-সঙ্গতিতে বিকশিত করিয়া তোলেন। অন্তর দিয়া দেবীকে আমি ভালোবাসিয়াছিলাম, আমি জানি, তিনিও আমাকে সেই ভালোবাসাতেই গ্রহণ করিয়াছেন। অধুনা আমার বয়স মাত্র ছয়।

"কিছুকাল যাবৎ দিব্যমুহূর্তে আমি যেন শুনিতে পাই, সঙ্গীত-দেবী আমার শ্রবণে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া চলিয়াছেন : 'বৎস! মা ভৈ! তোমার অন্তরে যে হার্মনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে সঙ্গীতে রূপ দাও!' বিস্মিত হইয়া আমি ভাবি, আমি যে ছয় বৎসরের শিশু, কি করিয়া আমি এই দুঃসাহস অর্জন করিব? সঙ্গীতে যাঁহারা কৃতদর্শী পণ্ডিত, তাঁহারা বলিবেন কি? ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু দেবী তেমনি আদেশ দিয়াই চলিলেন। অবশেষে সম্মত হইলাম। সঙ্গীত রচনা করিলাম।

"তাই আজ আমি,

হে মহামহিমান্বিত পুরুষোত্তম!

কম্পান্বিতকলেবরে অসীম দুঃসাহসিকতায় উপস্থিত হইয়াছি, আপনার ঐ সিংহাসনের পাদমূলে আমার শৈশব সাধনার সর্ব-প্রথম ফলকে নিবেদন করিবার জন্য!…আমি কি সাহস করিয়া ভরসা করিতে পারি যে, আমার সেই দীন অর্ঘের উপর আপনার পিতৃ-স্নেহের সুমহান্ অনুগ্রহ-দৃষ্টি নিপতিত হইবে?…

"হাঁ, আমি জানি, আপনার উদার অন্তরে বিজ্ঞান আর আর্ট চিরকাল তাহাদের পরম নির্ভর আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে, আপনি হইলেন তাহাদের রক্ষক ও পালক, আপনারই সুপবিত্র লালন-পালনে প্রতিভার কুসুম ফুল্ল বিকশিত হইয়া উঠে।

"সেই সুগভীর আর নিঃসংশয় বিশ্বাসের বলেই আমার এই শৈশব-সাধনার অর্ঘ লইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

হে মহামহিমান্বিত পুরুষোত্তম!

একজন শিশুর নিষ্কলঙ্ক অন্তরের নিঃসংশয় শ্রদ্ধারূপে এই অর্ঘ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করুন। তাহার এই রচনা আর সেই সঙ্গে আপনার চরণে একান্ত শ্রদ্ধার অবনত-মস্তক তাহার রচয়িতার প্রতি অনুগ্রহের কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করুন। ইতি

মহামহিমান্বিত অশেষগুণাশ্রিত রাজাধিরাজের দীনতম,
একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য
"জাঁ-ক্রিস্তফ ক্রাফট।"

কিন্তু ক্রিস্তফের কানে কোন কথাই পৌঁছোয় না। সে শুধু এই ভেবে শান্তি পায় যে, লেখা শেষ হয়েছে। যদি আবার কোন কারণে লিখতে হয়, এই ভয়ে

সে ঘর থেকে ছুটে একেবারে বাড়ির বাইরে পালিয়ে যায়। সে যে কি লিখল তার কোন ধারাণাই তার ছিল না, তা জানবার জন্যও কোন আগ্রহ তার ছিল না।

একবার পড়ে যেন তার পূর্ণ স্বাদ পাওয়া গেল না, তাই বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার পড়তে শুরু ক'রে দিলেন। দ্বিতীয়বার পাঠ শেষ হলে মেলশিয়র ও বৃদ্ধ দু'জনেই ঘোষণা করল, উৎসর্গ-পত্রটি সত্যিই একটা অদ্ভুত রচনা হয়েছে। যখন জাঁ-ক্রিস্তফের পাণ্ডুলিপি সমেত সেই উৎসর্গ-পত্রটি গ্রাণ্ড ডিউকের নিকট নিবেদন করা হলো, তিনিও তার অপরূপত্ব স্বীকার করলেন। পরম অনুগ্রহে তিনি পরে মেলশিয়র আর বৃদ্ধকে জানালেন, সঙ্গীত-পুস্তক আর অনুসঙ্গী উৎসর্গ-পত্র, উভয়ই তাঁর প্রীতি উদ্রেক করেছে। সেই সঙ্গে তিনি কনসার্টেরও সম্মতি প্রদান করলেন এবং আদেশ দিলেন, সঙ্গীত-আকাদমির হল্ ঘর কনসার্টের জন্য মেলশিয়র ব্যবহার করতে পারে এবং অনুষ্ঠানের দিন বালক-রচয়িতাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করবারও সম্মতি দিলেন।

তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই অনুষ্ঠান করবার জন্য মেলশিয়র উঠে পড়ে লেগে গেল। অনুষ্ঠানের আগে ক্রিস্তফের সেই প্রথম রচনাটিকে যতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে ছাপাবার বন্দোবস্ত করা হলো। তার ইচ্ছে ছিল, মুদ্রিত পুস্তকের প্রচ্ছদপটে ক্রিস্তফের একটি ছবিও দেবে, ক্রিস্তফ পিয়ানোয় বসে বাজাচ্ছে, আর তার পাশে বেহালা হাতে মেলশিয়র দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে-বাসনা পরিত্যাগ করতে হলো,—অবশ্য খরচের জন্য নয়, মেলশিয়র এই অনুষ্ঠানকে সার্থক ক'রে তুলবার জন্য খরচের কোন কার্পণ্য করল না—পরিত্যাগ করতে হলো, কারণ সময় আর ছিল না। পুস্তকটির নাম-পত্রে দীর্ঘ উৎসর্গ-বাণীর সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে প্রিন্সের নাম মুদ্রিত হলো এবং পাতার মাথার কাছে এক লাইন বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হলো: "হের জাঁ-ক্রিস্তফ ক্রাফটের বয়স মাত্র ছয় বৎসর।" যদিও, প্রকৃতপক্ষে তার বয়স তখন সাড়ে সাত হয়েছিল। ছাপান ছাড়া, প্রচ্ছদ-পট আর নাম পত্রের সাজ-সরঞ্জামের দরুনও বিস্তর খরচ পড়ে গেল। বিল দেবার মতো নগদ পয়সা হাতে না থাকায় মেলশিয়র অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা কারুকার্যময় প্রাচীন সিন্দুক বিক্রয় করতে বাধ্য হলো। পুরনো আসবাব-পত্র ব্যবসায়ী ওয়র্মসার বহুবার মেলশিয়রকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, সেই প্রাচীন শিল্পদ্রব্যটি বিক্রয় ক'রে ফেলবার জন্য, কিন্তু মেলশিয়র কিছুতেই তখন রাজী হয় নি। আজ স্বেচ্ছায় তা বিক্রয় করতে হলো। তবে মেলশিয়রের মনে কোন সন্দেহই ছিল না যে, এই অনুষ্ঠান থেকে যে-টাকা পাবে তাতে তার সমস্ত খরচ পত্রই উঠে আসবে।

আর একটা দুশ্চিন্তা তখন পেয়ে বসল: অনুষ্ঠানের দিন ক্রিস্তফকে কি পোশাকে উপস্থিত করা হবে। তার মীমাংসার জন্য বাড়িতে সভা বসল। মেলশিয়র জানাল, তার বাসনা চার বছরের শিশু যেমন সাদাসিধে ভাবে থাকে, ক্রিস্তফ সেই ভাবেই পোশাক পরবে। কিন্তু চার বছরের শিশু বলে তো তাকে আর চলান যায় না, তা ছাড়া তার বয়সের পক্ষে তাকে রীতিমত ভারী দেখায়, আর সবাই তাকে চেনে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর মেলশিয়রের মাথায় আর একটা বুদ্ধি জেগে উঠল, শাদা টাই-এর সঙ্গে রীতিমত ড্রেস-স্যুট তাকে পরালে কেমন হয়! লুইসা-প্রতিবাদ করল, ছোট ছেলেকে সেই পোশাকে হাস্যকর দেখাবে। কিন্তু মেলশিয়র তার প্রতিবাদে কর্ণপাতই করল না। বলল, তার বিশ্বাস লোকে খুশি হবে, সেই বিচিত্র পোশাকের আকস্মিকতায় লোকে রীতিমত মজা পাবে। মেলশিয়রের কথাই থেকে গেল। তৎক্ষণাৎ দরজীর ডাক পড়ল। দরজী এসে সেই ছোট্ট মানুষটির কোটের মাপ নিল। পোশাকের জন্যে যে কাপড় বেছে দেয়া হলো তা রীতিমত দামী এবং সেই সঙ্গে একটা পেটেণ্ট-লেদারের ভাল জুতোও কেনা হলো। মেলশিয়রের হাতে শেষ-কপর্দক পর্যন্ত তাতে নিঃশেষিত হয়ে গেল। সেই নতুন পোশাকে কিন্তু ক্রিস্তফের অস্বস্তি হতে লাগল। অনুষ্ঠানের আগে পুরো একমাস ধরে পিয়ানোর টুল হতে সে আর ছুটিই পেল না। ভিতরে ভিতরে রাগে আর যন্ত্রণায় গুমরাতে থাকে, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রে একটা বিস্ময়কর কিছু সে করতে যাচ্ছে, সুতরাং এসব সহ্য করাই উচিত। সেই বিস্ময়কর সম্ভাবনার কথা মনে ভাবতে রীতিমত একটা গর্ব অনুভব করে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অজানা আতঙ্কও তাকে পেয়ে বসে। বাড়ির লোকেরা রীতিমত আদরে তাকে উৎসাহ দিয়ে চলে। সর্বদাই তাকে চোখে রাখতে চেষ্টা করে, পাছে অসুখে পড়ে যায়, কিংবা ঠাণ্ডা লাগে। তাই সব সময়েই গলায় একটা কাপড় জড়িয়ে তাকে থাকতে হয়, পায়ের জুতো দু'বেলা আগুনে সেঁকে গরম ক'রে দেওয়া হয়, খাবার টেবিলে ভাল জিনিসটি আগে তাকে পরিবেশন করা হয়।

অবশেষে সেই মহা-দিবস এসে উপস্থিত হলো। সকাল বেলা নাপিত এসে তার অবাধ্য চুলগুলোকে শাসন ক'রে সুচিক্কণ কুঞ্চিত করতে বসল এবং যতক্ষণ না তা মনমত হলো, ততক্ষণ ক্রিস্তফকে মাথা বিকিয়ে বসে থাকতে হলো। নাপিত সজ্জা ঠিক ক'রে দিলে, বাড়ি শুদ্ধ লোক একে একে তাকে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখল, সকলেই একবাক্যে বলল: 'চমৎকার!' মেলশিয়র এসে তাকে নেড়ে চেড়ে, সামনে পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ক'রে দেখল; হঠাৎ

মনে হলো, একটি জিনিস বাকি থেকে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে গিয়ে একটি ফুল সংগ্রহ ক'রে আনল এবং কোটের বোতাম-ঘরে সন্নিবেশিত ক'রে দিল। কিন্তু লুইসা পুত্রের সজ্জা দেখে চিৎকার ক'রে উঠল: 'এ যে বাঁদরের সাজ হয়েছে!' কথাটা ক্রিস্তফের মনে কাঁটার মতো বিঁধে গেল। ঠিক বুঝতে পারল না, সে পোশাকে সে গর্বিত হবে, না লজ্জিত হবে।

এই সমস্ত ব্যাপারের জন্য মনের ভিতর আপনা থেকেই সে নিদারুণ একটা হীনতা অনুভব করে, সে-হীনতা-বোধ কনসার্টের সময় যেন আরো বেড়ে যায়। তার জীবনের সেই প্রথম স্মরণীয় দিবসের স্মৃতি তার চিত্তে অব্যক্ত হীনতার বেদনায় জাগরূক হয়ে থাকবে।

এইবার কনসার্ট আরম্ভ হবে। প্রেক্ষাগৃহ অর্ধেক খালি পড়েছিল, গ্রাণ্ড ডিউক তখনও এসে পৌঁছোন নি। সচরাচর এই জাতীয় ব্যাপারে কোথা থেকে একজন-না-একজন হিতাকাঙ্ক্ষী এসে উপস্থিত হয়, সেই রকম একজন বন্ধু গায়ে পড়ে জানাল যে, প্রাসাদে হঠাৎ একটি জরুরী বিষয়ে সভা করতে হচ্ছে বলে গ্রাণ্ড ডিউক আসতে পারবেন না। বিশ্বস্তসূত্রে সে এই সংবাদ জানতে পেরেছে। শুনে মেলশিয়র হতাশ হয়ে পড়ল। চঞ্চল হয়ে পায়চারি করতে শুরু ক'রে দেয় আর ঘন ঘন জানালায় গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে। বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলও এই সংবাদে রীতিমত ক্ষুণ্ণ ও ব্যথিত হলেন কিন্তু নাতিকে নিয়ে তিনি তখন এত ব্যস্ত যে, সেদিকে আর ভাববার অবকাশ পাচ্ছিলেন না। কি করতে হবে, কি করতে হবে না, তার ফিরিস্তি বারবার ক'রে বালকের কানে সগর্জনে বর্ষণ করতে থাকেন। তার চারদিকে আপনজনের সেই উৎকন্ঠিত চাঞ্চল্য ক্রিস্তফকেও পেয়ে বসে। নিজের সঙ্গীতের কথা তখন আদৌ তার মাথায় ছিল না, তার পরিবর্তে সে ভাবছিল, কি ক'রে মাথা নত ক'রে অভিবাদন করতে হবে, এবং সেই দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে আরো যেন মুসড়িয়ে পড়ছিল।

অবশেষে তাকে আরম্ভ করতেই হলো। শ্রোতারা চঞ্চল অধীর হয়ে উঠছিল। এই অনুষ্ঠানে মেলশিয়র "হফ্ ম্যুজিক ভেরিয়িন" অর্কেস্ট্রা-দলকে নিযুক্ত করেছিল তারা কোরিওলান্ 'ওভারচার' বা প্রারম্ভিক গৎ বাজাতে শুরু ক'রে দিল। যদিও বহু বার বিটোফেনের সঙ্গীত সে শুনেছে, তবুও কোরিওলান্ অথবা বিটোফেন, নাম ধরে ক্রিস্তফ কোন সঙ্গীতকেই চিনত না, জানত না। যে সব সঙ্গীত সে শুনত, তাদের নাম বা পরিচয় জানবার জন্য তার এতটুকুও আগ্রহ ছিল না। নিজের মতো ক'রে সে সেই সব সঙ্গীতের নামকরণ ক'রে নিত এবং তাদের সুর নিয়ে মনে

মনে নিজের মতন সব ছবি সৃজন ক'রে চলত। সাধারণতঃ তখন পর্যন্ত যে-সব সঙ্গীত সে শুনেছিল মনে মনে সে তাদের তিনটি স্বতন্ত্র রূপ ঠিক ক'রে নিয়েছিল : আগুন, জল আর পৃথিবী ; মোজার্টের সঙ্গীতের সঙ্গে ছিল জলের সংযোগ, মোজার্টের সঙ্গীত যেন নদীর ধারে সবুজ প্রান্তর, নদীর ওপরে ভাসমান প্রভাতের স্বচ্ছ কুয়াশা, যেন ঝর্ণার ধারা, কিম্বা বর্ষা-অন্তে রামধনু। বিটোফেন হলো আগুন : কখনও শতশিখাময় জলন্ত অগ্নিকুণ্ড, তাকে বেষ্টন ক'রে উঠছে মেঘচুম্বী ধূম্রস্তম্ভ, কখনও বা মনে হতো, সমস্ত অরণ্য যেন আগুনে জলে উঠছে, মাথার উপর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর মেঘভার, তাকে দীর্ণ বিদীর্ণ ক'রে চমকিয়ে উঠছে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ, কখনও বা মনে পড়ত নক্ষত্র-বিছানো উদার অনন্ত আকাশ, সহসা সেই নক্ষত্র-পুঞ্জ থেকে একটা বিদ্রোহী নক্ষত্র অগ্নিস্নান হয়ে পৃথিবীর দিকে তীব্র-বেগে জলতে জলতে ছুটে আসছে, অবশেষে হেমন্তের রাত্রির স্নিগ্ধতায় আপনাকে নিভিয়ে নিঃশেষ ক'রে দিল, বালকের অন্তরের স্পন্দন তখন সহসা দ্রুততর হয়ে উঠত।

আজ এই মুহূর্তে বিটোফেনের বীর-অন্তরের সেই দুরন্ত দুর্দান্ত বহ্নিশিখা সহসা যেন তাকে পেয়ে বসল। তার বিদ্যুৎ-স্পর্শে নিমেষে অন্তর হতে সব চিন্তা যেন দূরীভূত হয়ে গেল। তার চারদিকে, এই যে মেলশিয়র হতাশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, জাঁ-মিশেল উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত, লোকজনের ভিড়, শ্রোতাদের অধীরতা, গ্রাণ্ড ডিউক আসলেন, না, আসলেন না, কি এসে যায় তার ? এদের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক ? তার আর এদের মাঝখানে কে আছে দাঁড়িয়ে ? সে কি সে নিজে ?...তার ভিতরে আর একজনকার যেন দুরন্ত মন তাকে সুতীব্রবেগে টেনে নিয়ে চলে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কাঁপছে, দু'পা যেন নিথর হিম হয়ে আসছে, কোথা হতে চোখে অশ্রু উদ্‌গত হয়ে উঠছে সে কিছুই জানে না। সে নিজেকে অন্তরের সেই দীপ্যমান বহ্নিশিখার নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে দিয়েছে। শিরায় রক্ত-প্রবাহ যেন তার কানে এসে বলছে : 'এগিয়ে চল, ঝাঁপিয়ে পড় !' সে আদেশে থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গ। দ্রুত দুলতে থাকে হৃদ্‌পিণ্ড। এমন সময় অর্কেষ্ট্রা সহসা এক মুহূর্তের জন্য গতির মধ্যে হঠাৎ থেমে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ আবার সেই ক্ষণিক নীরবতাকে ভঙ্গ ক'রে সামরিক অভিযানের বিপরীত ছন্দে গর্জে উঠল। এক ধরনের সুর থেকে তার বিপরীত ধরনে যাওয়ার মধ্যে এমন একটা অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত ক্রিস্তফের কানে এসে লাগল যে, দাঁতে দাঁত দিয়ে কোন রকমে চুপ ক'রে রইল বটে, কিন্তু রাগে মাটিতে পা ঠুকে

নিরুপায় হয়ে দেয়ালের দিকে ঘুষি খুলে মনের আক্রোশকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করল।

সঙ্গীতের মাঝখানে সহসা এইরকম বে-আইনী ও বেয়াড়া পরিবর্তন কেন ঘটল তা ক্রিস্তফ না বুঝলেও মেলশিয়র বুঝতে পারল এবং বুঝতে পেরে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। সঙ্গীতের মাঝ বরাবর মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউককে প্রবেশ করতে দেখে, অর্কেষ্ট্রার বাদকরা তাঁকে অভিনন্দন করবার জন্যে এইভাবে সহসা জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে উঠেছিল। গ্রাণ্ড ডিউকের আগমনে বৃদ্ধ জাঁ-মিচেলও তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে কম্পিতকণ্ঠে ক্রিস্তফকে শেষবারের মতন সমস্ত হদিস বাৎলিয়ে দিলেন।

অভিনন্দনের পালা শেষ হয়ে গেলে অর্কেষ্ট্রা পুনরায় আরম্ভের সুরে ফিরে এল এবং যথারীতি শেষ করল। এবার জাঁ-ক্রিস্তফের পালা। মেলশিয়র এমন-ভাবে প্রোগ্রাম সাজিয়ে ছিল যাতে পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিতার কৃতিত্বও লোকের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দু'জনে মিলে পিয়ানো ও বেহালায় মোজার্টের একটা সোনাটা বাজাবে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তারা দু'জনে একসঙ্গে প্রবেশ করবে না। তা হলে মেলশিয়রের আবির্ভাবের নাটকীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে। মেলশিয়র তাই স্থির করেছিল জাঁ-ক্রিস্তফ একাই প্রথমে প্রবেশ করবে। স্টেজের প্রবেশ-দ্বারের কাছে ক্রিস্তফকে হাত ধরে এনে মেলশিয়র সেখান থেকে তাকে রঙ্গমঞ্চস্থ পিয়ানোটি দেখিয়ে কোথায় কিভাবে বসতে হবে, কি করতে হবে, শেষবারের মতন আবার ভাল ক'রে বলে দিল। তারপর রঙ্গমঞ্চের পাশ থেকে তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল।

থিয়েটার সম্বন্ধে তার ভয় অবশ্য কেটে গিয়েছিল, কিন্তু আজ সহসা রঙ্গমঞ্চে একা প্রবেশ ক'রে সামনেই তাকাতে গিয়ে যখন দেখল, অগুনতি চক্ষু তারই দিকে চেয়ে আছে, সহসা এক তুমুল ভীতি তাকে পেয়ে বসল এবং বাবা আর ঠাকুরদার সমস্ত উপদেশ ভুলে শ্রোতাদের দিকে পিছন ক'রে উইঙ্গসের দিকে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু সামনেই দেখল, বাবার রক্তচক্ষু তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাকে লক্ষ্য ক'রে হাত-পা ছুঁড়ছে। নিরুপায় বালক পিয়ানোর দিকে এগিয়ে যায়। ইতিমধ্যে শ্রোতারা তাকে দেখে ফেলেছে। এক-পা এক-পা ক'রে যেমন সে এগোয়, শ্রোতাদের কৌতূহলও সেই সঙ্গে বেড়ে ওঠে এবং ক্রমশঃ তাদের মৃদু হাসির রোল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে অট্টহাসিতে দুলিয়ে দেয় এবং সে-হাসি আর থামতেই চায় না। মেলশিয়র ঠিক এমনটিই আশা করেছিল, ক্রিস্তফের পোশাক দেখে শ্রোতারা যে এরকম উল্লসিত হয়ে উঠবে, তা সে ঠিকই অনুমান করেছিল। একরাশ লম্বা লম্বা চুল আর জিপ্সীদের মতন গায়ের রঙ সেই ছোট্ট শিশুকে

রীতিমত একজন ভারিক্কি মানুষের পুরো সান্ধ্য-পোশাকে ধীর পদক্ষেপে চলতে দেখে শ্রোতারা হেসে লুটিয়ে পড়ে। তাকে ভাল ক'রে দেখবার জন্যে তারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ সেই অট্টহাস্যের রোলে দুলে ওঠে। অবশ্য সে-হাসির মধ্যে বিরূপ বিরোধিতা কিছু ছিল না কিন্তু তাতে অবিচলিত থাকা রীতিমত কড়া পেশাদার নট-নটীর পক্ষেও দুরূহ। চারদিকে শত শত চোখ তারই দিকে তাকিয়ে আছে, এই চিন্তায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই তুমুল অট্টহাস্যের শব্দে ক্রিস্তফ ভীত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, মনের মধ্যে তখন একটি মাত্র চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে: কোনরকমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিয়ানোতে তার নির্দিষ্ট আসনে বসা। সে বেশ বুঝেছিল, সেই আকুল সমুদ্রের মধ্যে পিয়ানোর সামনের আসনটুকুই হলো তার একমাত্র রক্ষাদ্বীপ। মাথা নত ক'রে. ডাইনে বা বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে একরকম ছুটে সে মঞ্চের মাঝামাঝি এসে পড়ে, সেখান থেকে শ্রোতাদের মাথা নত ক'রে অভিবাদন করবার কথা ছিল, মেলশিয়র আর বৃদ্ধ বারবার ক'রে সে-কথা তাকে বলে দিয়েছিল এবং বহুবার তার রিহার্সালও দিতে হয়েছিল, কিন্তু জাঁ-ক্রিস্তফ তা একেবারে ভুলে গেল, সেখান থেকে পিছন ফিরে সে কোনরকমে পিয়ানোর সামনে টুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে এসে আর এক বিপত্তি ঘটল। টুলটি তার পক্ষে এত উঁচু যে নিজে কিছুতেই স্বচ্ছন্দে তার ওপর উঠে বসতে পারল না। বিভ্রান্ত বেদনায় কি করবে ঠিক ক'রে উঠতে না পেরে সে কোন রকমে হাঁটু দিয়ে তার ওপর উঠে বসল। তাতে শ্রোতারা আর-এক দফা আরো জোরে হেসে উঠল, কিন্তু এখন আর তাতে ক্রিস্তফের কিছু এসে যায় না। সে তার পরিচিত আশ্রয়স্থলে এসে পৌচিয়েছে। সেখানে বসে সে জগতের কোন কিছুকেই ভয় করে না।

অবশেষে, মেলশিয়র প্রবেশ করল। শ্রোতারা তখন খোশ-মেজাজেই ছিল তাই তাকেও বিপুলভাবে অভিনন্দিত ক'রে উঠল। যন্ত্রের দোলায় সোনাটা আরম্ভ হয়ে গেল। পিয়ানোর পর্দার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, একাগ্রতায় দুই ওষ্ঠ সুসংবদ্ধ, জাঁ-ক্রিস্তফ নিখুঁতভাবে বাজিয়ে চলল। যতই সঙ্গীত এগিয়ে চলে, ততই সে নির্ভয় হয়ে উঠে, যেন তার পরিচিত বন্ধুমহলে সে এসে পড়েছে। প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রশংসার ধ্বনি তার কানে পৌছোয়; তার বাজনা শুনবার জন্যেই সেই বিরাট প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে আছে, ভাবতেই তার সর্বশরীরে আনন্দ আর গর্বের রোমাঞ্চ জেগে ওঠে। কিন্তু বাজনা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে আবার সেই আতঙ্ক ফিরে এল এবং শ্রোতাদের আনন্দ-করতালিতে আনন্দের চেয়ে সে বেশী

যেন লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ল। মেলশিয়র যখন তার হাত ধরে পাদপ্রদীপের সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে শ্রোতাদের অভিবাদন করতে ইঙ্গিত করল, লজ্জায় সর্ব-শরীর যেন অবশ হয়ে এল। মেলশিয়রের আদেশ সে পালন করল বটে কিন্তু এমন ছোট ক'রে মাথা নত করল যে, সেই অনভ্যস্ত বে-কায়দায় শ্রোতারা হেসে উঠল। লজ্জায় ক্রিস্তফ আরক্তিম হয়ে ওঠে, যেন হাস্যকর কুৎসিত কিছু ক'রে ফেলেছে।

তাকে আবার গিয়ে পিয়ানোয় বসতে হলো কারণ, তখন আসল জিনিসই বাকি ছিল। পিয়ানোয় ফিরে গিয়ে সে তার নিজস্ব রচনা, "শৈশবের সুখস্মৃতি" বাজাতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গীত শুনে শ্রোতারা সত্যিই বিমুগ্ধ হয়ে গেল। প্রত্যেক অংশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা সোৎসাহে করতালি দিয়ে ওঠে। এবং একবার বাজানো শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার গোড়া থেকে বাজাবার জন্য অনুরোধ করে। জাঁ-ক্রিস্তফ আজ জয়ী। গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে। দ্বিতীয়বার বাজনা শেষ হলে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল। ক্রিস্তফ তখন একলা পিয়ানোর টুলে বসেছিল, সাহস ক'রে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারল না। শ্রোতারা আরো উত্তেজিত হয়ে তার জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। লজ্জায় তার মাথা ক্রমশঃ আরো যেন নত হয়ে আসতে থাকে, অবনত-মস্তকে সে জনতার বিপরীত দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ ক'রে বসে থাকে। অবশেষে মেলশিয়র এসে তাকে উদ্ধার করল। হাত ধরে তাকে আসন থেকে তুলে নিয়ে পাদপ্রদীপের দিকে এগিয়ে গেল এবং জনতার অভিবাদনের উত্তরে রঙ্গমঞ্চ থেকে চুম্বন ছুঁড়ে দেবার জন্য বালককে আদেশের স্বরে বলল। গ্রাণ্ড ডিউক কোথায় বসে আছেন, ইঙ্গিতে বালককে তা দেখিয়ে দিল। কিন্তু কোন কথাই ক্রিস্তফের কানে পৌঁছোয় না। মেলশিয়র ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে নিম্নস্বরে বালককে ভৎর্সনা করে। অগত্যা বালক নির্দেশ মতো সবই করল, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কারও দিকে ফিরে দেখল না, এমন কি মাটির দিক থেকে একবারও চোখ তুলে চাইল না; কোন রকমে মাথা ঘুরিয়ে চলে যেতে পারলে যেন সে বাঁচে। এমন জয়ের মুহূর্তে, অন্তরের অন্তস্তল কোথা হতে ছেয়ে আসে নিরানন্দে নিদারুণ অস্বস্তিতে। কেন, তা সে বুঝতে পারে না, বেদনায় ভরে ওঠে মন। তার আত্ম-সম্মানে কোথায় যেন সুতীব্র আঘাত লাগে। তার আশে পাশে চারদিকে যেসব লোক তাকেই অভিনন্দিত করছে, ভাল লাগে না তাদের। এখন কেন তারা তার জয়ধ্বনি করছে? সে ভোলে নি, কিছুক্ষণ আগেই তাকে দেখে তারা হেসে উঠেছিল, তার সঙ্কোচের অনভ্যস্ততায় তারা রীতিমত মজা পেয়েছিল! না, না, সে কিছুতেই

তাদের ক্ষমা করবে না। তাদের উদ্দেশ্যে চুম্বন বর্ষণ করবার জন্যেই কোমরে হাত দিয়ে তাকে শূন্যে তুলে ধরা হয়েছিল, কি হাস্যকর অবস্থাতেই না তাকে পড়তে হয়েছিল, রাগে তাদের অভিনন্দন পর্যন্ত ক্রিস্‌তফের বিরাগের কারণ হয়ে উঠল। শূন্য থেকে মেলশিয়র যখন তাকে নামিয়ে দিল, কোন দিকে না তাকিয়ে সে সোজা উইঙ্‌সের দিকে ছুটল। যখন ছুটে যাচ্ছিল, প্রেক্ষাগৃহ থেকে একজন মহিলা এক গুচ্ছ ভায়োলেট ফুল তার গায়ে ছুঁড়ে দিল, সজোরে সেই পুষ্পগুচ্ছ তার মুখে এসে লাগল। কি না কি, আতঙ্কে চমকিয়ে উঠে দ্রুত চলতে গিয়ে সামনের এক চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। যত জোরে সে ছোটে, শ্রোতারা তত জোরে হেসে ওঠে, যত জোরে তারা হাসে, তত জোরে সে ছুটতে আরম্ভ করে।

অবশেষে রঙ্গমঞ্চের বাইরে মঞ্চ-দ্বারের কাছে এসে উপস্থিত হলো। সেখানে দেখে, একদল লোক তারই দিকে তাকিয়ে আছে। বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, একরকম তাদের ধাক্কা দিয়েই সে ছুটে পেছনের একটি ঘরের আড়ালে এসে হাঁফ ছাড়ল। ঠাকুরদা তার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসেছিলেন, বৃদ্ধের আজ উল্লাসের শেষ নেই। আশীর্বাদে তাকে অভিষিক্ত ক'রে ফেলেন। অর্কেষ্ট্রার বাদকরা তার কাছে এসে উল্লসিত কণ্ঠে হাসতে থাকে এবং প্রত্যেকেই অভিনন্দন জানায় কিন্তু ক্রিস্‌তফ কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পারে না, করমর্দনের জন্য হাত বাড়াতে পর্যন্ত পারে না। মেলশিয়র কান খাড়া ক'রে শোনে, তখনও পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে করতালি উঠচে, স্থির করে জাঁ-ক্রিস্‌তফকে সে আবার মঞ্চে নিয়ে যাবে। কিন্তু ক্রিস্‌তফ রীতিমত ক্রুদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াল, ঠাকুরদার জামা ধরে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল, যে কেউ তাকে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করল, হাত-পা ছুঁড়ে সে তাদের ফিরিয়ে দিল। অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে সে কেঁদে ফেলল। অগত্যা তাকে ছেড়ে দিতে হলো।

ঠিক সেই সময় একজন অফিসার এসে জানাল, মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউক তাঁর বক্সে শিল্পীকে আনবার জন্য বাসনা জানিয়েছেন। সেই অবস্থায় কি ক'রে বালককে গ্রাণ্ড ডিউকের সামনে উপস্থিত করানো যায়? রাগে মেলশিয়র গালাগাল দিয়ে উঠল, কিন্তু মেলশিয়র যত গালাগাল দেয়, বালক ততই কাঁদতে থাকে। অবশেষে বৃদ্ধ জাঁ-মিচেল নিভৃতে বালককে টেনে নিয়ে শপথ করল, যদি সে কান্না থামায় তা হ'লে তিনি এক পাউণ্ড চকোলেট তাকে কিনে দেবেন। বৃদ্ধ জানতেন, চকোলেট সম্বন্ধে ক্রিস্‌তফের দুর্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে বালক স্তব্ধ হয়ে গেল, সমস্ত কান্না চেষ্টা ক'রে যেন গিলে ফেলল। বালক যেতে প্রস্তুত হলো কিন্তু তার আগে

তার কাছে অঙ্গীকার করতে হলো যে, রঙ্গমঞ্চের উপর আর তাকে নিয়ে যাওয়া হবে না।

গ্রাণ্ড ডিউকের বক্সের সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটিতে ক্রিস্তফকে যখন গ্রাণ্ড ডিউকের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো, তিনি রহস্যচ্ছলে অন্তরঙ্গের মতন বালককে কাছে টেনে নিয়ে হেসে সম্বোধন ক'রে উঠলেন : 'এস ! নব কলেবরে নতুন মোজার্ট !' তার পর পর্যায়ক্রমে তাকে গ্রাণ্ড ডাচেস, আর তাঁর কন্যা এবং দলের অন্যান্য লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু চোখ তুলে একবারও সে কারও দিকে চেয়ে দেখল না, দেখল শুধু কোমরের নীচে কোটের অংশ আর স্কার্টের ঝালর। তরুণী রাজকুমারী তাকে আদর ক'রে কোলে বসাল, নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে কাঠ হয়ে সে কোনমতে বসে রইল মাত্র। রাজকুমারী তাকে যত প্রশ্ন করল, একটিরও উত্তর সে দিতে পারল না, তার হয়ে মেলশিয়র একান্ত অনুরক্ত দীন ভৃত্যের মতো গদ্‌গদ-কণ্ঠে প্রাণহীন স্তোক বাক্যে উত্তর দিয়ে চলল ; কিন্তু সে-উত্তরের জন্য রাজকুমারীর কোন আগ্রহই ছিল না, সে অনবরত চেষ্টা করছিল, কি ক'রে সেই বালকের মুখ থেকে কথা বার করা যায়।

লজ্জায় ক্রিস্তফ ক্রমশঃ আরক্তিম হয়ে উঠছিল এবং যতই লজ্জায় সে আরক্তিম হয়ে উঠছিল, ততই তার মনে হচ্ছিল তার মুখের দিকে নিশ্চয়ই সবাই তাকিয়ে আছে, নিশ্চয়ই সবাই ভাবছে, কেন তার মুখ এত লাল হয়ে উঠল। আবার অন্যরকম কিছু মনে না ক'রে তাই তাদের একটা কিছু বুঝিয়ে বলা দরকার। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রিস্তফ বলে ওঠে :

'আমার মুখ ঐ রকমই লাল···মানে···আমি—'

রাজকুমারী হো হো ক'রে হেসে ওঠে। কিন্তু সে-অট্টহাসি এবার ক্রিস্তফের খুব খারাপ লাগল না। কিছুক্ষণ আগে শ্রোতাদের অট্টহাসিতে সে যে রকম ক্ষেপে উঠেছিল, রাজকুমারীর হাসিতে কিন্তু রাগের কোন কারণ দেখতে পেল না। বরং তার হাসি মধুরই লাগল। রাজকুমারী আদর ক'রে তাকে চুম্বন করল, ক্রিস্তফের ভালই লাগল।

ক্রিস্তফ সেখান থেকে দেখল, ঠাকুরদা গ্রাণ্ড ডিউকের বক্সের বাইরে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আনন্দে প্রোজ্জ্বল মুখ কিন্তু কুণ্ঠায় বিনম্র। বৃদ্ধের অন্তরের প্রবল বাসনা ছিল, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাল না, কেউ তাঁকে ডাকেও নি। দূরে দাঁড়িয়ে তিনি পৌত্রের গৌরব নীরবে অনুভব করছিলেন ঠাকুরদাকে দেখেই ক্রিস্তফের অন্তর বেদনায় সকরুণ হয়ে উঠল, মনের

মধ্যে এক দুর্বার বাসনা জেগে উঠল বৃদ্ধের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছে, সে অন্ততঃ তা সহ্য করবে না, বৃদ্ধের কৃতিত্ব লোককে জানাতে হবে। নিজের জন্যে যা সে পারে নি, বৃদ্ধের জন্যে তা সে অবলীলাক্রমে করল। তার নতুন বন্ধু রাজকুমারীর কানে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে সে বলে উঠল : 'একটা গোপন কথা আপনাকে বলবো !'

রাজকুমারী গাম্ভীর্যে হেসে উঠে বলল : 'কি ?'

জাঁ-ক্রিস্তফ বলে : 'আপনার মনে আছে আমি যে-সঙ্গীত বাজালাম—তার মিনুয়েতো অংশে যে ত্রিয়ো ছিল···মনে পড়েছে তো ?' (আস্তে আস্তে গুঞ্জন ক'রে সেই অংশটুকু সে শুনিয়ে দেয়)···'আপনি জানেন, সেটুকু কার রচনা ? আমার ঠাকুরদা সেই অংশটুকু রচনা করেছেন, আমি নই। অবশ্য বাকি সব আমারই। কিন্তু ঐ ত্রিয়োটুকুই তো আমার রচনার মধ্যে সব চেয়ে ভাল ··না ? সেটা ঠাকুরদাই তৈরি করেছেন তাঁরই সৃষ্টি ! অবশ্য ঠাকুরদা আমাকে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন যেন আমি কাউকে না জানাই। আপনি নিশ্চয়ই আর কাউকে বলবেন না। কেমন ?' (বৃদ্ধকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে) 'উনিই হলেন আমার ঠাকুরদা। আমি খুব ভালোবাসি ওঁকে···আমাকেও উনি কত যে ভালোবাসেন !'

জাঁ-ক্রিস্তফের কথায় রাজকুমারী আনন্দে হেসে উঠে বলে : 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি সোনা, তুমি মনা !' সেই সঙ্গে চুম্বনে চুম্বনে তাকে অভিষিক্ত ক'রে তোলে এবং ক্রিস্তফের নিষেধ ভুলে গিয়ে দলের সকলকে ডেকে তার ঠাকুরদার কৃতিত্বের কথা জানিয়ে দেয়। সকলেই আনন্দে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানায়। গ্রাণ্ড ডিউক খুশি হয়ে বৃদ্ধকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করলেন, কিন্তু বৃদ্ধ আনন্দের আতিশয্যে এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, অপরাধী আসামীর মতন স্পষ্ট ক'রে কিছু উচ্চারণ করতেই পারলেন না। ক্রিসতফ কিন্তু আর কোন কথাই বলতে পারে না। ঠাকুরদার সম্বন্ধে তার যে নির্ভীকতা ছিল, নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজকুমারী বহু চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে আর কোন কথা বের করতে পারল না। সে তেমনি কাঠ হয়ে বসে রইল। এবার মনে মনে রাজকুমারীর ওপর তার নিদারুণ রাগ হলো। অন্য কাউকেও বলতে যে বারণ করল, আর কিনা রাজকুমারী সকলকে ডেকে তা বলে দিল ! এ জাতীয় অপরাধ, অন্ততঃ রাজকুমারী সম্পর্কে সে ক্ষমা করতে পারে না !

রূপকথার রাজকুমারী সম্পর্কে তার মনে যে ধারণা ছিল, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তার অন্তরের কথা যে রাজকুমারী তার কাতর মিনতি সত্ত্বেও এ ভাবে সকলকে জানিয়ে দিতে পারল, তাকে কি ক'রে আর রাজকুমারী বলে সে শ্রদ্ধা

করবে? তাই তাকে কথা বলাবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে কাঠ হয়ে রইল, একটা কথাও আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল না, যেন সে বোবা। তার বিশ্বাসের এই অপব্যবহারে সে এতদূর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে, আশেপাশে যে সমস্ত কথা হচ্ছিল, তার কিছুই তার কানে প্রবেশ করছিল না, এমনকি প্রিন্স রহস্য ক'রে যখন বললেন অতঃপর জঁা ক্রিস্তফকে তিনি তার রাজসভায় বেসরকরী পিয়ানো-বাদক নিযুক্ত করলেন, ক্রিস্তফ শুনতেই পেল না।

সেখানকার পালা শেষ ক'রে থিয়েটারের নিষ্ক্রমণ-পথের ওপর যখন এসে দাঁড়াল, চারদিক থেকে লোকে তাকে ঘিরে দাঁড়াল, অভিনন্দন জানাল। এমনকি যখন থিয়েটার ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াল, তখনও লোকে তাকে ঘিরে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল, কেউ কেউ এসে তাকে চুম্বন করল। যে কেউ তার অনুমতি না নিয়েই এভাবে তাকে চুম্বন করবে! আর সে তা সহ্য করবে! ভারী বিশ্রী লাগে।

অবশেষে তারা বাড়ি এসে পৌঁছলো। বাড়িতে পা দিতে-না দিতে মেলশিয়র ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলল, সে একটা আস্ত গাধা, কেন সে বাইরের লোকদের জানিয়ে দিল যে, ত্রিয়ো-অংশটা তার রচনা নয়? ক্রিস্তফ এই ভৎর্সনায় বিস্মিত হয়ে যায়। তার ধারণা, এই কথা বলে সত্যিই সে ঠিক কাজই করেছে, আর এভাবে সত্য কথা বলা তো তার মহান্ কর্তব্য, এই তো তার অন্তরেরও নির্দেশ। এর জন্য তার প্রাপ্য হওয়া উচিত অকুণ্ঠ প্রশংসা আর সে পাচ্ছে কিনা তিক্ত ভৎর্সনা! তাই বাবার সেই রূঢ় ভৎর্সনায় সে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বাবার মুখের ওপর জানিয়ে দিল তার ভৎর্সনাকে সে গ্রাহ্য করে না, অন্যায় সে মোটেই করে নি।

ছেলের এই অবাধ্যতায় মেলশিয়রের মেজাজ বিগড়িয়ে যায়, শাসিয়ে ওঠে: 'কান মলে ঠাণ্ডা ক'রে দেব!' অবশ্য বাজনা সে ভালই বাজিয়েছে কিন্তু তার মূর্খতায় আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে গিয়েছে।

বাবার এই ভৎর্সনা ভয়াবহ অন্যায়রূপে বালকের অন্তরকে আহত করল। সবাইকে সুবিচার করবার যে স্বভাবধর্ম তার শিশু-অন্তরে প্রবল হয়েছিল, রূঢ়ভাবে তাতে আঘাত লাগল। ঘরের অন্ধকারে এক কোণে মুখ ভার ক'রে বসে থাকে, বিশ্বশুদ্ধ লোকের ওপর ঘৃণায় মন ভরে যায়, তার বাবা, গ্রাণ্ড ডিউক, সবাইকে সমান ঘৃণ্য বলে মনে হয়। আর একটি কারণে সে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে; দেখে, প্রতিবেশীরা সকলে বাড়িতে এসে তার বাবাকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে, যেন আসলে মেলশিয়রই বাজিয়েছে, মেলশিয়রের জন্যেই যেন সেই কনসার্ট হয়েছে—!

এমন সময় গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদ থেকে একজন ভৃত্য উপহার নিয়ে উপস্থিত

হলো, গ্রাণ্ড ডিউক একটা সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছেন, আর রাজকুমারী এক বাক্স নানাধরনের উপাদেয় মিষ্টি খাবার পাঠিয়েছেন। দুইটি উপহারই জাঁ-ক্রিস্তফের ভাল লাগল, কিন্তু তখন এমন খারাপ মেজাজে ছিল যে, তার ভাল লেগেছে, সেকথা পর্যন্ত সে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারল না। বিশেষ ক'রে রাজকুমারীর খাবারের বাক্সের দিকে মুখ ভার ক'রে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, মনে ভেবে ঠিক করতে পারে না যে তার বিশ্বাসের এইরকম অপব্যবহার করেছে, তার উপহার গ্রহণ করা উচিত হবে কিনা। প্রায় নিজেকে রাজী ক'রে এনেছিল, এমন সময় মেলশিয়র আদেশ করল, এক্ষুণি কালি-কলম নিয়ে টেবিলে বসতে হবে এবং যেভাবে বলে দিচ্ছে, অবিকল সেইভাবে এবং সেই ভাষায় পত্র লিখে অবিলম্বে ধন্যবাদ জানাতে হবে। ক্রিস্তফ আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। সারাদিনের উত্তেজনার ফলে তার মন যেরকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তার ওপর মেলশিয়র চিঠির সম্বোধন যে-ভাষায় লিখতে আদেশ করল তাতে ক্রিস্তফ আর অশ্রু সম্বরণ ক'রে থাকতে পারল না! তার সমস্ত আত্মসম্মান-বোধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। চিঠির প্রারম্ভেই মেলশিয়র শুরু করল, মহামহিমান্বিত মহাশয়ের একান্ত বশম্বদ দীন ভৃত্য ও সঙ্গীতকার—...

নিজের হাতে নিজেই সেই অকারণ ক্ষুদ্রতার কথা সে লিখতে পারল না। চোখ ফেটে অশ্রু ঝরে পড়ল এবং কোন প্রবোধ মানল না। অদূরে রাজভৃত্য এই দৃশ্য দেখে বিরক্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে মেলশিয়রকেই নিজের হাতে সেই চিঠি লিখতে হলো এবং তার পরিণাম জাঁ ক্রিস্তফের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হলো না। এমন সময়, ভাগ্যের চরম পরিহাস হিসেবেই যেন ক্রিস্তফের হাত থেকে উপহারের ঘড়িটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নিরুদ্ধ ঝড় প্রলয়-মূর্তিতে বালকের মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। মেলশিয়র চিৎকার ক'রে বলল, উপবাসে তাকে রাত কাটাতে হবে। মাও বাবার কথায় সায় দিল; রাজকুমারীর দেওয়া খাবারের বাক্সে সে হাত দিতে পারবে না। মা'র কথায় বালকও বিদ্রোহী হয়ে উঠল, সেও চেঁচিয়ে উত্তর দিল, সেই মিষ্টির বাক্স তার, অন্য কারোর তাতে কোন অধিকার নেই, তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না! বালকের এই ধৃষ্টতার উত্তর এল প্রহারে। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে লুইসার হাত থেকে মিষ্টির বাক্সটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর সজোরে লাথি মারতে লাগল মেলশিয়র। তারপর রাগে বেত নিয়ে ছেলেকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করল, জোর ক'রে টেনে বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শুনতে পেল, পাশের ঘরে তার মা-বাবা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রীতিমত ভূরি-ভোজনে বসেছে, এক সপ্তাহ আগে থেকে কনসার্ট উপলক্ষে এই ভোজের আয়োজন চলেছিল। অথচ আজ তা থেকে সে-ই বঞ্চিত! এই নিদারুণ অবিচারে তার মনে হলো, সেই মুহূর্তে যন সে মরে যায়! তাদের সুতৃপ্ত অট্টহাসি তার কানে এসে পৌঁছোয়, গেলাসে ঠুন ঠুন শব্দ ওঠে। তার অনুপস্থিতির কারণ নিমন্ত্রিতদের বলা হলো যে সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে, তাই নিমন্ত্রিতরাও তার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করল না। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, নিমন্ত্রিতরা যখন যে-যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল, সেই সময় ক্রিস্তফ বিছানায় চোখ বন্ধ অবস্থায় শুনল, তার ঘরে যেন কার সন্তর্পণ মৃদু পদ-শব্দ, সে-শব্দ তার বিছানায় দিকে ধীরে এগিয়ে এল। ক্রিস্তফ শুনল বৃদ্ধ ঠাকুরদা তার শয্যার দিকে নত হয়ে তার শিরশ্চুম্বন করলেন, স্নেহার্দ্র মৃদুকণ্ঠে শুধু বললেন: 'ওরে আমার পাগল…' তারপর, যেন লজ্জিত হয়েই বৃদ্ধ আর কোন কথা বলতে পারলেন না, নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ঘর থেকে চলে গেলেন। যাবার সময় নাতির হাতের মুঠোয় কতকগুলি খাবার গুঁজে দিয়ে গেলেন,—এগুলো টেবিল থেকে গোপনে পকেটে সরিয়ে রেখেছিলেন।

সেই স্নেহের ছোট্ট স্পর্শটুকুতে ক্রিস্তফের মনের জ্বালা যেন শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু সারাদিনের উত্তেজনা আর ক্লান্তির ফলে তার ভাববার শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না, তাই বৃদ্ধের এই ব্যবহারের পূর্ণ তাৎপর্য সে গ্রহণ ক'রে উঠতে পারল না। বিদ্যুৎ-স্পর্শে দেহ যেমন ব্যথিত চকিত হয়ে ওঠে, তেমনি ক্লান্ত স্নায়ু সর্বদেহকে ব্যথিত ক'রে তুলছিল। উন্মাদ উত্তাল সঙ্গীত স্বপ্নের মধ্যে তাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলে। গভীর রাত্রিতে সহসা নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। কনসার্টের প্রারম্ভে বিটোফেনের যে আলাপ শুনেছিল, তা যেন সমুদ্র-গর্জনের মতন কানের কাছে এসে বাজতে থাকে। মনে হয়, সমস্ত ঘর যেন সেই উত্তাল সঙ্গীতের ছন্দে ভরে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে, হাত দিয়ে দুই চোখ রগড়াতে রগড়াতে বুঝতে চেষ্টা করে, সে সত্যি জেগে আছে, না, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। না…সে তো স্বপ্ন দেখছে না…জেগেই বসে আছে। বিটোফেনের সেই উন্মাদ দুরন্ত সঙ্গীত, তার প্রত্যেকটি সুর যেন সে স্পষ্ট অনুভব করছে, সেই ক্রুদ্ধ গর্জন, বন্য আর্তনাদ, ঝঞ্ঝার হাহাকার স্পষ্ট তার কানে এসে বাজছে, তার নিজের অন্তরের প্রতিটি স্পন্দনে সে স্পষ্ট অনুভব করছে সেই উন্মাদ সঙ্গীত-স্রষ্টায় অনুরাগ-মরু অন্তরের আর্তস্পন্দন …অরণ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন উতলা ক'রে সেই দুরন্ত ঝড়ের ঝাপ্টা যেন তার মুখে-চোখে

সজোরে এসে লাগছে ; তারপর হঠাৎ কোন্ মহাপ্রবলের আদেশে এক নিমেষের মধ্যে সেই উন্মাদ ধ্বংসের উত্তেজনা থেমে যায়…প্রচণ্ড কলরবের বুকে সহসা আবির্ভূত হয় প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। বিটোফেনের অতিকায় সত্তা যেন তার অন্তরে প্রবেশ ক'রে তার নিজস্ব সমস্ত চেতনাকে ফুৎকার নিভিয়ে দেয়, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ভেঙ্গে চুরে নিমেষের মধ্যে তাঁর বিরাট সত্তার উপযোগী বিরাট বিশাল ক'রে তোলে। সে যেন শিশু নয়, সে যেন বিটোফেনের আত্মার সহোদর, তেমনি সুবিশাল, তেমনি অতিকায়। সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে উঠেছে তার সত্তা। মেঘচুম্বী শৃঙ্গ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে অচল অটল পর্বতের মতো, তাকে ঘিরে আর্তনাদ ক'রে চলেছে প্রমত্ত ঝড়, ব্যর্থ আক্রোশের ঝড়, বেদনার ঝড়।…কি বিপুল বেদনা! কিন্তু পর্বতের তাতে কিছু যায় আসে না! পর্বতের মতো সে অচঞ্চল, শক্তিমান… আসুক ঝড় · যত প্রবলই হোক, সে সহ্য করবে, সহ্য করবার সে-ক্ষমতা আছে পর্বতের দুঃখের চেয়ে সেই দুঃখকে সহ্য করবার শক্তি…কি আনন্দ আছে সেই শক্তিতে! যে শক্তিমান, আনন্দে সে পারে দুঃখকে গ্রহণ করতে!

হঠাৎ রাত্রি-নিশীথে নিস্তব্ধ শয্যায় সে হেসে ওঠে। সে-হাসিতে সহসা ঘরের নীরবতা ভেঙ্গে যায়। শয্যা থেকে জেগে মেলশিয়র চিৎকার ক'রে ওঠে :

'কে? কে শব্দ করে?'

মৃদু কণ্ঠে লুইসা স্বামীকে বলে :

'চুপ করো…ও স্বপ্ন দেখছে…স্বপ্নে হাসছে…'

আবার তারা ঘুমিয়ে পড়ে, সমস্ত ঘর আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

সঙ্গীতও থেমে যায়। শুধু কানে আসে নিদ্রিতদের নিঃশ্বাসের উত্থান-পতনের নিয়মিত শব্দ…নিশ্ছিদ্র তমসার সাগরে নিদ্রার তরীতে নীরবে ভেসে চলেছে যাত্রীর দল…একই বেদনার বন্ধনে বাঁধা সহযাত্রী সব…একই জীর্ণ ভগ্ন ভেলায় ভাগ্য তাদের পাশাপাশি টেনে এনে ফেলেছে…উন্মাদ ঝঞ্ঝার তাড়নায় রাত্রির তমসা ভেদ ক'রে এগিয়ে চলেছে জীর্ণ ক্ষুদ্র তরী…